বঙ্গবন্ধু
মুক্তিযুদ্ধ
মুক্তিযোদ্ধা
বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু
মুক্তিযুদ্ধ
মুক্তিযোদ্ধা
বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা পর্ব-৮

সংকলক

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

সভাপতি ও উদ্যোক্তা

(মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ)

সম্পাদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. মিজানুর রহমান বাচ্চু

(যুদ্ধকালীন গ্রুপ কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)

সাবেক সিনিরয় সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ

উপদেষ্টা, মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

তাকিয়া মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

প্রথম মুদ্রণ : ৭০০০ কপি

অলংকরণ

শামীমা আক্তার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

আব্দুল্যাহ আল মামুন

প্রচ্ছদ

মো. আবিদুল্লাহ

ISBN : 978-984-91094-7-1

সৌজন্য

নতুন প্রজন্মের কাছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস তুলে ধরে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ **মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ** এর কর্মকাণ্ডের অংশ

উ ৎ স র্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ও
৭১ এর সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি



মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালির হাজার বছরের কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অসীম সাহসীকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উৎরে যাওয়ার এক বড় ক্যানভাস। মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই রচিত হয়েছে তবে এর সূর্যসৈনিক যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ইতিহাস সংরক্ষিত নেই। কিন্তু তারা বাঙ্গালি জাতির বীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হলে সেই সব অকুতোভয় কালজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যান্ত জরুরী এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাথা আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেয়া তোমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা দিয়েছি স্বাধীনতা আর সেই চেতনায় তোমরা উদ্বুদ্ধ করবে নতুন প্রজন্মকে যুগে যুগে। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

মাসুদুল করিম অরিয়ন (সভাপতি ও উদ্যোক্তা, "মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ") স্বউদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধেও বীরত্বগাথা ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধের বর্ণনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট www.mssangsad.com ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। এযাবৎ ৪১০০ এর বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা", বাস্তবায়ন সহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণা নিয়ে রচিত "মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা পর্ব-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮..." প্রকাশ করে বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আসছে। ভুয়াদের যুদ্ধের কোন বীরত্বগাথা নেই, আর এরা দেশের শত্রু ও দেশের জনগণের সম্পদ বিনষ্টকারী।

পরিশেষে স্বাধীনতার স্বপক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কাছে মাসুদুল করিম অরিয়ন এর এই দেশপ্রেম মূলক সকল কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. মিজানুর রহমান বাচ্চু
(যুদ্ধকালীন গ্রুপ কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)
সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ
উপদেষ্টা, মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলদেশ

সূ চি প ত্র



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ (৩রা চৈত্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) রাত ৮টায় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদী তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেখ বংশের গোড়াপত্তনকারী শেখ বোরহানউদ্দিনের বংশধর। তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার বা হিসাব সংরক্ষণকারী ছিলেন এবং তার মা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বড় বোনের নাম ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী এবং তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। তার নানা শেখ আবদুল মজিদ তার নামকরণ করেন "শেখ মুজিবুর রহমান"। তার ছোটবেলার ডাক নাম ছিল "খোকা"। ছোটবেলা থেকেই তিনি মানুষের প্রতি সহমর্মী স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলা থেকে ধান বিতরণ করতেন। সমিতি করে অন্যদের কাছ থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করে গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিলি করতেন।

শিক্ষা:

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ পাবলিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পিতার বদলিজনিত কারণে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাদারীপুর ইসলামিয়া বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেরিবেরি নামক জটিল রোগে আক্রান্ত হন এবং তার হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তার চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ে ও অস্ত্রোপাচার করাতে হয় এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করতে বেশ সময় লেগেছিল। এ কারণে তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুস্থ হবার পর গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময়ে তার গৃহশিক্ষক ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং বহু বছর জেল খাটা কাজী আবদুল হামিদ (হামিদ মাস্টার) নামীয় জনৈক ব্যক্তি। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান নাম মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে আই.এ. এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন তিনি বেকার হোস্টেলের ২৪নং কক্ষে থাকতেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সম্মানার্থে ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষকে একত্র করে "বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ" তৈরি করে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কক্ষটির সম্মুখে তার আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। ভারত বিভাজনের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন। তবে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বহিষ্কার করে। পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।

ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা:

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটেছিল ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকে। ঐ বছরই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং খাদ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীকালে বাংলা প্রদেশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। ঐ সময় বিদ্যালয়ের ছাদ সংস্কারের দাবি নিয়ে একটি দল তাদের কাছে যায়। দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিব। ব্যক্তিগত রেষারেষির জেরে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথমবারের মতো গ্রেফতার করা হয়। ৭ দিন হাজতবাস করার পর তিনি ছাড়া পান। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি এবং মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ প্রমুখ যোগদান করেন। শেখ মুজিব এই সম্মেলনের অন্যতম আয়োজক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যয়নকালীন তিনি বাংলার অগ্রণী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। এম. ভাস্করণ তাকে "সোহ্‌রাওয়ার্দীর ছত্রতলে রাজনীতির উদীয়মান বরপুত্র" হিসেবে আখ্যায়িত করেন। একই বছর কলকাতায় ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক প্রমুখের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ঐ সময় থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল-পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে গঠিত "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন।

পাকিস্তান আন্দোলন, যুক্তবঙ্গ ও দেশভাগ:

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নেমে পড়ে। মুসলিম লীগের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব এ সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। "পাকিস্তান দাবির পক্ষে গণভোট" খ্যাত ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিব বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে লীগের ওয়ার্কার ইনচার্জের দায়িত্বে থেকে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ কৃষক সমাজের কাছে গিয়ে তিনি পাকিস্তান দাবির ন্যায্যতার বিষয় প্রচার করে ভোট চান। এই নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে মুসলিম লীগ বিজয় লাভ করে। তবে একমাত্র বাংলায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের সময় কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন। ঐ সময় সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখের নেতৃত্বে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃত্বের বাইরে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের যে "যুক্তবঙ্গ আন্দোলন" সংগঠিত হয়, শেখ মুজিব তাতেও যুক্ত হন। পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি নিশ্চিত হলে আসাম প্রদেশের বাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত সিলেট জেলার ভাগ্য নির্ধারণে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব সিলেট গণভোটে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে কাজ করেন। তিনি এসময় প্রায় ৫০০ কর্মী নিয়ে কলকাতা থেকে সিলেট গিয়েছিলেন। গণভোটে জয়লাভ সত্ত্বেও করিমগঞ্জ পাকিস্তান অংশে না থাকা এবং দেশভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভৌগোলিক অপ্রাপ্তির বিষয় নিয়ে স্বীয় আত্মজীবনীতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংগ্রাম:

ব্রিটিশ ভারত থেকে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক হবার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন,

যার মাধ্যমে তিনি উক্ত অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। এ সময় তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।

বাংলা ভাষা আন্দোলন:

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণকালে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য দেয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। ঐ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলা ভাষার বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এছাড়াও ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। একই বছরের ২রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের অংশগ্রহণে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যা থেকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ পরিষদের আহ্বানে ১১ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্যান্য ছাত্র নেতাকে মুক্তি দেয়া হয়। তাদের মুক্তি উপলক্ষে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় শোভাযাত্রা হয় যাতে শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন। তবে পুলিশ এই শোভাযাত্রা অবরোধ করে রেখেছিল। ১৫ই মার্চ মুজিবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়। পুলিশি

কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব অবিলম্বে ১৭ই মার্চ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। একই সময়ে ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় সেই বছরেই ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাকে আবার আটক করা হয়। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন যার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জরিমানা করা হয়। কিন্তু তিনি এই জরিমানাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হক টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে বিজয় লাভ করেন। শেখ মুজিব তার সেই আন্দোলনের সফলতার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশন ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে পুনরায় আটক করা হয়। এ সময়েই তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, মৃত্যু-পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তার হৃত ছাত্রত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেয়। ২৬শে জুন, ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের পূর্ব পাকিস্তান আগমনকে উপলক্ষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঢাকায় দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে এবারও শেখ মুজিবকে আটক করা হয় এবং দুই বছর জেলে আটক করে রাখা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি মুজিবের জেলমুক্তির আদেশ পাঠ করার কথা থাকলেও খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরোক্ষভাবে পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে তিনি সাহসী ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সময়ে শেখ মুজিব জেলে অবস্থান করেই ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন

স্থায়ী ছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক চীনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২রা অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত রাজধানী পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান চীন সরকারের আমন্ত্রণে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এই সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে চীন সফর করেন।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা ও যুক্তফ্রন্ট সরকার:

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলে শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তিনি ২৬শে জুন জেল থেকে ছাড়া পান। মুক্তি পাবার পরপরই চলমান খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে সাময়িকভাবে আটক করে রাখা হলেও অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান। একই বছরের অক্টোবর মাসে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে যুক্ত থেকে লিয়াকত আলি খানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের চেষ্টা করায় উভয়কেই আটক করা হয়। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলাই শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। একই বছরের ১৪ই নভেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসনে ১০,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান। ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলা প্রদেশে সরকার গঠন করে এবং ১৫ই মে শেখ মুজিব উক্ত সরকারে যোগ দিয়ে কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। ২৯শে মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেয়। ৩১শে মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমান

বন্দর থেকেই তাকে আটক করা হয়। ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন তিনি। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুন শেখ মুজিব প্রথমবারের মতো গণপরিষদের সদস্য হন। ১৭ই জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে ২১ দফা দাবি পেশ করে, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৩শে জুন দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হলে আইনসভার সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন। ২৫শে আগস্ট পাকিস্তানের করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন æSir (President of the Constituent Assembly), you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about Autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite" ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১-২৩শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেয়া হয় ও শেখ মুজিবকে পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দল থেকে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। ১৪ই জুলাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব রাখা হয়, যা তিনিই সরকারের কাছে পেশ করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তার নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে এই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব প্রাদেশিক সরকারে যোগ দিয়ে একসাথে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি পাক-ভারত

বাণিজ্য চুক্তি সম্মেলনে যোগদান করার জন্য নয়াদিল্লি যান। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সময় ব্যয় করার জন্যে তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি সরকারি সফরে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। এই দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিক জীবন-যাপনের সুবিধা শেখ মুজিবুর রহমানকে সমাজতন্ত্রের প্রতি উজ্জীবিত করে তোলে। ১৯৫৭-৫৮ অর্থবছরের জন্য তিনি পাকিস্তান চা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন:

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন। আইয়ুব খানের সমালোচনা করার জন্য ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তাকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও, তার উপর নজরদারি করা হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কার্যত গৃহবন্দি হিসেবে থাকেন। এ সময় আইয়ুব খান ৬ বছরের জন্য সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। জেলে থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়। ১২ই সেপ্টেম্বরে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৪ মাস একটানা আটক থাকার পর তাকে মুক্তি দেয়া হলেও জেলের ফটক থেকে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর জেল থেকে ছাড়া পান। জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রনেতাকে নিয়ে গোপনে নিউক্লিয়াস ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা। শেখ মুজিব ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি সামরিক সরকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান দলকে পুনরায় সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই

ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবার আটক করা হয়। ২রা জুন তারিখে চার বছরব্যাপী বহাল থাকা সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর ১৮ই জুন তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ২৫শে জুন তিনি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন। ৫ই জুন তিনি পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইয়ুব খানের সমালোচনা করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি লাহোরে যান এবং সেখানে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এটি মূলত বিরোধী দলসমূহের একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল। পুরো অক্টোবর মাসজুড়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে মিলে যুক্তফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন ও একই বছরের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের মহাসচিব ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাশাসক রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, রাজনীতির নামে মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রেসি) প্রচলন এবং পাকিস্তানের কাঠামোতে এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব। মৌলিক গণতন্ত্র অনুযায়ী সারা দেশ থেকে ৮০ হাজার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতো ও তাদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতেন। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং প্রদেশগুলোকে একত্রে জুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঐ সময় সামরিক বাহিনীর গণহত্যা আর বাঙালিদের ন্যায্য দাবী পূরণে সামরিক শাসকদের উদাসীনতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করতে গিয়ে মুজিব আইয়ুববিরোধী সর্বদলীয় প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন। নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে ভারতের দালাল অভিযুক্ত করে তাকে আটক করা হয়। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং

আপত্তিকর প্রস্তাব পেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য উচ্চ আদালতের এক রায়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

ছয় দফা আন্দোলনঃ

জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (যেমন- পাট) পূর্ব পাকিস্তান থেকে হবার পরও এতদাঞ্চলের জনগণের প্রতি সর্বস্তরে বৈষম্য করা হতো। এছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা আনুপাতিক হারে ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিকভিত্তিতে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এর ফলে, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা বৈষম্য সম্পর্কে আপত্তি জানাতে শুরু করেন। বৈষম্য নিরসনে শেখ মুজিব ছয়টি দাবি উত্থাপন করেন, যা ছয় দফা দাবি হিসেবে পরিচিত। বাঙালির বহু আকাঙ্ক্ষিত এই দাবি পরবর্তীকালে বাঙালির "প্রাণের দাবি" ও "বাঁচা মরার দাবি" হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যা ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা। ছয় দফার দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ-

১) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

২) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুইটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে- দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

৩) সমগ্র দেশের জন্যে দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন।

৪) ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। তবে, প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে।

৫) অঙ্গরাষ্ট্রগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।

৬) আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

শেখ মুজিব এই দাবিকে "আমাদের বাঁচার দাবী" শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবির মূল বিষয় ছিল-একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানি ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা মার্চে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচার কার্য পরিচালনা করেন ও প্রায় পুরো দেশই ভ্রমণ করে জনসমর্থন অর্জন করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে বন্দি হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাকে আটবার আটক করা হয়েছিল। ঐ বছরের মে মাসের ৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে পাট কারখানার শ্রমিকদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। তার মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ এই ধর্মঘট চলাকালে গুলিবর্ষণ করায় ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে আনুমানিক তিনজনের মৃত্যু হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাঃ

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে দুই বছর জেলে থাকার পর ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত। ৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" নামে অভিহিত করে। এই অভিযোগে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে

শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। মামলায় পাকিস্তান দণ্ডবিধির **১২১** ও **১৩১** ধারা অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে। এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভক্তিকরণ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়। **১৯৬৮** খ্রিষ্টাব্দের **১৯**শে জুন ঢাকা সেনানিবাসের এক বিশেষ ট্রাইবুনালে এ মামলার শুনানি শুরু হয়। বিচারকার্য চলাকালীন ২৬ জন কৌশলী ছিলেন। শেখ মুজিবের প্রধান কৌশলী ছিলেন আব্দুস সালাম খান। একটি অধিবেশনের জন্য ব্রিটেন থেকে আসেন আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস। তাকে সাহায্য করেন তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও মওদুদ আহমেদ। মামলাটিতে মোট **১০০**টি অনুচ্ছেদ ছিল। **১১** জন রাজসাক্ষী ও **২২৭** জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয়। মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের, এম আর খান ও মুকসুদুল হাকিম। এর অব্যবহিত পরেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। মামলাটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের জনসাধারণ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান:

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্য চলাকালীন **১৯৬৯** খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগারো দফা দাবি পেশ করে, তন্মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। আন্দোলনটি এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। পরবর্তীকালে এই গণআন্দোলনই "ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান" নামে পরিচিতি পায়। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ , ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের ঘটনার পর আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার

করে নেন। একই সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐ বছরেরই **২৩**শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার অংশগ্রহণে আয়োজিত এই সম্মেলনে তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করেন। স্বীয় বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। **১৯৬৯** খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিব তার ছয় দফাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবিগুলো উপস্থাপন করেন। কিন্তু, তা প্রত্যাখ্যাত হলে সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন তিনি। **১৯৬৯** খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে "বাংলাদেশ" নামে নামকরণের ঘোষণা দেন। মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারাদেশে ব্যাপক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্মকর্তারা তাকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা এনে দেয়। অনেক বুদ্ধিজীবীদের মতে, যে দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্তা প্রদানে সাহায্য করে। তবে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং **১৯৭০** খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

৭০-এর সাধারণ নির্বাচন:

গণঅভ্যুত্থানের বিরূপ প্রভাবে **১৯৬৯** খ্রিষ্টাব্দের **২৪**শে মার্চ আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। **২৫**শে মার্চ ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। তিনি **১৯৬৯** খ্রিষ্টাব্দের **২৮**শে মার্চ এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। **১৯৭০** খ্রিষ্টাব্দের **১২**ই নভেম্বর ভোলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রায় **১** লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং **১০** লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। এতে জনগণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের দুর্বল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ

করেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে 'স্থানীয় নেতাদের ব্যর্থতা' হিসেবে উল্লেখ করে। এসময় শেখ মুজিব বাস্তুহারাদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে থাকেন। ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য নির্বাচনের সময়সূচি পিছিয়ে দেয়া হয়। পরে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর (জাতীয়) ও ১৭ই ডিসেম্বর (প্রাদেশিক) "এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে" নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় জাতীয় পরিষদে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৬৯ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৪৪ জন প্রতিনিধি থাকতেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ২টি আসন ছাড়া বাকি সবগুলোতে জয়ী হওয়ায় জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ। ১৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো, মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো অধিবেশন বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি ঐ সরকারকে মেনে নেবেন না। অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো শেখ মুজিবের আসন্ন প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের প্রবল বিরোধিতা করে। এসময় শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেননি, যদিও কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি করতে থাকে। জুলফিকার আলি ভুট্টো গৃহযুদ্ধের ভয়ে শেখ মুজিব ও তার ঘনিষ্ঠজনদেরকে নিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য একটি গোপন বার্তা পাঠান। পাকিস্তান পিপলস পার্টির মুবাশির হাসান শেখ মুজিবকে ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে প্ররোচনা দেন; যেখানে শেখ মুজিব হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টো থাকবেন রাষ্ট্রপতি। সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের অগোচরে সম্পূর্ণ গোপনে এই আলোচনা সভাটি পরিচালিত হয়। একইসময়ে, ভুট্টো আসন্ন সরকার গঠনকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।

৭ই মার্চের ভাষণ:

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সামরিক শাসকগোষ্ঠী দলটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনভাবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ১লা মার্চ উক্ত অধিবেশনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝতে পারে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। এই সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে একযোগে হরতাল পালিত হয়। তিনি ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে সকল প্রকার দোষ তার উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালান। এ ধরনের ঘোলাটে পরিস্থিতিতেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বিপুল সংখ্যক লোক একত্রিত হয়। সাধারণ জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা দেন-

"... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

এর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার গণমাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেনাবাহিনীর চাপ থাকা সত্ত্বেও ইএমআই মেশিন ও টেলিভিশন ক্যামেরায় ভাষণের অডিও এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করে রাখা হয়। ৮ই মার্চ জনতার চাপে ও পাকিস্তান রেডিও'র কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে পাকিস্তান সরকার বেতারে এই ভাষণ পুনঃপ্রচারের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।

ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো বৈঠক:

১০ই মার্চ নির্বাচিত ১২ জন সংসদীয় শীর্ষস্থানীয় নেতাকে ইয়াহিয়া খান বৈঠকের আমন্ত্রণ জানালে শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৫ই মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট ৩৫টি নির্দেশনা জারি করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। সেনাবাহিনীর জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ঢাকায় প্রেরণের পাশাপাশি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো চলমান থাকে। ১৯শে মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে মার্চ আলোচনায় যোগ দিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১২ জন উপদেষ্টাকে সফরসঙ্গী করে ঢাকা আসেন। ২২শে মার্চ ভুট্টো-মুজিবের ৭০ মিনিটের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করা সত্ত্বেও ভুট্টো-মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সফল হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে ২৩শে মার্চ প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ২৫শে মার্চ ভুট্টো-ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বাঙালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত অপারেশন সার্চলাইট প্রদান করে সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা করেন। উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার শেখ মুজিবকে বিষয়টি জানান। ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঐদিনই রাত ১টা ১০ মিনিটে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

কারাভোগ:

শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাভোগ করেছেন। তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় ব্রিটিশ আমলে সাত দিন কারাভোগ করেন। বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন তিনি কারাভোগ করেন পাকিস্তান সরকারের আমলে। শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনের প্রায় ১৩ বছর কারাগারে ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে সহপাঠী বন্ধু আবদুল মালেককে মারপিট করা হলে শেখ মুজিবুর রহমান সেই

বাড়িতে গিয়ে ধাওয়া করেন। সেখানে হাতাহাতির ঘটনা ঘটলে হিন্দু মহাসভার নেতাদের কৃত মামলায় শেখ মুজিবকে প্রথমবারের মতো আটক করা হয়। সাত দিন জেলে থাকার পর মীমাংসার মাধ্যমে মামলা তুলে নেওয়া হলে শেখ মুজিব মুক্তি পান। এছাড়া ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের ফরিদপুর জেলা শাখার সহসভাপতি থাকা অবস্থায় বক্তব্য প্রদান এবং গোলযোগের সময় সভাস্থলে অবস্থান করায় শেখ মুজিবুর রহমানকে দুইবার সাময়িকভাবে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিব ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিন কারাগারে ছিলেন। একই বছর ১১ই সেপ্টেম্বর আটক হয়ে মুক্তি পান ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি। এ দফায় তিনি ১৩২ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল আবারও তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় ও ৮০ দিন কারাভোগ করে ২৮শে জুন মুক্তি পান। ওই দফায় তিনি ২৭ দিন কারাভোগ করেন। একই বছরের অর্থাৎ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩ দিন এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি টানা ৭৮৭ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও শেখ মুজিবকে ২০৬ দিন কারাভোগ করতে হয়। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারির পর ১১ই অক্টোবর শেখ মুজিব আবার গ্রেফতার হন। এ সময়ে টানা ১ হাজার ১৫৩ দিন তাকে কারাগারে কাটাতে হয়। এরপর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি আবারও গ্রেফতার হয়ে মুক্তি পান ওই বছরের ১৮ই জুন। এ দফায় তিনি কারাভোগ করেন ১৫৮ দিন। এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি ৬৬৫ দিন কারাগারে ছিলেন। ছয় দফা প্রস্তাব দেয়ার পর তিনি যেখানে সমাবেশ করতে গেছেন, সেখানেই গ্রেফতার হয়েছেন। ওই সময়ে তিনি ৩২টি জনসভা করে বিভিন্ন মেয়াদে ৯০ দিন কারাভোগ করেন। এরপর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে আবারও গ্রেফতার হয়ে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তি পান। এ সময় তিনি ১ হাজার ২১ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে। এ দফায় তিনি কারাগারে ছিলেন ২৮৮ দিন।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতার ঘোষণাঃ

১৯৭১ ইয়াহিয়া খান ২৭ মার্চ পাকিস্তান রেডিওতে এক ঘোষণায় সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিব ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। জয় বাংলা।"

এর কিছুক্ষণ পর তিনি বাংলায় একটি ঘোষণা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন-

"সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপাষে নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রু বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক লাকেদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

টেক্সাসে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রাহক মাহবুবুর রহমান জালাল বলেন, "বিভিন্ন সূত্র ও দলিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এটিই প্রমাণিত হয় যে, ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, যা ছিল তার বা অন্য কারো হয়ে ঘোষণা দেওয়ার অনেক পূর্বে।"

স্বাধীনতা ঘোষণার পরই রাত ১টা ৩০ মিনিটের সময় শেখ মুজিবকে সেনাবাহিনীর

একটি দল তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ও সামরিক জিপে তুলে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ রাতে তাকে আটক রাখা হয় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে। পরদিন তাকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিমানে করে করাচিতে প্রেরণ করা হয়। করাচি বিমানবন্দরে পেছনে দাঁড়ানো দুই পুলিশ কর্মকর্তার সামনের আসনে বসা অবস্থায় শেখ মুজিবের ছবি পরদিন প্রায় সব দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। এর আগে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে শেখ মুজিবকে ক্ষমতালোলুপ দেশপ্রেমবর্জিত লোক আখ্যা দিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতির ওপর আঘাত হানা এবং ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগ তোলেন ও বলেন যে এই অপরাধের শাস্তি তাকে (শেখ মুজিবকে) পেতেই হবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বন্দিজীবনঃ

লাহোর থেকে ৮০ মাইল দূরে পাকিস্তানের উষ্ণতম শহর লায়ালপুরের (বর্তমান ফয়সালাবাদ) কারাগারে শেখ মুজিবকে কড়া নিরাপত্তায় আটকে রাখা হয়। তাকে নিঃসঙ্গ সেলে (সলিটারি কনফাইন্টমেন্ট) রাখা হয়েছিল। এদিকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমানে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ হন প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত করে। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯শে জুলাই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সামরিক আদালতে মুজিবের আসন্ন বিচারের বার্তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করে। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান এই আদালতের নেতৃত্ব দেন। তবে মামলার প্রকৃত কার্যপ্রণালী ও রায় কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। লায়ালপুর কারাগারে সামরিক আদালত গঠন করা হয়। তাই মামলাটি "লায়ালপুর ট্রায়াল" হিসেবে অভিহিত। এই মামলার শুরুতে সরকারের দিক থেকে প্রবীণ আইনজীবী এ. কে. ব্রোহিকে অভিযুক্তের পক্ষে

মামলা পরিচালনায় নিয়োগ দেয়া হয়। আদালতের কার্যক্রমের শুরুতে ১২ দফা অভিযোগনামা পড়ে শোনানো হয়। অভিযোগের মধ্যে ছিল-রাষ্ট্রদ্রোহ, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। ছয়টি অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আদালতে ইয়াহিয়া খানের ২৬শে মার্চ প্রদত্ত ভাষণের টেপ রেকর্ডিং বাজিয়ে শোনানো হয়। সেই বক্তব্য শোনার পর শেখ মুজিব আদালতের কোনো কার্যক্রমে অংশ নেওয়া এবং তার পক্ষে কৌসুলি নিয়োগে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এই বিচারকে প্রহসন আখ্যা দেন। গোটা বিচারকালে তিনি কার্যত আদালতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন। আদালত কক্ষে যা কিছু ঘটেছে, তা তিনি নিস্পৃহভাবে বরণ করেছিলেন। বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থন তো দূরের কথা, কোনো কার্যক্রমেই অংশ নেননি তিনি। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি সামরিক বিমানঘাঁটি আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। পরদিন, ৪ঠা ডিসেম্বর সামরিক আদালত বিচারের রায় ঘোষণা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম শেষে তাকে নেওয়া হয় মিয়ানওয়ালি শহরের আরেকটি কারাগারে। সেখানে দণ্ডাদেশ কার্যকর করার ব্যবস্থা চলতে থাকে। বলা হয়ে থাকে, যে কারাগার কক্ষে তিনি অবস্থান করেছিলেন, তার পাশে একটি কবরও খোঁড়া হয়েছিল। তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তার সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধে ভারতের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গড়া যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন।

কারামুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন:

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়বরণ করার ফলশ্রুতিতে ২০শে ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতাচ্যুত হলে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন। ক্ষমতা হস্তান্তরকালেও ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভুট্টো নিজের স্বার্থ, বাংলাদেশে আটকে

পড়া পাকিস্তানিদের পরিণতি ও আন্তর্জাতিক চাপের কথা চিন্তা করে শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করতে চাননি। শেখ মুজিবের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়ে ফেলতে চান এবং মিঁয়াওয়ালী কারাগারের প্রধান হাবিব আলীকে সেরূপ আদেশ দিয়ে জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। ২২শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানকে মিঁয়াওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং একটি অজ্ঞাত স্থানে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এরপর ২৬শে ডিসেম্বর সিহালার পুলিশ রেস্ট হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টো ঐদিন সেখানে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন। ডিসেম্বরের শেষের দিকে (২৯ অথবা ৩০ ডিসেম্বর) পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদের সাথে এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে আবার ভুট্টোর সাথে মুজিবের বৈঠক হয়। ভুট্টো তাকে পশ্চিম পাকিস্তান ও নবগঠিত বাংলাদেশের সাথে ন্যূনতম কোন "লুস কানেকশন" রাখার অর্থাৎ শিথিল কনফেডারেশন গঠন করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকায় এসে জনগণের মতামত না জেনে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি ভুট্টো শেখ মুজিবের পাকিস্তান ত্যাগের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। সেদিন রাত ২টায় অর্থাৎ ৮ই জানুয়ারির প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান ও ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো বিমান লন্ডনের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডি ছাড়ে। ভুট্টো নিজে বিমানবন্দরে এসে শেখ মুজিবকে বিদায় জানান। লন্ডনে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে ইন্দিরা গান্ধী ও "ভারতের জনগণ আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু" বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে এসে তিনি সেদিন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন।

বাংলাদেশ শাসন:

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিবুর রহমান অল্পদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান আইনসভার জন্য নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ গঠন করেন। ১২ই জানুয়ারি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট হস্তান্তর করেন।

সংবিধান প্রণয়ন:

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান তার অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে শেখ মুজিব স্বাক্ষর করেন। ১৫ই ডিসেম্বর শেখ মুজিব সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের ঘোষণা দেন। ১৬ই ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মতে, 'শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারার চারটি বৈশিষ্ট্য হলো, বাঙালি জাতিসত্তা, সমাজতন্ত্র, জনসম্প্রীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতা। সংবিধানের চারটি মূলনীতি- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে চারটি বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই চারটি মূলনীতিকে একসাথে মুজিববাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।'

৭ই মার্চ, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। শেখ মুজিব ঢাকা-১২ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন।

নবরাষ্ট্র পুনর্গঠন:

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিচালিত নয় মাসব্যাপী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। শেখ মুজিব এই ধ্বংসযজ্ঞকে "মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ" হিসেবে উল্লেখ করে ৩০ লাখ মানুষ নিহত ও ২ লাখ নারীর ধর্ষিত হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনের জন্য

উল্লেখযোগ্যে কর্মসূচি হাতে নেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযাদ্ধো কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা এবং ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলাপূর্বক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালান।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনরায় চালু করেন। ইসলামি গোত্রগুলোর জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। তার শাসনে অসন্তুষ্ট ডানপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর সমর্থন পেতে তিনি সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় তিনি "মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তাকারী দালালেরা" তাদের ভুল বুঝতে পেরে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং দালাল অধ্যাদেশে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন। তবে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘর পোড়ানো ও বিস্ফোরক ব্যবহারে ক্ষতিসাধনের জন্য দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা হয়নি। অত্যন্ত অল্প সময়ে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ ছিল শেখ মুজিব সরকারের উল্লেখযাগ্যে সাফল্য।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১০০ বিঘার বেশি

জমির মালিকদের জমি এবং নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। গ্রাম বাংলার ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য তিনি "খাই-খালাসী আইন" পাশ করেন। গ্রাম বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও শিল্প-কৃষি উৎপাদনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বার্ডে প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় সরকারগুলোতে গণতন্ত্রায়নের সূচনা করেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভায় প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রশাসনে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ১৩ মাসে ১০ কোটি টাকা তাকাবি ঋণ বণ্টন, ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন, ১০ লাখ বসতবাড়ি নির্মাণ, চীনের কয়েক দফা ভেটো সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, ৩০ কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রত্যাবর্তন শুরুসহ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে শেখ মুজিব বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়াজেন করেন। মুজিব শতাধিক পরিত্যক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং ভূমি ও মূলধন বাজেয়াপ্ত করে ভূমি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্যের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য বড় ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর ফলে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবসান হতে শুরু করে এবং সমূহ দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। এছাড়াও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান। শেখ মুজিবের নির্দেশে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জুন সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে পূর্বের ১৯টি বৃহত্তর জেলার স্থলে ৬১টি জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৬ই জুলাই শেখ মুজিব ৬১ জেলার প্রতিটির জন্য একজন করে গভর্নর নিয়োগ দেন।

অর্থনৈতিক নীতি:

নব নির্বাচিত মুজিব সরকার গুরুতর কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তন্মধ্যে ছিল- ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসন, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি। এছাড়া ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এবং যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও চরমভাবে ভেঙে পড়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে মুজিব একটি বিস্তৃত পরিসরের

জাতীয়করণ কার্যক্রম হাতে নেন। বছর শেষ হতে না হতেই, হাজার হাজার বাঙালি পাকিস্তান থেকে চলে আসে ও হাজার হাজার অবাঙালি পাকিস্তানে অভিবাসিত হয়। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ শরণার্থী শিবিরগুলোতে রয়ে যায়। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করার জন্য বৃহৎ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে প্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়।[১৫৪] তারপরও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে চালের দাম আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়, যা ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। উক্ত দুর্ভিক্ষের সময় রংপুর জেলায় খাদ্যাভাব ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের অব্যবস্থাপনাকে সেসময় এর জন্যে দোষারোপ করা হয়। মুজিবের শাসনামলে দেশবাসী শিল্পের অবনতি, বাংলাদেশি শিল্পের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ এবং জাল টাকা কেলেঙ্কারি প্রত্যক্ষ করে।

পররাষ্ট্রনীতি:

চার বছরের কম সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে যে সাফল্য এনেছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। যেসব দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এমনকি পাকিস্তানের স্বীকৃতিও আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। "কারো সাথে বৈরিতা নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্ব" ছিল মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ ১১৩টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে। শেখ মুজিবের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ গ্রহণ করে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর শেখ মুজিব পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবীয় ও উন্নয়নকল্পের জন্য সহযোগিতা চান।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন। মুজিবের জীবদ্দশায় দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতাপূর্ণ সমঝোতা ছিল। শেখ মুজিবের অনুরোধক্রমে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় বাহিনীকে নিজ দেশে ফেরৎ নিয়ে যান। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরে যান। দেশটির শীর্ষ চার নেতা পোদগর্নি, কোসিগিন, ব্রেজনেভ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো তাকে অভ্যর্থনার জন্য ক্রেমলিনে সমবেত হন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জাপান সফর করেন। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো শেখ মুজিবকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনে যোগ দেন। উক্ত সম্মেলনে মুজিব তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন যা পাকিস্তানের সাথে কিছুমাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করে। তিনি একই বছরের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন এবং সেখানে জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি ৫০টি সমস্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

সামরিক বাহিনী গঠন:

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী গড়ে ওঠে। নবগঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে তিনি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য বিস্তৃত প্রকল্প গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়াজেনীয় অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করেন। যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক প্রতিনিধিদল

প্রেরণ করে পদাতিক বাহিনীর জন্য ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজোঁয়া বাহিনীর জন্য ভারি অস্ত্র আনা হয়। ভারতের অনুদানে ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তৎকালে উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক আকাশযান মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে মিশর থেকে সাজোঁয়া গাড়ি বা ট্যাংক আনা সম্ভব হয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত জ্ঞান লাভ করে দেশ যাতে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে পারে সে উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব সামরিক কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব সরকার সেনাবাহিনীর জন্য নগদ অর্থে আধুনিক বেতারযন্ত্র ক্রয় করে এবং সিগন্যাল শাখাকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলেন। শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ত্রিশ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। প্রত্যাবর্তনকারী বাঙালি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০। এই সকল কর্মকর্তা ও জওয়ানদের নিয়ে অর্ধ লক্ষের অধিক সদস্যের দেশের প্রথম সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। সামরিক সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য শেখ মুজিবের নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীঘিনালা, রুমা, আলীকদমের ন্যায় স্থানে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ছাউনি গড়ে তোলা হয়।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী:

শেখ মুজিবের ক্ষমতালাভের পরপরই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সশস্ত্র বিভাগ গণবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত বামপন্থী বিদ্রোহীরা মাওবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৪শে জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের ব্যাপারে একটি আদেশ জারি করেন। এরপর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়।

রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর এক-ষষ্ঠাংশ। শুরুর দিকে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চোরাচালানের মালামাল উদ্ধার করে এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের কার্যকলাপ কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খুব শীঘ্রই ঐ বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে। এর কারণ রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, গুম, গোলাগুলি, এবং ধর্ষণের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। তাদের যথেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রণ বা তাদের কার্যকলাপের জবাবদিহিতার আইনগত কোন ব্যবস্থা ছিল না। অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য গ্রেফতারকৃত লোকদের প্রতি অত্যাচার, লুটপাট এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ন্যায় জলপাই রঙের পোশাক এবং বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণে ভারতের সহায়তা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

গণঅসন্তোষ সত্ত্বেও মুজিব সরকার ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর "জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৭৩" জারি করে রক্ষীবাহিনীর সকল কার্যকলাপ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেন। এতে জনগণের মধ্যে মুজিব সরকারের প্রতি সুপ্ত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সেইসাথে রক্ষীবাহিনীর বিভিন্ন অনাচারের কারণে জনগণের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। রক্ষীবাহিনীকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর অভিযোগে সেনাবাহিনীর একাংশের মধ্যেও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:

স্বাধীনতার পর অচিরেই মুজিবের সরকারকে ক্রমশ বাড়তে থাকা অসন্তোষ সামাল দিতে হয়। তার রাষ্ট্রীয়করণ ও শ্রমভিত্তিক সমাজতন্ত্রের নীতি প্রশিক্ষিত জনবল, অদক্ষতা, মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি আর দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুজিব অতিমাত্রায় জাতীয় নীতিতে মনোনিবেশ করায় স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ করায় গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় তৃণমূল পর্যায়ে কোন নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে কমিউনিস্ট এবং ইসলামপন্থীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করায় ইসলামপন্থীদের

মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনদের নিয়োগ দেয়ার জন্য মুজিবের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ খাদ্য সংকট আরও বাড়িয়ে দেয় এবং অর্থনীতির প্রধান উৎস কৃষিকে ধ্বংস করে ফেলে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, দ্রব্যমূল্যের অসামঞ্জস্যতা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে মুজিবকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সংঘাতের মাত্রা বাড়তে থাকায় মুজিবও তার ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুজিব জরুরি অবস্থা জারি করেন। এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি শেখ মুজিব নতুন যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন, একে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যা দেন।

দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে দুটি দিক ছিল-সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মসূচি এবং আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির স্থলে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ সরকারে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। পরিবর্তিত সংবিধানের আওতায় ৬ই জুন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল, সরকারি-বেসরকারি এবং অন্যান্য সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্য নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি জাতীয় দল গঠন করা হয়। এ সময় শেখ মুজিব নিজেকে আমৃত্যু রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। বাকশাল প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের বিবেচিত করে এককভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে থাকে। বাকশাল বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারপন্থী চারটি সংবাদপত্র বাদে সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়। শেখ মুজিব জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সহায়তায় বাকশাল-বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করেন এবং সারাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। অনেকের মতে, তার এই নীতির ফলে অস্থিতিশীল অবস্থা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দুর্নীতি, কালোবাজারী ও অবৈধ মজুদদারি অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। তবে রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও

রাজনৈতিক হত্যার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও মুজিব নীরব ভূমিকা পালন করেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারীরা মুজিবের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং তার কর্মকাণ্ডকে গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার বিরোধী বলে গণ্য করেন। মুজিব ও বাকশাল বিরোধীরা গণঅসন্তোষ এবং সরকারের ব্যর্থতার কারণে মুজিব-সরকারের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ওঠে।

হত্যাকাণ্ড:

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট প্রত্যূষে একদল সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে রাষ্ট্রপতির ধানমন্ডিস্থ বাসভবন ঘিরে ফেলে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীদের হত্যা করে। শেখ মুজিবের পরিবারের সদস্য-বেগম ফজিলাতুন্নেসা, শেখ কামাল ও তার স্ত্রী সুলতানা কামাল খুকী, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী পারভীন জামাল রোজী, শেখ রাসেল, শেখ মুজিবের ভাই শেখ আবু নাসের হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এই দিন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি এবং তার স্ত্রী বেগম আরজু মনি, শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতনি সুকান্ত বাবু, বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত ও এক আত্মীয় বেন্টু খানকে হত্যা করা হয়। এছাড়া শেখ মুজিবের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা জামিল উদ্দিন আহমেদ, এসবি কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান ও সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক নিহত হন। কেবলমাত্র তার দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

শেখ মুজিবের শরীরে মোট ১৮টি বুলেটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, একটি বুলেটে তার ডান হাতের তর্জনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শেখ মুজিব ও তার পরিবারের মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করতে সেনা সদর থেকে ঢাকা সেনানিবাসের তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ হামিদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি গিয়ে আবিষ্কার করেন নির্দিষ্ট কফিনে শেখ মুজিবের মরদেহ মনে করে তার ভাই শেখ নাসেরের মরদেহ রাখা হয়েছে। দায়িত্বরত সুবেদার এর ব্যাখ্যা দেন যে, দুই ভাই দেখতে অনেকটা একরকম হওয়ায় ও রাতের অন্ধকারের কারণে মরদেহ অদল-বদল হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন ১৬ আগস্ট শেখ মুজিবের মরদেহ

জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সামরিক তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়। অন্যান্যদেরকে ঢাকার বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রতিক্রিয়া ও বিচার:

সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সামরিক কর্মকর্তারা। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবের প্রাক্তন সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতির পদে স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে খন্দকার মোশতাক সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (দায়মুক্তির অধ্যাদেশ) জারি করেন এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পাকিস্তানপন্থী প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে তার বৈধতা দেয়া হয়, যা ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে জাতীয় সংসদে রহিত করা হয়। সংবাদমাধ্যমে এ হত্যাকাণ্ডের ইন্ধনদাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-কে দায়ী করা হয়। লরেন্স লিফশুলজ বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বুস্টারের সূত্রে সিআইএ-কে সামরিক অভ্যুত্থান ও গণহত্যার জন্য দোষারোপ করেন। মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বহু বছরের জন্য চলমান রাজনৈতিক সংঘাতের সূচনা ঘটে। সেনা অভ্যুত্থানের নেতারা অল্পদিনের মধ্যে উচ্ছেদ হয়ে যান এবং অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে দেশে চলমান অচলাবস্থা তৈরি হয় ও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তৃতীয় সেনা অভ্যুত্থানের ফলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা আসীন হয়। তিনি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে সমর্থন করে মুজিব হত্যার বিচার স্থগিত করে দেন এবং মুজিবপন্থী সেনাসদস্যদের গ্রেফতার করেন। সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ১৪ জন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী আ ফ ম মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় মুজিব হত্যাকাণ্ডের মামলা দায়ের করেন এবং ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিচারক কাজী গোলাম রসুল শেখ মুজিব হত্যার বিচারের এজলাস

গঠন করেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জন আসামিকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে রায়ের বিরুদ্ধে কৃত আপিলে হাইকোর্টের দুইটি বেঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রায় দেয়। ফলে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মামলাটি তৃতীয় বেঞ্চে পাঠানো হয় এবং সেখানে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকে। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে এ বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ৫জন আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল অন্যতম আসামি আব্দুল মাজেদকে ভারত থেকে বাংলাদেশে এনে গ্রেফতার করা হয় এবং ১২ই এপ্রিল তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবার:

মুজিব ও তার স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দাদা আব্দুল হামিদের আদেশে শেখ মুজিবের বাবা ১৪ বছর বয়সী শেখ মুজিবকে তার ৩ বছর বয়সী সদ্য পিতৃ-মাতৃহীন জ্ঞাতি বোন বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে বিয়ে দেন। বেগম ফজিলাতুন্নেছার বাবা শেখ জহিরুল হক ছিলেন মুজিবুর রহমানের দুঃসম্পর্কের চাচা। উল্লেখ্য, তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান ও মা শেখ সায়েরা খাতুন আপন চাচাতো ভাইবোন ছিলেন। বিয়ের ৯ বছর পর ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব ২২ বছর বয়সে ও ফজিলাতুন্নেসা ১২ বছর বয়সে দাম্পত্যজীবন শুরু করেন। এই দম্পতির ঘরে দুই কন্যা এবং তিন পুত্রের জন্ম হয়- শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা এবং শেখ রাসেল।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা অক্টোবর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শেখ পরিবারকে এই বাড়িতেই গৃহবন্দি করে রাখে। শেখ কামাল ও জামাল পাহারারত সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান এবং মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন। শেখ কামাল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের একজন সমন্বয়ক ছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধকালীন কমিশন লাভ করেন। তিনি মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর এডিসি ছিলেন। তাকে শেখ মুজিবের শাসনামলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। শেখ

জামাল যুক্তরাজ্যের রয়েল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে যোগ দেন।

শেখ মুজিবের প্রায় পুরো পরিবারই ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট রাতে সেনা অভিযানে নিহত হন। কেবলমাত্র দুই কন্যা-শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঐসময় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানের কারণে বেঁচে যান। শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থ মেয়াদে এবং ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবেও তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শেখ রেহানার কন্যা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেবার পার্টির রাজনীতিবিদ টিউলিপ সিদ্দিক ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সের সদস্য (গ্রেটার লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন আসন থেকে নির্বাচিত)। শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত শ্রমিকনেতা ও তার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুজিব বাহিনীর প্রধান নেতা ছিলেন ও ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন (উভয়েই ১৫ আগস্ট নিহত হন)। বর্তমানে শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ হেলাল উদ্দীন ও শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল বাংলাদেশের সাংসদ। শেখ ফজলে নূর তাপস, মজিবুর রহমান চৌধুরী, নূর-ই-আলম চৌধুরী, আন্দালিব রহমান, শেখ সারহান নাসের তন্ময়, সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ, শেখ ফজলে শামস পরশ, এবং শেখ ফজলে ফাহিম- বাংলাদেশের প্রথমসারির রাজনীতিবিদ ও সম্পর্কে তার নাতি হন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

পটভূমি:

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১২ আগস্ট প্রকাশিত যার্ডক্লিপ রোয়েদাদে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তানের অংশ-পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব থেকে জনগণ আশা করেছিলেন, এবার তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হবে। তাঁদের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা নতুন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করলেন, তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার নয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ বহুবাচনিক সমাজে পূর্ব পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ একক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে পূ্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি তৈরি হয়। ১৯৫২ সালে নিজস্ব ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন দান করতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতার। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ছয় দফা ম্যান্ডেট নিয়ে পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে তার উত্তরণ ঘটে। জনগণ প্রত্যাশা করেছিল নির্বাচিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাসের গতি পাল্টাবেন। পাকিস্তানের শাসকবর্গ-কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু সামরিক কর্মকর্তা-ষড়যন্ত্রের গ্রন্থিগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যেন শাসন ক্ষমতা

কোনক্রমে বাঙালির হস্তগত না হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেন।

ভাষা আন্দোলন:

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছিলি। পাকিস্তান সরকার এ যৌক্তিক দাবির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালেই উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ চলতে থাকে যা পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৫২ সালে এবং সেই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্ররা একত্রিত হয়। পুলিশ এ জনসমাবেশের উপর গুলি চালানোর ফলে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার সহ আরো অনেকে শহীদ হয়। এই ঘটনা আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। ১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে সংবিধানে বাংলাকে উর্দূর পাশাপাশি অন্যতম প্রধান জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন:

১৯৫৪ সালে ১০ই র্মাচ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তান শাষকগোষ্ঠী বাঙালির এই আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। ১৯৫৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্ধারিত হলে বাঙালিদের মধ্যে বিপুল সাড়া দেখা দেয়। জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাঙালি, অতএব এই নির্বাচনের ফলাফল চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একই সময়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ৭ই

অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন তুলে নেয়া হ'লে ছাত্র সমাজ অধিকারের দাবিতে পুনরায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

১৯৬২ সালের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন

আন্দোলন নতুন করে গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের গুলিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর নিহত হন যার মধ্যে ওয়াজিউল্লা, মোস্তফা ও বাবুল অন্যতম। ছাত্র সমাজের ২২ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে ১৭ই সেপ্টেম্বর ৬৩ 'শিক্ষা দিবস' পালন উপলক্ষে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলসমূহ ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ছাত্রদের এই আন্দোলনের সবরকম সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসে।

ছাত্র সমাজের সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি:

পাকিস্তানের কাঠামোয় বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটা অসম্ভব বিবেচনা করে তৎকালীন ছাত্র সমাজের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ১৯৬২ সালে গোপনে ছাত্রদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দেন জনাব সিরাজুল আলম খান, জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ। এই সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে পরিচিত ছিল।

৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন:

১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধের সময়কালে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যূনতম উন্নতি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বাঙালিদের প্রতি জাতিগত এই বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে আহুত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন' শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা দাবী উপস্থাপন করেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'গত দুই যুগ ধরে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তার প্রতিকারকল্পে এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক দূরত্বের কথা বিবেচনা করে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করছি।' পরবর্তীতে এই ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা:

বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সংগঠনের কোন এক সদস্যের অসতর্কতার ফলে পাকিস্তান সরকারের কাছে এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার সামরিক বেসামরিক ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ১৯শে জুন '৬৮ পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এক রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে। এই মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত।

১৯শে জুন ১৯৬৮, ঢাকা সেনানিবাসে এই মামলার বিচার শুরু হয়। বিচার কার্য চলার সময় থেকে শ্লোগান ওঠে- 'জেলের তালা ভাঙব- শেখ মুজিবকে আনব।' এই গণ-আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বলা যায়, এই সময় সমস্ত দেশব্যাপী সরকার বিরোধী আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে।

৬৯ এর গণ-আন্দোলন:

পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্লোগান পরিবর্তিত হয়। 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা।' পিন্ডি না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা। 'জাগো জাগো-বাঙালি জাগো'। এই ধারাবাহিকতায় স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে উন্মুক্ত করে। অহিংস আন্দোলন সহিংসতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক দলের ৬ দফা দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়। বাঙালি একক জাতিসত্তার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এই গণ-আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ২০শে জানুয়ারী' ৬৯ ছাত্র আসাদুজ্জামান এবং ২৪শে জানুয়ারী'৬৯ স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকায় শহীদ আসাদ-মতিউর দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। শেরে বাংলা নগর ও মোহাম্মদপুরের সংযোগ স্থলের আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন

করে 'আসাদ গেট' এবং বঙ্গভবনের সামনের উদ্যানের নাম 'মতিউর রহমান শিশু উদ্যান' করা হয়। জানুয়ারী ৬৯ এ গৃহিত ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনকে আরও বেগবান করে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ৬৯ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত অবস্থায় বন্দী আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই মৃত্যু সংবাদ গণ-আন্দোলনে আরেকটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে। প্রচণ্ড-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি ৬৯ এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ২২শে ফেব্রুয়ারি ৬৯, শেখ মুজিবর রহমানসহ অভিযুক্ত সকলেই ঢাকা সেনানিবাস থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল গণ-সম্বর্ধনায় শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই মামলায় অভিযুক্ত ও বন্দী অবস্থায় সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ডঃ শামসুজ্জোহাকে জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। উভয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক হিসাবে চিহ্নিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শামসুজ্জোহা হল' তাদের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।

৬৯ এর এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ, আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমেদ, আসম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, সামসুদ্দোহা, মোস্তফা জামাল হায়দর, রাশেদ খান মেনন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, দীপা দত্ত, হায়দার আকবর খান রণোসহ অনেকে।

রাজনৈতিক দলীয় প্রধান যাদের নিরলস পরিশ্রম ও নির্দেশনায় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের এই আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করেছিল তাদের মধ্যে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কমরেড মনি সিং, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, শ্রীমনোরঞ্জন ধর অন্যতম।

৭০ এর সাধারণ নির্বাচন:

২৫শে মার্চ ৬৯ সারা দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও সামরিক সরকার গণ-দাবিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সারা দেশে এক ব্যক্তি এক ভোটের নীতিতে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। '৭ই ডিসেম্বর ৭০ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর' ৭০ এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ৬ দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৩১০ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ম্যান্ডেট লাভ করে।

'বাঙালির শাসন মেনে নেওয়া যায় না' এই নীতিতে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগণ নির্বাচিত এই জন প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার জাতীয় নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় অধিকারের সংঘাত। ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ৭০ এ বঙ্গবন্ধু এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পূর্ব বাংলার ম্যাপ অংকিত একটি পতাকা প্রদান করেন। এই পতাকাই পরবর্তীতে বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। ছাত্রদের এই সংগঠন প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরে শুরু হয় সামরিক প্রশিক্ষণের মহড়া। জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলনে ছাত্র ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ জন সমাজকে আরো উৎসাহিত করে তোলে।

৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন:

নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তারা সরকার গঠন করবে, এটাই ছিল বাস্তবতা। কিন্তু সামরিক শাসকগণ সরকার গঠন বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এক আলোচনা শুরু করে। কিসের জন্য আলোচনা, এটা বুঝতে বাঙালি নেতৃবৃন্দের খুব একটা সময় লাগেনি। জাতীয় সংসদের

নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আহবান জানান। সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে বঙ্গবন্ধুর এই আহবানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। ২রা মার্চ ৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শিত হয়। ৩রা মার্চ '৭১ এ রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতার ইসতেহার' পাঠ করা হয়। এই ইসতেহারে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পরিচালিত সরকার জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কোন সমাধান না দেওয়ায়, ৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক দিকনির্দেশনী ভাষণে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে আহবান জানান। এই ভাষণে তিনি বলেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের ভাষণগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হিসাবে বিবেচিত।

৭ই মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ কোন দলীয় নেতার নির্দেশ ছিল না। ছিল একজন জাতীয় নেতার নির্দেশ। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে। ২রা মার্চ ৭১ থেকে পূর্ব বাংলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে।

২৩শে মার্চ ৭১ সকালে পল্টন ময়দানে জয় বাংলা বাহিনীর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ মিছিল সহকারে বাংলাদেশের পতাকাসহ বঙ্গবন্ধু ভবনে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়িতে এই পতাকা উত্তোলন করেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে এই পতাকা লাগান হয়। ২৩শে মার্চ পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহরে পাকিস্তান দিবসের অনুষ্ঠান বর্জিত হয় এবং

পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়।

অন্যদিকে ক্ষমতার হস্তান্তরের নামে এই আলোচনা চলা অবস্থায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সৃষ্ট সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে নতুন করে সংকটের সৃষ্টি করে। অযৌক্তিক দাবি উপস্থাপনের ফলে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের পথ এক সময় রুদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সামরিক শাসকগণ স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের জন্য রাজনৈতিক আলোচনার আড়ালে সামরিক বাহিনী মাত্র ২২ দিনে দুই ডিভিশন অবাঙালি সৈন্য পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরে সক্ষম হয়। বাস্তবতায় এটিই ছিল তাদের আলোচনার নামে কালক্ষেপণের মূল উদ্দেশ্য। ২৪শে মার্চ ৭১ সামরিক শাসকগণ হেলিকপ্টার যোগে সমস্ত সেনানিবাসে এই আক্রমণের পরিকল্পনা হস্তান্তর করে। বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এই কুখ্যাত হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ নামা "অপারেশন সার্চ লাইট" নামে পরিচিতি।

২৫শে মার্চ ৭১ রাত্র ১১টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে সেনানিবাস অথবা আক্রমণ প্রস্তুতিস্থানগুলি ত্যাগ করে। একই সাথে ঢাকাসহ দেশের সমস্ত বড় শহর ও সেনানিবাসের বাঙালি রেজিমেন্টসমূহ আক্রান্ত হয়। সেনাবাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধু রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বন্দী হবার পূর্বে তিনি দলীয় নেতৃবন্দেকে করণীয় বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অবস্থান পরিবর্তনের কথা বলেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

অপারেশন সার্চলাইট ও ২৫ মার্চের গণহত্যা:

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বড় শহরগুলোতে গণহত্যা শুরু করে। তাদের পূর্বপরিকল্পিত এই গণহত্যাটি "অপারেশন সার্চলাইট" নামে পরিচিত। এ গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়। ঢাকার পিলখানায়, ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ইবিআরসি সহ সারাদেশের সামরিক আধাসামরিক সৈন্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডের কথা যেন বহির্বিশব না

জানতে পারে সে জন্য আগেই সকল বিদেশি সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং অনেককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। তবে ওয়াশিংটন পোস্টের বিখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব এই গণহত্যা সম্পর্কে অবগত হয়। আলোচনার নামে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কালক্ষেপণও এই গণহত্যা পরিকল্পনারই অংশ ছিল।

২৫ মার্চ রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। পাকিস্তানিদের অপারেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশের বহু সংখ্যক শিক্ষক ও সাধারণ কর্মচারিদেরও হত্যা করা হয়। পুরোনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও চালানো হয় ব্যাপক গণহত্যা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে হত্যা করা হয় পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্যকে। পিলখানার ইপিআর-এর কেন্দ্রে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয় নিরস্ত্র সদস্যদের। কয়েকটি পত্রিকা অফিস ভস্মীভূত করা হয়। দেশময় ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হয় বিভিন্ন এলাকায় ঘুমন্ত নর-নারীকে। হত্যা করা হয় শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও। ধারণা করা হয়, সেই রাত্রিতে একমাত্র ঢাকা ও তার আশে পাশের এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ নিরীহ নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে।

স্বাধীনতার ঘোষণা:

তিনি পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য বাংলার জনগণকে আহবান জানান। চট্টগ্রামে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষণাকে অবলম্বন করে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নবগঠিত এই রাষ্ট্রের সরকার

জোটবদ্ধ না হয়ে বিশেবর অপর রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে আগ্রহী। এছাড়াও এ ঘোষণায় সারা বিশেবর সরকারগুলোকে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়। (বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রঃ মুজিবনগর প্রশাসন, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৮২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন:

১০ই এপ্রিল ৭১ নির্বাচিত সাংসদগণ আগরতলায় একত্রিত হয়ে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। এই সরকার স্বাধীন সার্বভৌম "গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।" স্বাধীনতার সনদ (Charter of Independence) বলে এই সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ১৭ই এপ্রিল ৭১ মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথ তলায় "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির এই সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পীকার অধ্যাপক ইউসুফ আলী। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় তাঁরা হলেন-

১. রাষ্ট্রপতি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানে বন্দি)
২. উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)
৩. প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দিন আহমেদ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৪. অর্থমন্ত্রী : ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৫. পররাষ্ট্রমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমেদ (আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৬. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : এ এইচ এম কামরুজ্জামান (ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

এই অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে) এবং কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশ বিদেশের শতাধিক সাংবাদিক ও হাজার হাজার দেশবাসীর উপস্থিতিতে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংসদ জনাব আবদুল মান্নান। নবগঠিত সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই স্থানটির নামকরণ করা হয় "মুজিব নগর"।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

রাজনৈতিকভাবে এই যুদ্ধকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বসম্মতিক্রমে একটি "সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ" গঠন করেন। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন :

ক. জনাব আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি)– ন্যাপ ভাসানী

খ. শ্রী মনি সিং (সভাপতি)– বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি

গ. অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদ (সভাপতি)– ন্যাপ মোজাফ্‌ফর

ঘ. শ্রী মনোরঞ্জন ধর (সভাপতি)– বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস

ঙ. জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ (প্রধানমন্ত্রী)– পদাধিকারবলে

চ. খন্দকার মোশতাক আহমেদ (পররাষ্ট্রমন্ত্রী)– পদাধিকারবলে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র এই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতায় উপস্থাপনসহ এবং একটি সময় উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের অত্যাচারে প্রায় এক কোটি বাঙালি দেশ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ দেশত্যাগী এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দান করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোয় কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

১. যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রশাসনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন:

ক. রাষ্ট্রপতির পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, এম এন এ

খ. প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, এম এন এ

গ. তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনাব আবদুল মান্নান, এম এন এ

ঘ. জয় বাংলা পত্রিকার উপদেষ্টা জনাব জিল্লুর রহমান, এম এন এ

ঙ. যুব শিবির নিয়ন্ত্রণ পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম এন এ

২. বেসামরিক প্রশাসন :

ক. ক্যাবিনেট সচিব : জনাব হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম)

খ. মুখ্য সচিব : জনাব রুহুল কুদ্দুস

গ. সংস্থাপন সচিব : জনাব নূরুল কাদের খান

ঘ. অর্থ সচিব : জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান

ঙ. পররাষ্ট্র সচিব : জনাব মাহাবুবুল আলম চাষী এবং জনাব আবুল ফতেহ

চ. প্রতিরক্ষা সচিব : জনাব এম এ সামাদ

ছ. স্বরাষ্ট্র সচিব : জনাব এ খালেক

জ. স্বাস্থ্য সচিব : জনাব এস টি হোসেন

ঝ. তথ্য সচিব : জনাব আনোয়ারুল হক খান

ঞ. কৃষি সচিব : জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ

ট. আইন সচিব : জনাব এ হান্নান চৌধুরী

৩. কুটনৈতিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন :

ক. মিশন প্রধান যুক্তরাজ্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (বহিঃর্বিশ্বে সরকারের বিশেষ দূত)

খ. মিশন প্রধান কলিকাতা জনাব হোসেন আলী

গ. মিশন প্রধান নতুন দিল্লী জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী

ঘ. মিশন প্রধান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা জনাব এম আর সিদ্দিকী

ঙ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ইরাক জনাব আবু ফতেহ

চ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত সুইজারল্যান্ড জনাব অলিউর রহমান

ছ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিলিপাইন জনাব কে কে পন্নী

জ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেপাল জনাব মোস্তাফিজুর রহমান

ঝ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত হংকং জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ

ঞ. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত জাপান জনাব এ রহিম

ট. মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত লাগোস জনাব এম এ জায়গীরদার

৪. স্বাধীন বাংলাদেশের গণমুখী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো কি হবে সেই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে পরিকল্পনা কমিশন একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন :

ক. ডঃ মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী

খ. ডঃ মোশারাফ হোসেন

গ. ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ

ঘ. ডঃ এম আনিসুজ্জামান

ঙ. ডঃ স্বদেশ বোস।

৫. মুক্ত এলাকায় সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং ভারতে অবস্থান গ্রহণকারী শরণার্থীদের দেখাশুনা ও যুব শিবির পরিচালনার জন্য সরকার সমস্ত বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রশাসনিক এলাকায় চেয়ারম্যান ও প্রশাসক নিয়োগ করেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রঃ

মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং অবরুদ্ধ এলাকার জনগণের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নীতি নির্ধারণী ভাষণসহ জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশাবলী প্রচারিত হয়। প্রতিদিনের সংবাদসহ যে সমস্ত অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার মধ্যে চরমপত্র ও জল্লাদের দরবার অন্যতম। যে সমস্ত ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাঁরা হলেন :

সর্বজনাব এম এ মান্নান এম এন এ, জিল্লুর রহমান এম এন এ, শওকত ওসমান, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মাযহারুল ইসলাম, ডঃ আনিসুজ্জামান, সিকান্দার আবু জাফর, কল্যাণ মিত্র, ফয়েজ আহমদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, তোয়াব খান, আসাদ চৌধুরী, কামাল লোহানী, আলমগীর কবীর, মহাদেব সাহা, আলী যাকের, সৈয়দ হাসান ইমাম, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল জববার, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, সমর দাস, অজিত রায়, রাজু আহামেদ, মামুনুর রশীদ, বেগম মুশতারী শফি, শাহীন মাহমুদ, কল্যাণী ঘোষ, ডালিয়া নওশীন, মিতালী মুখার্জী, বুলবুল মহলানবীশ, শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান খান, সৈয়দ আবদুস সাকেরসহ অনেকে।

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীঃ

যে জনযুদ্ধ এনেছে পতাকা, সেই জনযুদ্ধের দাবিদার এদেশের সাত কোটি বাঙালি। একটি সশস্ত্র যুদ্ধ দেশকে শত্রুমুক্ত করে। এই সশস্ত্র যুদ্ধ একটি নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। পরিকল্পিত এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ই

এপ্রিল '৭১ বাংলাদেশ সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধঅঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই ৪টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেনঃ

ক. চট্টগ্রাম অঞ্চল - মেজর জিয়াউর রহমান

খ. কুমিল্লা অঞ্চল - মেজর খালেদ মোশাররফ

গ. সিলেট অঞ্চল - মেজর কে এম সফিউল্লাহ

ঘ. দক্ষিণ পশ্চিম - অঞ্চল মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

পরবর্তীতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে বিভক্ত করে রাজশাহী অঞ্চলে মেজর নাজমুল হক, দিনাজপুর অঞ্চলে মেজর নওয়াজেস উদ্দিন এবং খুলনা অঞ্চলে মেজর জলিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৭ই জুলাই ৭১ যুদ্ধের কৌশলগত কারণে সরকার নিয়মিত পদাতিক ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনায় 'জেড ফোর্স' ব্রিগেড গঠন করেন। এই জেড ফোর্সের অধিনায়ক হলেন লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান। একই ভাবে সেপ্টেম্বর মাসে 'এস ফোর্স' এবং ১৪ই অক্টোবর 'কে ফোর্স' গঠন করা হয়। কে ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফ এবং এস ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল কে. এম. সফিউল্লাহ।

১০ই জুলাই ৭১ থেকে ১৭ই জুলাই ৭১ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যুদ্ধ অঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশকে ১১টি যুদ্ধ সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। এই কমান্ডারগণ ছিলেন:

সেক্টর অধিনায়ক যুদ্ধ এলাকা ও তথ্য

সেক্টর-এক : মেজর রফিকুল ইসলাম (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অংশ বিশেষ (মুহুরী নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত)। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২১০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২০,০০০।

সেক্টর-দুই : মেজর খালেদ মোশাররফ (কুমিল্লা জেলার অংশ, ঢাকা জেলা ও ফরিদপুর জেলার অংশ এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি)। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৪,০০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৩০,০০০।

সেক্টর-তিন : মেজর কে এম শফিউল্লাহ (কুমিল্লা জেলার অংশ, ময়মনসিংহ জেলার অংশ, ঢাকা ও সিলেট জেলার অংশ)।এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৬৬৯৩ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০।

সেক্টর-চার : মেজর সি আর দত্ত (সিলেট জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি)। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৯৭৫ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৯,০০০।

সেক্টর-পাঁচ : মেজর মীর শওকত আলী সিলেট জেলার অংশ ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ১৯৩৬ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৯,০০০।

সেক্টর-ছয় : উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার রংপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ১১,০০০।

সেক্টর-সাত : মেজর নাজমুল হক রংপুর জেলার অংশ, রাজশাহী জেলার অংশ, পাবনা জেলার অংশ ও দিনাজপুর জেলার অংশ, বগুড়া জেলা। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল নয়টি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ১২,৫০০। সেপ্টেম্বর মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় মেজর নাজমুল হক নিহত হওয়ার পর লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেক্টর-আট : মেজর আবু ওসমান চৌধুরী যশোর জেলা, ফরিদপুর জেলা, কুষ্টিয়া জেলা, খুলনা ও বরিশাল জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০। ১৮ই আগস্ট লেঃ কর্নেল এম আবুল মঞ্জুর সেক্টর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেক্টর-নয় : মেজর আবদুল জলিল বরিশাল জেলার অংশ, পটুয়াখালী জেলা, খুলনা, ফরিদপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল তিনটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০।

সেক্টর-দশ : প্রধান সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে (নৌ সেক্টর)সমগ্র বাংলাদেশ। এই সেক্টরটি গঠিত হয়েছিল নৌ-কমান্ডোদের দিয়ে। বিভিন্ন নদী বন্দর ও শত্রু পক্ষের নৌ-যানগুলোতে অভিযান চালানোর জন্য এঁদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। লক্ষ্যবস্তুর গুরুত্ব এবং পাকিস্তানিদের প্রস্তুতি বিশ্লেষণ করে অভিযানে সাফল্য নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হতো এবং তার ওপর নির্ভর করত অভিযানে অংশগ্রহণকারী দলসমূহে যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে। যে সেক্টর এলাকায় কমান্ডো অভিযান চালানো হতো, কমান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করত। নৌ-অভিযান শেষে তারা আবার তাদের মূল সেক্টর- ১০ নম্বর সেক্টরের আওতায় চলে আসত। নৌ-কমান্ডোর সংখ্যা ছিল ৫১৫ জন।

সেক্টর এগার : মেজর আবু তাহের। ময়মনসিংহ জেলার অংশ, সিলেট জেলার অংশ ও রংপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস্ ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০। মেজর আবু তাহের ১৪ নভেম্বর আহত হওয়ার পর এই সেক্টরের দায়িত্ব কাউকেও দেয়া হয়নি।

মুক্তিবাহিনী সদর দপ্তর:

ক. প্রধান সেনাপতি মুক্তিবাহিনী কর্নেল এম এ জি ওসমানী

খ. সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল আবদুর রব

গ. বিমানবাহিনী প্রধান ও উপ-সেনা প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

ঘ. ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিকেল সার্ভিস মেজর শামছুল আলম

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে মোট ১৩১জন অফিসার মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ৫৮জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ভারতের মূর্তি অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে যুদ্ধে যোগদান করেন। এ কোর্স-কে প্রথম বাংলাদেশ সর্ট সার্ভিস কোর্স বলা হয়। ৬৭জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে দ্বিতীয় সর্ট সার্ভিস কোর্সে ভর্তি করা হয় এবং তারা ১৯৭২ সনে কমিশন প্রাপ্ত হন। মুক্তিযুদ্ধে ১৩ জন সামরিক অফিসার যুদ্ধ অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। ৪৩ জন সামরিক অফিসারকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনী:

ক. পাকিস্তান বিমান বাহিনী ত্যাগ করে আসা বাঙালি অফিসার, ক্যাডেট ও বিমানসেনারা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মোট প্রায় ৩৫ জন অফিসার ও ক্যাডেট এবং প্রায় ৫০০ বিমানসেনা পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। এইসব বিমান বাহিনীর সদস্যরা যদিও স্থলযুদ্ধে খুবই বিরোচিত ভূমিকা রাখছিলেন তবুও তাদের মধ্যে একটি স্বাধীন বিমান বাহিনী গঠনের চেতনা খুব প্রবল ভাবে কাজ করছিল। এই চেতনা নিয়েই কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা পাইলট ভারতীয় বিমান বাহিনী, ভারতীয় সরকার এবং বাংলাদেশ ফোর্সেস (বিডি এফ) এর সাথে বিভিন্ন রকমের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

খ. কিলো ফ্লাইট : ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর এর মাঝামাঝি ভারত সরকার অস্থায়ী

বাংলাদেশ সরকারকে একটি স্বাধীন বিমান বাহিনী গঠনের জন্য আমেরিকায় তৈরি ১টি পুরানো ডিসি-৩ বিমান, কানাডার তৈরি ১টি অটার বিমান এবং ফ্রান্সের তৈরি ১টি এ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার দেয়। এর সাথে ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে একটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত রানওয়ে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এই সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সশস্ত্র বিমান বাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে এর গুপ্ত নাম হয় 'কিলো ফ্লাইট'। 'কিলো ফ্লাইটের' অস্তিত্ব বিডি এফ এবং গোটা কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কেউ জানতেন না। কিলো ফ্লাইটে বিমান বাহিনীর পাইলটদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন পি আই এ এবং প্লান্ট প্রটেকশনের পাইলট এসে যোগ দেন। বিভিন্ন সেক্টর হতে যুদ্ধরত মোট ৫৮ জন বিমানসেনাকে এই ফ্লাইটে নিয়ে আসা হয়। এই ফ্লাইটের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয় স্কোঃ লীঃ সুলতান মাহমুদকে। এই সব অত্যুৎসাহী বিমান বাহিনী সদস্যদের সমন্বয়ে ১৯৭১ এর ২৮ সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উদ্ধোধন হয়। শুরু হয় কঠোর প্রশিক্ষণ। এই ফ্লাইট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট এলাকায় মোট ৫০টি অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে। এদের মধ্যে মোগলহাটে (১৫ অক্টোবর ৭১), লালমনিরহাট ও ঠাকুরগাঁয়ে (১৬ অক্টোবর ৭১), চৌগাছায় (২১ নভেম্বর ৭১), গোদনাইল ও পতেঙ্গায় (৩ ডিসেম্বর ৭১), সিলেটে (৪ ডিসেম্বর ৭১), জামালপুরে (৫ ডিসেম্বর ৭১), মেঘনা নদীতে (৬ ডিসেম্বর ৭১), সিলেটে (৭ ডিসেম্বর ৭১) এবং নরসিংদীতে (১১ ডিসেম্বর ৭১) বিমান হামলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধে নৌ-বাহিনীঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর জন্ম হয়। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডারদের কনফারেন্সের ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ নৌ বাহিনী আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও নাবিকগণ পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করে দেশে এসে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী গঠন করেন। ভারত থেকে প্রাপ্ত 'পদ্মা' ও 'পলাশ' নামের

ছোট দুটি গানবোট এবং ৪৯ জন নাবিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ সমস্ত নাবিকগণ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হন। পাশাপাশি 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে নির্ভীক ডুবুরীদল সমুদ্র ও নদী বন্দরসমূহে বিধ্বংসী আক্রমণ পরিচালনা করেন। এতে হানাদার বাহিনীর ২৬টি জাহাজ ধ্বংস হয় ও সমুদ্র পথ কার্যতঃ অচল হয়ে পড়ে। নৌ বাহিনীর অপারেশনের মধ্যে হিরণ পয়েন্টের মাইন আক্রমণ (১০ নভেম্বর ৭১), মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌযান ধ্বংস (১২ নভেম্বর ৭১), চালনা বন্দরে নৌ হামলা (২২ নভেম্বর ৭১), চট্টগ্রাম নৌ অভিযান (০৫ ডিসেম্বর ৭১), পাকিস্তান নৌ ঘাঁটি পিএনএস তিতুমীর অভিযান (১০ ডিসেম্বর ৭১) উল্লেখযোগ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযানে শত্রুপক্ষ নৌ পথে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বহুসংখ্যক নৌ সদস্য শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ শহীদ রুহুল আমিন, ইআরএ-১, কে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব প্রদান করা হয়। এছাড়া ০৫ জনকে বীর উত্তম, ০৮ জনকে বীর বিক্রম এবং ০৭ জনকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনীর ভূমিকাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

ব্রিগেড সংগঠন ও অপারেশনঃ

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকটা ছিল গেরিলাভিত্তিক কিন্তু এভাবে গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানি বাহিনীর সুশিক্ষিত সৈন্যদের পদানত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছিল না। ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ও মুক্তাঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর গঠন বিন্যাসের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সম্মুখ সমরের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। এরা হচ্ছে...

ক. জেড ফোর্স : লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমানের নামানুসারে জুলাই ৭১ সনের ৭ই জুলাই গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় জেড ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত ছিল ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি ও একটি সিগন্যাল কোম্পানী। জুলাই ৭১

থেকে সেপ্টেম্বর ৭১ পর্যন্ত জেড ফোর্স ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও রৌমারী এলাকায় যুদ্ধরত থাকে। অক্টোবর থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত তারা সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। জেড ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ ছিল কামালপুর যুদ্ধ, বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশন, দেওয়ানগঞ্জ থানা আক্রমণ, নকসী বিওপি আক্রমন, চিলমারীর যুদ্ধ, হাজীপাড়ার যুদ্ধ, ছোটখাল, গোয়াইনঘাট, টেংরাটিলা, গোবিন্দগঞ্জ, লামাকাজি, সালুটিকর বিমানবন্দর, ধলই, ধামাই চা বাগান, জকিগঞ্জ, আলি ময়দান, সিলেট এমসি কলেজ, ভানুগাছা, কানাইঘাট, ফুলতলা চা বাগান, বড়লেখা, লাতু, সাগরনাল চা বাগান, ছাতক ও রাধানগর।

খ. কে ফোর্স : লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফের নামানুসারে সেপ্টেম্বর ৭১ সনে গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় কে ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত ছিল ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১ ফিল্ড ব্যাটারি (মুজিব ব্যাটারী) আর্টিলারি ও একটি সিগন্যাল কোম্পানী। কে ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ ছিল দেউশ মন্দভাগ অভিযান, শালদা নদী অভিযান, পরশুরাম, চিতলিয়া, ফুলগাজী, নিলক্ষ্মীর যুদ্ধ, বিলোনিয়ার যুদ্ধ, চাপিলতার যুদ্ধ, কুমিল্লা শহরের যুদ্ধ, নোয়াখালীর যুদ্ধ, কশবার যুদ্ধ, বারচরগ্রাম যুদ্ধ, মিয়াবাজার যুদ্ধ, গাজীপুর যুদ্ধ, সলিয়াদীঘি যুদ্ধ, ফেনী যুদ্ধ, চট্টগ্রাম বিজয় ও ময়নামতি বিজয়।

গ. এস ফোর্স : লেঃ কর্নেল কে এম সফিউল্লাহর নামানুসারে অক্টোম্বর ৭১ সনে গঠিত হয় এই বিগ্রেড যার নাম করা হয় এস ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত ছিল ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, এস ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ ছিল ধর্মগড় আক্রমন, মনোহরদী অবরোধ, কলাছড়া অপারেশন, বামুটিয়া অপারেশন, আশুগঞ্জ অপারেশন, মুকুন্দপুর যুদ্ধ, আখাউড়া যুদ্ধ, ব্রাহ্মণবাড়িয় যুদ্ধ, ভৈরব ও আশুগঞ্জ যুদ্ধ, কিশোরগঞ্জ যুদ্ধ, হরশপুর যুদ্ধ, নরসিংদী যুদ্ধ ও বিলোনিয়ার যুদ্ধ।

বি এল এফ (মুজিব বাহিনী):

বিশাল এই জনযুদ্ধে ছাত্র ও যুবক শ্রেণী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ছাত্র আন্দোলনের অবস্থান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। ৬০ দশকের

মাঝামাঝি এই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের পরিকল্পনায় সংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্রদের সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি সমন্বিত করে। নেতৃস্থানীয় প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) ছাত্রকে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি রাজনৈতিক যুদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত করে এই সমস্ত ছাত্রদেরকে নিজ নিজ এলাকার ভিত্তিতে অবস্থান নেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়।

এই ৪টি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণকারী নেতৃবৃন্দ ছিল :

ক. পূর্ব অঞ্চল   জনাব শেখ ফজলুল হক মনি ও জনাব আ স ম আবদুর রব

খ. উত্তর অঞ্চল জনাব সিরাজুল আলম খান ও জনাব মনিরুল ইসলাম

গ. পশ্চিম অঞ্চল জনাব আবদুর রাজ্জাক ও জনাব সৈয়দ আহমদ

ঘ. দক্ষিণ অঞ্চল জনাব তোফায়েল আহমদ ও জনাব কাজী আরেফ আহমেদ

প্রশিক্ষণ শিবিরে কর্মরত ছিলেনঃ জনাব নূরে আলম জিকু, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, আফম মাহবুবুল হক ও মাসুদ আহমেদ রুমীসহ অনেকে। বাংলাদেশ কমুনিষ্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে ছাত্র সংগঠন সংগঠিত হয়। এই সশস্ত্র যুব শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেন জনাব হারুনুর রশীদ, নূরুল ইসলাম নাহিদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ অনেকে। এ ছাড়াও জনাব কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এলাকা ভিত্তিক গড়ে ওঠা টাংগাইল মুক্তি বাহিনীর নাম উল্লেখ্যযোগ্য।

স্বাধীন বাংলা বেতার:

১৯৭১ পাকিস্তান বিমান বাহিনী আক্রমণে তা ধ্বংস করা হয়। এর পর কিছু দিন আগরতলাতে এবং তারপর ২৫ মে ১৯৭১ কলকাতা থেকে সম্প্রচার নিয়মিত শুরু করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার বিশাল অবদান রাখে। চরম পত্র, রণাঙ্গন কথিকা, রক্ত স্বাক্ষর, মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান অগ্নিশিক্ষা, দেশাত্ববোধক গান ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল।

গণমাধ্যম:

বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র প্রকাশ করা। এই সব সংবাদপত্রে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা, বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, নেত্রবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলনের খবর ইত্যাদি প্রকাশিত হত। এদের

মধ্যে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত জয় বাংলা, বাংলাদেশ, বঙ্গবাণী, স্বদেশ, রণাঙ্গন, স্বাধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ, সোনার বাংলা, বিপ্লবী বাংলাদেশ, জন্মভূমি, বাংলারবাণী, নতুন বাংলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ নিউজ লেটার, বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ নিউজ লেটার, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন, শিক্ষা উল্লেখযোগ্য। কানাডা থেকে বাংলাদেশ স্ফুলিঙ্গ নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত হত।

পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ও তার সহযোগীরা

বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী একটি দখলদার বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এক সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সমগ্র জাতিকে একত্রিত করে বিদেশী বন্ধু ও সহযোগী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ১৬ ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার এই সশস্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য কিছু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা, ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে মুক্তিকামী মানুষের উপর জঘন্য এবং পৈশাচিক অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালায়। এই নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে শহীদ হয় ৩০ লক্ষ নিরীহ নিরাপরাধ শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের মানুষ। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক বাংলার নারী। দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় প্রায় এক কোটি মানুষ। সকলের একটি মাত্র অপরাধ "তারা ছিল বাঙালি"। পাকিস্তানের সামরিক শাসকের দাম্ভিক উক্তি "আমি মানুষ চাইনা- পূর্ব বাংলার মাটি চাই"। এই পোড়া মাটির নীতিকে সমর্থন দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠন এগিয়ে আসে।

শান্তি কমিটি:

৪ঠা এপ্রিল '৭১ জনাব নুরুল আমিনের নেতৃত্বে অধ্যাপক গোলাম আযম ও খাজা খয়েরউদ্দীন টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং "নাগরিক কমিটি" গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ৬ই এপ্রিল '৭১ অধ্যাপক গোলাম আযম ও হামিদুল হক চৌধুরী টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে "নাগরিক শান্তি কমিটি" গঠনের প্রস্তাব দেন। ৯ই এপ্রিল '৭১ ঢাকায় ১৪০ সদস্য নিয়ে "নাগরিক শান্তি কমিটি" গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল '৭১ এই

কমিটির নাম পরিবর্তন করে "শান্তি কমিটি" রাখা হয় এবং জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে এই কমিটি গঠিত হয়। রাজাকার নির্বাচন, নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব ছিল।

রাজাকার বাহিনী:

মে '৭১ মওলানা এ কে এম ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে খুলনার আনসার ক্যাম্পে এই বাহিনী গঠিত হয়। তিনি এই বাহিনীর নামকরণ করেন ''রাজাকার বাহিনী''। এই বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সহযোগী হিসাবে এই বাহিনী দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এই বাহিনীর অত্যাচারের চিহ্ন আজো বিদ্যমান।

আলবদর বাহিনী:

১৯৭১ এর আগস্ট মাসে ময়মনসিংহে এই বাহিনী গঠিত হয়। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই বাহিনীর গঠন ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। এই বাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড অন্যতম। মিরপুর বধ্যভূমি এই বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্য বহন করে।

শরণার্থী:

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে গমন করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪১টি শরণার্থী শিবির স্থাপিত করা হয়। এই শিবিরগুলিকে মোট ৯,৮৯৯,৩০৫ বাংলাদেশী আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে ৭,৪৯৩,৪৭৪ ত্রিপুরাতে ১,৪১৬,৪৯১ মেঘালয়ে ৬৬৭,৯৮৬ আসামে ৩১২,৭১৩ ও বিহারে ৮৬৪১ সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বিজয়ের পরিকল্পনা- সম্মিলিত চুড়ান্ত আক্রমণ:

অক্টোবর '৭১ মাসের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে সমস্ত সীমান্ত এলাকা ছেড়ে দিয়ে সেনানিবাস অথবা বড় বড় শহর ভিত্তিক

অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। এই সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা মুক্ত করেছিল। নভেম্বর '৭১ এর প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্মিলিত বাহিনী। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের সমগ্র যুদ্ধ এলাকাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে এই যৌথ কমান্ডের নেতৃত্বে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে সমন্বিত করে যুদ্ধ পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়। ৩রা ডিসেম্বর '৭১ পাকিস্তান অতর্কিতভাবে ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তিত হয়। ৬ই ডিসেম্বর '৭১ ভারত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে মুক্তিবাহিনীর মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে সমন্বিত এক যুদ্ধ পরিকল্পনায় সম্মিলিত বাহিনী প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে।

এই চূড়ান্ত যুদ্ধে ভারতীয় ইষ্টার্ণ কমান্ড অংশ গ্রহণ করে। তাদের সদর দপ্তর ছিল কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ামে এবং অধিনায়ক ছিলেন লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা। এই যুদ্ধে ভারতীয়দের তিনটি কোর (৭ টি ডিভিশন), একটি কমুইনিকেশন জোন, একটি প্যারা বিগ্রেড, ৩টি বিগ্রেড গ্রুপ, ১২টি মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ৪৮ টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ১টি আরমার্ড রেজিমেন্ট, ২টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আরমার্ড বিগ্রেড, ৩টি ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেড, ২৯ টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ান অংশ গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে ভারতীয়দের শহীদদের সংখ্যা ৬৯ জন অফিসার, ৬০ জন জেসিও ৩ জন এনসিও ও ১২৯০ জন সৈনিক। আহত হন ২১১ জন অফিসার, ১৬০ জন জেসিও, ১১ জন এনসিও এবং ৩৬৭৬ সৈনিক। এছাড়াও যুদ্ধে মিসিং হন ৩ জন জেসিও ও ৫৩ জন সৈনিক।

১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবিদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে। ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য বিনা শর্তে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন পূর্বাঞ্চলের সম্মিলিত বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লেঃ জেঃ এ কে নিয়াজী। এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপ-সেনা প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। এই অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন এস ফোর্স অধিনায়ক লেঃ

কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ, ২নং সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এ টি এম হায়দার এবং টাঙ্গাইল মুক্তি বাহিনীর অধিনায়ক জনাব কাদের সিদ্দিকী। ১৬ ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। প্রতি বছর এই দিনটি ''বিজয় দিবস'' হিসাবে পালিত হয়।



বীর মুক্তিযোদ্ধা
আলহাজ্ব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঐতিহাসিক ১৯ মার্চ। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গাজীপুরের (সেই সময়ের জয়দেবপুর) জনগণ সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে মার্চের সেই এক অবিস্মরণীয় গণ-অভ্যুত্থানের কথা। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ দুপুরে হঠাৎ এক বেতার ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। এ কথা শোনামাত্রই সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। দেশের সর্বত্রই শ্লোগান ওঠে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা', 'পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা-বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি-বাঙালি'। বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পূর্বাণী হোটেলে এক সভায় ইয়াহিয়ার ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঢাকায় ২ মার্চ ও সারা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ৩ মার্চ হরতাল আহ্বান করেন এবং ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা আহ্বান করেন। জয়দেবপুরে আমার পরামর্শে ২ মার্চ রাতে তৎকালীন থানা পশুপালন কর্মকর্তা আহম্মেদ ফজলুর রহমানের সরকারি বাসায় মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিব উল্লাহ সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেন। সভায় আমাকে (আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক) আহ্বায়ক করে এবং মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির শ্রমিকনেতা নজরুল ইসলাম খানকে কোষাধ্যক্ষ করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

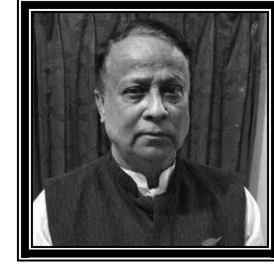
সদস্য হন অধ্যাপক আয়েশ উদ্দিন, মো. নুরুল ইসলাম (ভাওয়ালরত্ন), মো. আবদুস ছাত্তার মিয়া (চৌরাস্তা), থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মরহুম হজরত আলী মাস্টার (চৌরাস্তা), মো. শহীদ উল্লাহ বাচ্চু (মরহুম), হারুন-অর-রশিদ ভূঁইয়া (মরহুম), শহিদুল ইসলাম পাঠান জিন্নাহ (মরহুম), শেখ আবুল হোসেন (শ্রমিক লীগ), থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাঈদ বকস ভূঁইয়া (মরহুম)। কমিটির হাইকমান্ড (উপদেষ্টা) হন মো. হাবিব উল্লাহ (মরহুম), শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা এম এ মুত্তালিব এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) নেতা বাবু মনীন্দ্রনাথ গোস্বামী (মরহুম)। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার আগেই আমরা এ কমিটি গঠন করেছিলাম। আমি ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। নিউক্লিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা, যা মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৬২ সালেই ছাত্রলীগের মধ্যে গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যেই সশস্ত্র যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে বাঙালি সৈন্যদের মধ্যেও নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে, যার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের দায়ের করা 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান' মামলায়। স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণেই বুঝতে পেরেছিলাম যে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। জয়দেবপুরে (গাজীপুরে) সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ মার্চ গাজীপুর স্টেডিয়ামের পশ্চিম পাশের বটতলায় এক সমাবেশ করে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমরা ৭ মার্চ জয়দেবপুর (গাজীপুর) থেকে হাজার হাজার মানুষ ট্রেনে করে এবং শতাধিক ট্রাক ও বাসে কণ্ঠে মাথায় লাল ফিতা বেঁধে সোহরাওয়ার্দী (তৎকালীন রেসকোর্স) উদ্যানে জনসভায় যোগ দিলাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আজকে ভাবতেও অবাক লাগে, কীভাবে এ জনস্রোত এসে মিশে গিয়েছিল ৭ মার্চের মহাসমুদ্রে। ৭ মার্চ উজ্জীবিত হয়ে আমরা সম্ভবত ১১ মার্চ গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা (অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি) আক্রমণ করি। গেটে বাধা দিলে আমি হাজার হাজার মানুষের সামনে টেবিলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছি মাইকে। পাকিস্তানিদের বুঝতে পারার জন্য ইংরেজিতে বলি I do hereby dismiss Brigadier Karimullah from the directorship of Pakistan

Ordnance Factory and do hereby appoint Administrative officer Mr Abdul Qader (বাঙালি) as the director of the ordnance Factory. এ ঘোষণায় কাজ হয়েছিল। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার পেছনের গেট দিয়ে সালনা হয়ে পালিয়ে ঢাকায় চলে আসে। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আর পরবর্তী সময়ে ১৫ এপ্রিলের আগে গাজীপুরে যায়নি। পাকিস্তান সমরাস্ত্র কারখানা ২৭ মার্চ পর্যন্ত আমাদের দখলেই ছিল। সম্ভবত ১৩ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী জয়দেবপুর রাজবাড়ি মাঠে হেলিকপ্টারে অবতরণ করতে চেষ্টা করলে শত শত মানুষ হেলিকপ্টারের প্রতি ইটপাটকেল ও জুতা ছুড়তে শুরু করলে হেলিকপ্টার না নামতে পেরে ফেরত চলে যায়। সেদিন ১৭ মার্চ বুধবার, মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে মানুষের ঢল নেমেছিল ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। আমাদের নির্বাচনী এলাকার এমএনএ সামসুল হক (পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য), হাবিব উল্লাহসহ আমি গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুকে জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার সংবাদ দিতে। সন্ধ্যায় আমরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পেয়ে কিছু বলতে চাই কি না বঙ্গবন্ধু জানতে চান। কুর্মিটোলা (ঢাকা) ক্যান্টনমেন্টে অস্ত্রের মজুত কমে গেছে অজুহাতে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে রক্ষিত অস্ত্র আনার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংবাদ জানাই। সামসুল হক সাহেবের ইশারায় আমি তরুণ হিসেবে এ অবস্থায় আমাদের কী করণীয় জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুই একটা আহম্মক, কী শিখেছিস যে আমাকে বলে দিতে হবে?' একটু পায়চারি করে বললেন, 'বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে দেওয়া যাবে না। রেসিস্ট এ্যাট দ্য কস্ট অব এনিথিং।' নেতার হুকুম পেয়ে গেলাম। ১৯ মার্চ শুক্রবার আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানি রেজিমেন্ট জয়দেবপুরের (গাজীপুর) দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য পৌঁছে যায়। একজন জেসিও (নায়েব সুবেদার) জয়দেবপুর হাইস্কুলের মুসলিম হোস্টেলের পুকুরে (জকি স্মৃতির প্রাইমারি স্কুলের সামনে) গোসল করার সময় জানান যে ঢাকা থেকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব চলে এসেছে। খবর পেয়ে দ্রুত আমাদের তখনকার আবাসস্থল মুসলিম হোস্টেলে ফিরে গিয়ে উপস্থিত হাবিবউল্লা ও শহীদউল্লাহ বাচ্চুকে এ সংবাদ জানাই। শহীদউল্লাহ বাচ্চু তখনই রিকশায় চড়ে শিমুলতলীতে, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ডিজেল প্ল্যান্ট ও সমরাস্ত্র কারখানায় শ্রমিকদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে জয়দেবপুরে চলে আসার খবর দিলে এক ঘণ্টার মধ্যেই হাজার শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ চারদিক থেকে লাঠিসোঁটা, দা, কাতরা, ছেন, দোনলা বন্দুকসহ জয়দেবপুরে উপস্থিত হয়। সেদিন জয়দেবপুর হাটের দিন ছিল। জয়দেবপুর রেলগেটে মালগাড়ির বগি, রেলের অকেজো রেললাইন, স্লিপারসহ বড় বড় গাছের গুঁড়ি, কাঠ, বাঁশ, ইট ইত্যাদি যে যেভাবে পেরেছে তা দিয়ে এক বিশাল ব্যারিকেড দেওয়া হয়। জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত আরও পাঁচটি ব্যারিকেড দেওয়া হয়, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী অস্ত্র নিয়ে ফেরত যেতে না পারে। দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর কে এম সফিউল্লাহ (পরবর্তীকালে প্রধান সেনাপতি)। আমরা যখন ব্যারিকেড দিচ্ছিলাম, তখন টাঙ্গাইল থেকে রেশন নিয়ে একটি কনভয় জয়দেবপুরে আসছিল। সে সময় কনভয়ে থাকা পাঁচজন সৈন্যের চায়নিজ রাইফেল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়।

এদিকে রেলগেটের ব্যারিকেড সরানোর জন্য দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গলের রেজিমেন্টকে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব আদেশ দেয়। কৌশল হিসেবে বাঙালি সৈন্যদের সামনে দিয়ে পেছনে পাঞ্জাবি সৈন্যদের অবস্থান নিয়ে মেজর সফিউল্লাহকে জনগণের ওপর গুলিবর্ষণের আদেশ দেয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা আমাদের (জনতা) ওপর গুলি না কওে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ে সামনে আসতে থাকলে আমরা বর্তমান গাজীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ওপর অবস্থান নিয়ে বন্দুক ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে সেনাবাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে জয়দেবপুরে শহীদ হন নেয়ামত ও মনু খলিফা, আহত হন ডা. ইউসুফসহ শত শত মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনী কারফিউ জারি করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করলে আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। আমরা পিছু হটলে দীর্ঘ সময় চেষ্টা করে ব্যারিকেড পরিষ্কার করে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব চান্দনা চৌরাস্তায় এসে আবার প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় হুরমত এক পাঞ্জাবি সৈন্যকে পেছন দিয়ে আক্রমণ করেন। সে এক পাঞ্জাবী সৈন্যের রাইফেল কেড়ে নেয়। কিন্তু পেছনে আর এক পাঞ্জাবি সৈন্য হুরমতের মাথায় গুলি করলে হুরমত সেখানেই শাহাদত বরণ করেন।

বর্তমানে সেই স্থানে চৌরাস্তার মোড়ে 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' নামে ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে। পরদিন বঙ্গবন্ধু আলোচনা চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে ১৯ মার্চের নিহতের কথা উল্লেখ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান উল্লেখ করেন যে জয়দেবপুরে জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আধুনিক অস্ত্র ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করেছে এবং এতে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সৈন্য আহত হয়েছে।

১৯ মার্চের পর সারা বাংলাদেশে শ্লোগান ওঠে, 'জয়দেবপুরের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জয়দেবপুরের পথ ধরো, সশস্ত্রযুদ্ধ শুরু করো'। ১৯ মার্চের সশস্ত্রযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক মাইলফলক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৯ মার্চ জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় দিন। তাই জাতীয়ভাবে এই দিবসটি পালিত হলে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন যথার্থভাবে হবে বলে আমি মনে করি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. মিজানুর রহমান বাচ্চু
যুদ্ধকালীন গ্রুপ কমান্ডার, ৯নং সেক্টর

যুদ্ধে যাত্রাঃ

আমরা হাঁটতে হাঁটতে নবীনগরের শেষ প্রান্তে একটা হাইস্কুলে এসে পৌঁছলাম। তখন নয়টা কি সাড়ে নয়টা বাজে, সেখান থেকে তিতাস নদীর একটা শাখা ছিল সেটা পার হয়ে আমরা কসবা থানায় ঢুকলাম, গ্রামটার নাম ডাবিরঘর। ডাবিরঘর নদীর পাশে একটা বাজার আছে, বাজারের একটা দোকান থেকে আমরা নাস্তা করলাম। তারপর আমরা রওয়ানা দিলাম বর্ডারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা তো রাস্তাঘাট চিনিনা, তাই রাস্তার মধ্যে যাদের সাথে দেখা হয় তাদেরকে বলি আমরা সীমান্ত পার হয়ে আগরতলা যাব, কোন রাস্তা দিয়ে আমরা যেতে পারি? তাদের কথা অনুযায়ী যেতে-যেতে বিকালের দিকে গিয়ে পৌছলাম তিতাস নদীর আর একটা শাখা উজানিষা এর পাড়ে। সেটা পেরিয়ে আমরা চারগাছ বাজার গিয়ে পৌছালাম। সেখানে গিয়ে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কিভাবে যেতে পারবো? তারা বললো, এখান থেকে আপনারা একা যেতে পারবেন না, তবে রাত দশটার দিকে শরণার্থীদের যাবার জন্য একটা নৌকা যাবে আপনারা সেই নৌকায় করে যেতে পারেন। কে নিয়ে যাবে তার দেখাও পেলাম, কয়েকজন ভলেন্টিয়ার ওখানে আছে, তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম নৌকায় করে শরণার্থী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার হবে, এই পথের ভাড়া মাথাপিছু ৩০ টাকা করে দিতে হয়। আমি ৩০ টাকা দিলাম, রাত্র দশটার আগেই যথারীতি নৌকায় উঠে বসলাম। সব মিলিয়ে আমাদের নৌকাতে ৬০ জনের মতো লোক হবে, বেশিরভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। আমরা যুবকদের মধ্যে ছিলাম পনেরো ষোলজন, বাকিরা সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের তারা তাদের পরিবার নিয়ে

যাচ্ছিল শরণার্থী ক্যাম্পে। আমার ভাতিজা পেটের অসুখে আক্রান্ত হলো তাই সে আর আমার সাথে যেতে পারল না। আমি একাই রওয়ানা হলাম। আমার হাতে একটা ব্যাগ তাতে ছিল আমার লুঙ্গি, গামছা ও জামা। চারগাছ বাজার ছেড়ে নৌকা করে আধাঘন্টা এসেছি, এরপর নৌকাটি মাটির রাস্তার পাশে রাখল, আমি মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার এখানে? মাঝি বলল চুপ করে বসে থেকে দেখুন। আমি দেখলাম, একজন লোক আসলো, সে এসে দাঁড়াতেই মানুষ গোনা শুরু করলো, মাঝি আমাদেরকে বলল দশটা করে টাকা দেন, তখন সবার কাছ থেকে দশটা করে টাকা তুলে প্রায় ৬০০ টাকার মত হবে তা ওই লোকটার হাতে দিলো, যে লোকটা এসেছিল তার ঘাড়ে একটা রাইফেল ছিল, সে লুঙ্গি, জামা পড়া এবং কোমরে গামছা বাঁধা। আমি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? মাঝি বললো, এরা রাজাকার, সামনে সিএন্ডবি এর যে রাস্তা সেখানে একটা ব্রিজ আছে, সেই বড় ব্রীজটা যে জায়গায়, তার নাম তিল্লাকপীর, ব্রীজের নিচ দিয়ে যেতে হলে তাদেরকে টাকা দিতে হবে। কেননা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত এই রাস্তাই একমাত্র গাড়ি চলাচলের রাস্তা এবং এখান দিয়ে আর্মিরা যাওয়া আসা করে। আর্মিদের কাছ থেকে শরণার্থীদের বাঁচাবার জন্যই রাজাকারদের এই ব্যবস্থা। স্থানীয় লোকজনের মধ্য থেকে এরা রাজাকারে নাম লিখিয়েছে, এভাবে তারা স্থানীয় লোকদের ও শরণার্থীদেরকে আর্মিদের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তারপর ওই লোক আমাদের বলে দিয়ে গেল যতক্ষণ পর্যন্ত নৌকা ব্রীজ পার না হয় এবং পরবর্তী গ্রামের কাছে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কথা বলবেন না এবং বিড়ি সিগারেট খাওয়ার জন্য দিয়াশলাই জ্বালাবেন না। আমরা চুপ করে বসে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম এবং ব্রীজের নিচ দিয়ে নদী পার হলাম, নদীর ওপারে যাওয়ার পরে হঠাৎ নৌকার মাঝি বললেন, কেউ কোনো দিয়াশলাই জ্বালাবেন না চুপ করে বসুন আর্মি চলে এসেছে। আমরা দেখলাম সব অন্ধকার, আর্মি কোথায়? অনেক দূরে উজানিষার যে ব্রীজ আছে তার উপর দিয়ে জীপের আলো দেখা গেল। পরপর দশ-বারোটা গাড়ি। মাঝিরা পাঁচজন মিলে প্রাণপনে নৌকা চালিয়ে যাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি গ্রামের আড়ালে পৌঁছা যায়। গ্রামের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছালে এমন সময় জীপগুলি সব এসে আমরা যে ব্রিজের নিচ দিয়ে এসেছি তার ওপর থামল। থেমে তারা হেডলাইট গুলো আমাদের দিকে ফেরালো এবং নৌকাটা হয়তো তাদেও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তারা ফায়ার ওপেন করলো।

বৃষ্টির মতো নৌকার দিকে গুলি আসা শুরু হলো, আমরা দেখলাম গুলিগুলো পানির মধ্যে পড়ছে। মাঝিরা প্রাণপণে নৌকা বেয়ে নৌকাটা গ্রামের এক প্রান্তে ভিড়িয়ে দিল এবং বললো আপনারা নেমে গিয়ে যে যেখানে পারেন গ্রামের ভিতর লুকিয়ে পড়েন। আমরা নৌকা থেকে ঠেলাঠেলি করে নামতে গিয়ে নৌকাটা ডুবে গেল। তার কিছুক্ষণ পর গোলাগুলির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল এবং আর্মিরা চলে গেল। আমরা নৌকাটা উঠিয়ে পানি সেচে আবার রওয়ানা হলাম। প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা চলার পরে সালদা নদীর পাড়ে একটা স্টেশন আছে, সেখানে একটা রেলওয়ে ব্রীজ আছে, ব্রীজের তল দিয়ে গিয়ে একটা গ্রামে নৌকা ভিড়লো। মাঝিরা বললো, আপনারা এসে পড়েছেন, সবাই নামেন। আমরা সবাই নামলাম, কেউই আমরা কোন রাস্তাঘাট চিনিনা, কিন্তু যারা এখানে শরণার্থী হয়ে এসেছে তাদের মধ্যে কয়েকজনের আত্মীয়-স্বজন আগরতলা এসেছে। তাদের সাথে আগেই তারা যোগাযোগ করেই এসেছে। আমরা সবাই একটা মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম অনেকক্ষণ যাবার পর একটা স্কুলের মাঠের মতো বেশ বড় একটা জায়গা পেলাম। সেখানে মাঠের মধ্যে আমরা যার যার মতো করে রাত কাটালাম। মাঠের মধ্যে ইট-বালু-সিমেন্ট দিয়ে বেঞ্চের মত করা ছিল অনেকগুলো, আমি তার একটার উপর শুয়ে পড়লাম। ফজরের আযানের সময় উঠে দেখি শরণার্থীরা সবাই যাওয়ার জন্য প্রস্তত। আমিও তাদের সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা উদয়নগর পৌছলাম, সেখানে গিয়ে বাসের দেখা পেলাম। বাসে উঠে বসলাম। প্রচন্ড খিদে পেটে। টাকা পয়সা বেশি নাই, আমার পকেটে আড়াইশো টাকার মতো আছে। তখনকার দিনে ১০০ টাকার পাকিস্তানি নোট দিলে ভারতীয় ১২০ টাকা দিত। আমি ১০ টাকা ভাঙ্গালাম, তাতে ভারতীয় ১২ টাকা পেলাম। ৫ টাকা গাড়ি ভাড়া দিলাম। এর পরের দুই ঘন্টা গাড়ি চলার পর আমরা আগরতলা পৌছলাম। আমরা যেখানে নামলাম তার নাম বটতলা স্টেশন। সেখানে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই বাংলাদেশের কোনো অফিস এখানে আছে কি? তারা বললো, জয়বাংলা থেকে এসেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। (বাংলাদেশ হতে যারা যেত তাদেরকে তারা জয়বাংলা বলতো) তারা বললো, জয়বাংলা অফিস আছে সেখানে যান, আমি অফিসের মধ্য গেলাম। গিয়ে দেখি তৎকালীন আমাদেও নারায়ণগঞ্জ মহাকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানের প্রধানমন্ত্রীর এসএসএফ বাহিনীর চীফ মেজর জেনারেল মুজিবুর রহমান সাহেবের

পিতা বজলুর রহমান সাহেবকে (তিনি আমাদের নেতা ছিলেন), তিনি জয়বাংলা অফিসের চার্জে আছেন। আমি তাকে দেখে তার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। নেতা আমাকে দেখে বললেন, "বাচ্চু তুমি কি একাই আছো, নাকি তোমার সাথে আর কেউ এসেছে?" আমি বললাম, না ভাই আমি একাই এসেছি, বজলু ভাই বললেন, "তুমি সরাসরি বর্ডার থেকে এখানে আসছো?" আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই সরাসরি এসেছি। আবার বজলু ভাই বললেন, তুমি কি কিছু খাইছো ? আমি বললাম, না ভাই এখনো কিছু খাইনি, তখন উনি বললেন, ঠিক আছে এখানে বসো। উনি আমাকে খাবার দিলেন। আমি খুব তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খেয়ে বজলু ভাইকে বললাম, ভাই আমি একটু রেস্ট নিব। বজলু ভাই বললেন, অসুবিধা নেই। তখন তিনি তার পিওনকে দিয়ে পাশে একটা রুমে আমাকে রেস্ট নিবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বজলু ভাইয়ের সান্নিধ্যে তিন-চারদিন কাটাবার পর তিনি আমাকে মেলাগড় ইয়ুথ ক্যাম্প এ পাঠিয়ে দিলেন। মেলাগড় ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে আমাদের আরেক নেতা এনাজুর রহমান চৌধুরী সাহেবকে পেলাম। তিনি সেখানকার মোটিভেটর হিসেবে ছিলেন। বেশ ভালই দিন কাটছিল। আমি আগরতলায় পৌঁছেছিলাম এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখ। এপ্রিল মাস গেল, মে মাস পর্যন্ত আমরা ইয়ুথ ক্যাম্পে ছিলাম। ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। একদিন হঠাৎ মাখন ভাই এলেন ইয়ুথ ক্যাম্পে। মাখন ভাই আমাকে দেখে বললেন, "আপনি এখানে? দুলাভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে কি?" আমার ভগ্নিপতি তখন এমসিএ। উনি কসবার এমপি ছিলেন। দুলাভাইয়ের নাম সৈয়দ এমদাদুল বারী। আমি মাখন ভাইকে বললাম, দেখা হয়েছে। মাখন ভাই বললেন, আপনি এখানে কেন? আমি বললাম, এখান থেকে ট্রেনিং-এ যাব তাই অপেক্ষা করছি। মাখন ভাই বললেন, আপনার এখানে ট্রেনিং নেবার দরকার নেই, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি বিএলএফ এর ট্রেনিংয়ে দেরাদুন যাবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে। আবার মাখন ভাই বললেন, তারিখ যখন হয় তখন আমি বলে দিব। দেরাদুনে তখন প্রথম ব্যাচ ট্রেনিং এ চলে গেছে, দ্বিতীয় ব্যাচে আমি রিক্রুট হলাম। মে মাসের ২২ অথবা ২৩ তারিখের দিকে বিকেল বেলা অফিসে গিয়েছি সেখানে থেকে বিদায় নেব এবং ওখান থেকে কিছু টাকা দেয় সেটা তুলব। অফিসে যাবার পর বজলু ভাই বললেন, "তুমি একটু বসো তোমার সাথে কথা আছে, আমি বললাম, সবাইকে বিদায় করছেন কিন্তু আমাকে বিদায়

করলেন না কেন?" আমার ভিতর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল, সবাই বিদায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে বসিয়ে রেখেছেন কথা আছে বলে। এর কিছুক্ষণ পরে বজলু ভাই বললেন, 'তোমার তো দেরাদুন যাওয়া হবে না। তোমাকে কোলকাতা যেতে হবে, কোলকাতা থেকে মনির একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। এই দেখ টেলিগ্রাম।' আমি দেখলাম, টেলিগ্রামে পরিষ্কার লেখা আছে আমাকে যেন কোলকাতা পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং শিয়ালদহ একটা হোটেল আছে শ্রীনিকেতন, আমি যেন সেই হোটেলে উঠি। আমি বজলু ভাইকে বললাম, ভাই আমি যে যাব আমার কাছে তো খুব একটা টাকা নেই, সেখান পর্যন্ত যাব কিভাবে? বজলু ভাই বললেন, তুমি এটা চিন্তা করো না, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বজলু ভাই ব্যবস্থা করে দিলেন এবং পরের দিন রাত আটটায় আমাকে একটা ট্রাকে উঠিয়ে দিলেন। তখন যাতায়াতের জন্য আগরতলা থেকে কোলকাতা পর্যন্ত তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র বিমান যাতায়াত করতো অথবা ট্রেনের মাধ্যমে যেতে হতো। আগরতলা থেকে তখন কোনো ট্রেন ছিল না। (কিছুদিন আগে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর একটা দাওয়াত পেয়ে আগরতলা গিয়েছিলাম। এবার সেখানে গিয়ে দেখি আগরতলা শহর চেনাই যায় না, সেই ইট বিছানো রাস্তা আর নেই, পিচ ঢালা রাস্তা নেই। এখন বিরাট বিরাট চার লেনের রাস্তা, আগরতলাকে এখন আমার এমন মনে হয়েছে যে আমি যেন বোম্বে শহরে আছি। এখন ওখানে রেলস্টেশন আছে যেখান দিয়ে ভারতের সব স্থানে যাতায়াত করা যায়, আর আমাকে সেদিন রাতে ট্রাকে করে যেতে হয়েছিল ট্রেন স্টেশনের জন্য) যা-ই হোক সারারাত ট্রাক চললো। পাহাড়ের উপর দিয়ে উঁচু-নিচু ঢালুপথ। সকাল ৬.৩০ হবে তখন ধর্মনগর গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে ধর্মনগর রেল স্টেশন। ট্রেনে চড়লাম ওখান থেকে কোলকাতার ভাড়া ১৫ বা ১২ টাকা ছিল। ধর্মনগর থেকে ছেড়ে এসে দুপুরের পর পর লামড্রিন জংশনে পৌঁছালো, লামড্রিন নেমে সেখান থেকে পরবর্তী ট্রেন পাঁচটায় ছাড়বে। সেটিতে উঠে বসলাম। লামড্রিন থেকে আসলাম গোহাটি, তখন রাত সাড়ে আটটা বা নয়টা বাজে। গোহাটি থেকে ট্রেন বদল করে উঠলাম শিলিগুড়ির ট্রেনে। পরের দিন সকালে শিলিগুড়ি এসে নামলাম। আটটার সময় শিলিগুড়ি থেকে কোলকাতার ট্রেন, উঠে বসলাম কোলকাতার ট্রেনে। আমি তখন দুই দিন, রাত ধরে ট্রেন জার্নি করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে রাত সাড়ে আটটায় ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছল। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে প্লাটফর্মের বাইরে

যাওয়ার জন্য আমি হাঁটছি। তখন দেখি একটা লোক জোরে জোরে হেঁটে আমার দিকে আসছে। আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। আমার বেশভূষা দেখে তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি বললেন, “জয় বাংলা? জয় বাংলা?”। আমি বললাম, হ্যা। তিনি বলেন, আসুন, আসুন। ব্যাগ দেন, ব্যাগ দেন। আমি বললাম, না আপনাকে ব্যাগ দেবো কেন? তিনি বললেন, কোথায় যাবেন আপনি? আমি বললাম, এখানে একটা হোটেলে উঠবো। তিনি বললেন, হোটেলে ওঠার দরকার নেই, চলেন চলেন আমার সাথে। আমি বললাম, ‘না ভাই আমি আপনার সাথে যাব না।’ তখন লোকটা বললেন, ভাই কিছু মনে করবেন না, আমার বাবা শরণার্থী হিসেবে এখানে এসেছেন, তবে আমার বাবা বাঙ্গালিদের উপর কি অত্যাচার হচ্ছে তা দেখে এসেছেন। আজকে তিনদিন যাবত আমার বাবা আমাকে শিয়ালদহ স্টেশনে পাঠাচ্ছেন এই বলে যে, আমার দেশের মানুষ অত্যন্ত অসুবিধায় আছে, তুমি তাদেরকে নিয়ে আসো। যাকে পাবে তুমি তাকে সাথে করে নিয়ে আসবে। আমাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করবে তাদেরকে। ভাই আজ তিনদিন যাবত এখানে আসছি এবং সবাইকে দেখি তাদের ফ্যামিলিসহ আসছেন আর সকলেরই আত্মীয়-স্বজন এখানে আছে। তিন দিন পর আজ আপনাকে পেলাম তাই আপনি হোটেলে পরে উঠবেন, আজকে অন্তত আমার বাবাকে শান্তি দেন। আমি বললাম, আপনার বাংলাদেশে বাড়ি কোথায়? তিনি বললেন, ঢাকা। আমি বললাম, ঢাকা কোথায়? তিনি বললেন, নারায়ণগঞ্জে। আমি আবার বললাম নারায়ণগঞ্জ কোথায়? তিনি বললেন, আপনি নারায়ণগঞ্জ চিনেন। আমি বললাম, হ্যাঁ আমার বাড়িও নারায়ণগঞ্জেই। তিনি বললেন নারায়ণগঞ্জে কালির বাজারে আদর্শ মিষ্টান্ন ভান্ডার আছে না, আমি বললাম, হ্যাঁ, আছে সেটার মালিক তো মধু কুড়ি, তিনি বললেন, সে আমার বাবা, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। তখন আমি বললাম তাহলে তার সাথে তো আমার দেখা করতেই হবে। ভদ্রলোকের নাম ছিল দীপক বাবু। তিনি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। আমি গাড়িতে করে তাদের বাড়ি গেলাম শিয়ালদহ স্টেশন থেকে প্রায় ২০/২২ কিলোমিটার দূরে যাদবপুর। উনাদেও বাড়িতে খুব ভালোভাবে দুই দিন পার করলাম। এরপরে বললাম, দাদা আমাকে তো যেতে হবে, তা না হলে আমার জন্য ওরা চিন্তা করবে, দাদা বললেন ঠিক আছে, যাও কিন্তু একটা কথা তুমি রাখবে, তুমি কিন্তু কষ্ট করবে না তুমি কোলকাতায় যে ক'দিন আছো মুক্তিযুদ্ধে

যতদিন না যাও, সে কদিন তুমি আমার এখানে থাকবে। আমি তাকে কথা দিয়ে শিয়ালদহ ফিরে আসলাম, এসে খুঁজে বের করলাম শ্রীনিকেতন হোটেল। হোটেলের ম্যানেজার এর সাথে দেখা করার পর ম্যানেজার বললেন, আপনার নাম কি মিজানুর রহমান বাচ্চু? ঢাকা থেকে এসেছেন, এখন আগরতলা থেকে আসছেন? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনার নামে তো হোটেল বুক করা আছে দুদিন আগে থেকেই। তিনি বেয়ারাকে ডেকে বললেন ১৫ নম্বর রুমে নিয়ে যাও। আমি বেয়ারার সাথে গিয়ে ১৫ নম্বর রুমে উঠলাম। বেয়ারা আমাকে বলল, আপনি এখানে থাকেন। আমরা খাবার দাবার সবকিছু আপনাকে দিব। কোন অসুবিধা হলে আমাদের জানাবেন এবং আপনার লোক এসে আপনাকে নিয়ে যাবে। আমি থাকলাম ওখানে। কিছুক্ষণ পর আমি একটু খোঁজ খবর নেবার জন্য নিচে গেলাম, নিচে গিয়ে দেখি ওদের ক্যাশ কাউন্টারে বসে আছেন আমাদের আরেক নেতা ফনিভূষণ মজুমদার। নেতা খালি গায়ে শুধু একটা ধুতি পড়ে বসে আছেন। আমি উনার কাছে গিয়ে উনাকে নমস্কার দিলাম। উনি আমাদের মন্ত্রী ছিলেন, উনি সকলের সাথে আপনি করে কথা বলতেন। তখন উনার বয়স ৬০ বা ৬৫ হবে, আমার বয়স ২২/২৩ বছর। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বললাম, আমিতো নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছি। তিনি বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছেন, আপনাদেও শামসুজ্জোহা কেমন আছেন? আমি বললাম, উনি ভালই আছেন। উনি এখন আগরতলাতে আছেন। তিনি বললেন, কারো কোন অসুবিধা হয় নাই তো? আমি বললাম, না কারো কোন অসুবিধা হয় নাই। সবাই ঠিকঠাক মতো আছেন। আবার তিনি বললেন, এখানে আপনি কত নম্বারে আছেন? আমি বললাম ১৫ নম্বরে, তখন তিনি হোটেলের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এই আমাদের মিজান সাহেব কত নম্বরে? ওরা উত্তর দিল ১৭ নম্বরে। তিনি আমাকে বললেন আপনার পাশে ১৭ নম্বরে আমাদেও মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব আছেন আরো অনেকেই এখানে আছেন, আপনি পাবেন তাদের। আমি আর দেরি না করে উপরে উঠে গিয়ে দেখি মিজানুর রহমান সাহেবকে, তিনি আরো লোকদের নিয়ে কথা বলছেন। আমি সালাম দিয়ে কাছে গেলাম (মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব আমার বেয়াই হতেন) তিনি আমাকে দেখে বললেন, ‘আরে তুমি এখানে কবে এসেছো? আমি বললাম, এসেছি দুদিন আগেই, কিন্তু হোটেলে

এসেছি আজকে। তিনি বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া করেছো, আমি বললাম এখনও করি নাই তবে ব্যবস্থা আছে, আমি করে নিবো। আমি একটু আপনার সাথে দেখা করে গেলাম, এই বলে আমি সেখান থেকে এসে দেখি ১৯ নম্বরে আবু সুফিয়ান সাহেব এবং শ্রমিক নেতা আব্দুর রহমান সাহেব। আবু সুফিয়ান সাহেব হলেন এখনকার খুলনার মন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান এর স্বামী। উনাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে খুব শখ্যতা হয়ে গেল। এখানে দুই দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন আমার রুমে এসে হাজির ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেব। ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেবের সাথে আমার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় পরিচয় ছিল, গণঅভ্যুত্থানের সময় উনার সাথে আমার সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়েছে। আমি উনাকে দেখে বললাম, সুলতান ভাই আপনি এখানে? সুলতান ভাই বললেন, তোমাকে নিতে এসেছি, আমি বললাম আপনি কি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, সুলতান ভাই বললেন না, মনির তো আমার কাছে আছে, মনিরই তোমাকে খবর পাঠিয়েছে। আমাদের ছাত্র নেতা মনিরুল ইসলাম ভাই, তিনি আমার বড় ভাই, সুলতান ভাই বললেন তুমি ব্যাগ গোছাও যেতে হবে আমার সাথে, আমি আর দেরি না করে গুছিয়ে নিলাম। কারণ, আমিও যাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। তারপর সুলতান ভাইয়ের সাথে জীপে করে রওয়ানা হলাম। ৬ থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টা পরে এসে উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট থানার একেবারে ইছামতি নদীর পাড়ে বাকুন্ডি ক্যাম্প, সেখানে এসে পৌঁছালাম। অপর পাড়ে আমাদের বাংলাদেশের দেবহাটা থানা। ক্যাম্পে হাজির হওয়ার পরে ট্রেনিংয়ের জন্য উনাদের সাথে উপস্থিত হলাম, আমার জায়গাটা হল ক্যাপ্টেন সাহেবের তাবুর মধ্যেই মনির ভাইও সেখানে থাকেন।

"আজ বেলা শেষে কত স্মৃতি মনে পড়ে যায়"

আমরা মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলাম তারা বাংলার জনগণ, শ্রমিক, কৃষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, দিনমজুর, ছাত্র-শিক্ষক সহ সব পেশাজীবী লোক। বিডিআর, আর্মি, পুলিশ, গ্রাম্য পুলিশ, আনসার, সবারই অংশগ্রহণ ছিল। প্রত্যেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, এর মধ্যে যারা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছে তাদেরকে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার (যুদ্ধের পরে যে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে) বিভিন্ন উপাধি দিয়েছিল। এর মধ্যে ৭ জনকে বীরশ্রেষ্ঠ,

১০৩ জনকে বীরউত্তম উপাধি দিয়েছিল এবং তৃতীয় যাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে বীর বিক্রম উপাধী দিয়েছিল। এরপর যে খেতাবটি ছিল, সেটা ছিল বীর প্রতীক। আজকে আমি তোমাদেরকে বলছি ৫২ বছর আগের মুক্তিযুদ্ধের কথা, আজকে আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। এই বার্ধক্যে এসেও আমি মনে প্রাণে এই যুদ্ধের স্মৃতিগুলো লালন করছি। আমি নিজের মাঝে ধরে রেখেছি। আমি বাংলার মানুষের অসীম সাহস দেখেছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিভাবে বাংলার মানুষ অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেটাও আমি দেখেছি। এবং ঠিক সময় মতো একজন বলিষ্ঠ নেতা আমরা পেয়েছিলাম। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙলি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উনি প্রত্যেকটি বাঙালিকে একই পাল্লায় উঠাতে পেরেছিলেন। তাঁর নির্দেশেই বাংলার আপামর জনসাধারণ, আবাল বৃদ্ধ জনতা, বৃদ্ধ থেকে কৈশোর পর্যন্ত যারা ছিলেন, তাঁর ডাকে জীবনকে তুচ্ছ মনে করে যুদ্ধে পশ্চিমা বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আজকে আমি এমন একজন যোদ্ধার কথা বলবো- যিনি বাংলাদেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। তোমরাও তার জন্য দোয়া করো। উনি খুব করুণভাবে আমদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। যে তার জীবনকে তুচ্ছ করে, তার গ্রুপের প্রত্যেকের জীবন তিনি রক্ষা করেছেন এবং নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তার গ্রুপটা রক্ষা করেছিলেন। ১০৩ জন বীর উত্তম উপাধি পেয়েছেন। এর ভেতর ১০২ জনই ছিলো সেনাবাহিনীর লোক, একমাত্র একজনই ছিলো সিভিলিয়নের মধ্য থেকে, ছাত্রদের মধ্য থেকে উনি বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন। আমি তাকে স্যালুট জানাই। আমাদের বাংলাদেশের তথা বাংলা মায়ের উনিই গর্ব। তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম আছো তোমাদেরও উনি গর্ব। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো তার দেখা পাবার। সে ঘটনাটি আমি তোমাদেরকে বলছি। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি প্রাইমারি স্কুল থেকে পাস করেছি, পঞ্চম শ্রেণী থেকে পাস করে আমি হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমার স্কুলের নাম নারায়নগঞ্জ বার একাডেমি। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারীতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবার পরে আমি প্রথম প্রথম খুব উৎসাহ নিয়ে স্কুলে গিয়েছি। হাইস্কুলের ছাত্র আমি, ওখানে গিয়ে একটা ছেলের সাথে আমার পরিচয় হয়। পর্যায়ক্রমে তিন চার মাসের মধ্যে ছেলেটার সাথে এমন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যে প্রাইমারি স্কুলে যাদের সাথে পড়েছি, তাদের থেকে বেশি সম্পর্ক হয়ে যায় ঐ ছেলেটির সাথে। সম্পর্কটা এমন, আমি যদি একটু দেরি করে

স্কুলে যেতাম, সে আমার জন্য জায়গা রাখতো, আমরা পাশাপাশি বসতাম। এজন্য আমার প্রাইমারি স্কুলের যারা সহপাঠী ছিল, আমার এলাকার যারা ছিল, তারা মনে মনে হিংসাই করতো। ওর সাথে আমার এতো সুসম্পর্ক কেনো! যাক আমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের চোখের ভাষা বুঝতাম, ব্যবহার বুঝতাম। কিন্তু জানিনা ওকে আমারও ভালো লাগতো। কালো খাটো মতো ছেলেটা, মাথার চুল নিগ্রোদের মতো কালো। স্কুল থেকে অল্প দূরে আমার বাড়ী। আমি স্কুল থেকে খেতে আসলে, আমার সাথে সেও আসতো। খাওয়ার পরে মা দুধ খেতে দিতো দু'জনকে। কিন্তু আমার ছোটবেলা থেকে অভ্যাস ছিল, আমি দুধ খেতাম না আর ও দুধ খেত। এজন্য মা আমার সাথে অনেক রাগারাগি করেছে। মা বলে, এক সাথে চলিস, ও যা করে তুই তা করতে পারিস না? ও দুধ খায়, তুই খাস না কেন? আমি চুপ করে থাকতাম, কিছু বলতাম না। এভাবে তার সাথে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতদিন শুনেছি, তার বাড়ি নোয়াখালীতে। তার বাবা এখানে চাকরির নতুন স্থানে বদলি হয়ে এসেছিলো। তিনি সেটেলমেন্ট অফিসের ম্যানেজার ছিলেন, তার সাথে এসে সে এখানে ভর্তি হয়েছে। আমার সাথে সে ক্লাস সিক্সে পড়তো। ১৯৬০ সালে সে সেভেনে, ১৯৬১ সালে যখন সে এইটে উঠলো, তখন তার বাবা এখান থেকে চলে গেলো। যখন সে চলে যায়, তখন আমাকে ধরে অনেক কান্নাকাটি করল আর বললো যে, মিজান আমি তো চলে যাচ্ছি। কিন্তু তোর সাথে আমার কোনোদিন যোগাযোগ বন্ধ হবে না। আমি যোগাযোগ করবো। তার একটা বড় ভাইও এখানে পড়তো, তার নাম ছিল কামাল উদ্দিন। আমি এখন পর্যন্ত আমার বন্ধুটির নাম বলিনি। তার নাম হচ্ছে নিজাম উদ্দিন। ঠাট্টা করে আমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধব বলতো, খাজা নিজাম উদ্দিন। আল-আমিন আমার আরেক বন্ধু সে রাজউকের চাকরি করতো। সে এখন অবসরে আছেন, অসুস্থ অবস্থায় বাসাতেই আছেন। নারায়ণগঞ্জ সুধীজন পাঠাগারের সেক্রেটারী ছিল। সে বলতো, "খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া।" অনেকে আউলিয়া বলতো, অনেকে খাজন বলতো। যাহোক, তার ভাই কামাল উদ্দিন আমাদের এক বছরের সিনিয়র ছিলো। আমার বন্ধুটি ক্লাস এইটে উঠে চলে গেল, তবে ছাত্র হিসাবে খুব একটা ভালো ছিল না। মাঝারি মেধার ছাত্র ছিল সে। ১৯৬৪ সালে এসএসসি পাশ করলাম, ১৯৬৮ সালে কলেজ থেকে বের হলাম। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে যোগ দিলাম। প্রচন্ডভাবে জড়িয়ে পড়লাম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় আমার দুলাভাই কসবা থেকে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। আমি ওনার নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। একদিন নির্বাচন চলাকালীন সময় ওখান থেকে আমার বাসায় আসি নারায়ণগঞ্জে। খবর পেয়ে আল-আমিন আসলো বাসায়, এসে বললো, মিজান, খাজন তো এসেছিলো। আমি বললাম কোন খাজা? ও বললো, আউলিয়া খাজা নিজাম উদ্দিন এসেছিলো। তোকে পায়নি তাই আমার কাছে একটি চিঠি দিয়ে গেছে। চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়লাম। লেখা ছিল মিজান অনেক বছর হয়ে গেল তোর সাথে দেখা নাই, খুব আশা নিয়ে আল-আমিনের সাথে এসেছিলাম, তোর সাথে দেখা করবো বলে। কিন্তু এসে শুনি তুই এখানে নাই, বি-বাড়িয়াতে আছিস। যাক, আমি সময় করে আবার আসবো। তুই যদি ঢাকা যাস তাহলে, মুহসিন হলের ৪৪২ নম্বর রুমে আছি। আমার সাথে দেখা করিস। পত্রটা পড়ে মনটা খুব আপ্লুত হলো। সে এতদিন পরে এসেছে, পত্র দিয়েছে, অবশ্যই আমি দেখা করবো। নির্বাচন শেষ করে ৭১ এর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস হবে, আমি গেলাম মুহসিন হলে। মুহসিন হলে গিয়ে ৪৪২ নম্বর রুমটা খুঁজে বের করলাম। গিয়ে দেখি তিন চারটা ছেলে রুমের মধ্যে, গিয়ে বললাম ভাই, 'এখানে কি খাজা নিজাম উদ্দিন থাকে? বলল, হ্যাঁ, আসেন, ভিতরে বসেন। আপনার পরিচয়? আমি বললাম আমি তার ছোট বেলার বন্ধু, আমার বাসায়ও গিয়েছিল কিন্তু আমাকে পায় নাই, এই জন্য আমি তার সাথে দেখা করতে এসেছি, ওরা বললো ভাই সে তো আধা ঘন্টা আগে বাড়িতে রওনা হয়ে গেছে, আপনি কমলাপুর ষ্টেশনে গেলে পাবেন, সে গ্রীনএ্যারো ট্রেন ধরবে। আমি তাড়াতাড়ি করে ওখান থেকে নেমে রিকসা নিয়ে ষ্টেশনে গেলাম। গিয়ে শুনি পাচঁ মিনিট আগে ট্রেন ষ্টেশন থেকে বের হয়ে গেছে। ওকে পেলাম না, ব্যার্থ মনে ফিরে এলাম। এরপর মার্চ মাসে তার সাথে দেখা করবো, সে সময় আর সুযোগ পেলাম না। দেশে আন্দোলনের হাওয়া বইতে শুরু করলো। এরপর ২৫ মার্চের ঘটনা ঘটলো, আমি ঢাকায় যুদ্ধে চলে গেলাম। তার আর কোনো খোঁজ খবর নেয়া হল না। এরপর বাকুন্ডী ক্যাম্পে আমি ট্রেনিং শেষ করেছি, এখন আমি একজন ট্রেইনার। মুক্তিযোদ্ধা যারা আসে, তাদের ট্রেনিং দেই। মুক্তিযুদ্ধের সময়, বাংলাদেশিদের পক্ষে প্রবাসীদের জন্য খবরের কাগজ বের হত, সাপ্তাহিক পেপার, নাম "মুক্তি বানী"। আমার ঠিক মনে নাই সেপ্টেম্বর মাসের ৭/৮ তারিখ হবে আমি পেপারটা নিয়ে পড়ছি, প্রথম পৃষ্ঠার ডান পাশে দেখি বীরত্বের সাথে

যুদ্ধ করে মারা গেলেন নিজাম উদ্দিন। আমি তার ছবিটা দেখে হতভম্ভ হয়ে গেলাম। চিন্তা করা যাবে না আমার অবস্থাটা তখন কি? আমি চুপ করে রইলাম। কারও সাথে যে কথা বলবো সেই অবস্থা ছিল না। ৫০ বছর পর আজও ভুলতে পারিনি আমার সেই ছোটবেলার বন্ধুকে। কথাটা আমি আজ এখানেই শেষ করতে চাই না। স্বাধীনতার পরে তার ঠিকানা আমি আর খুঁজে পাইনি। আমি যাদুঘরে গেলাম, যারা শহীদ হয়েছে এই যুদ্ধে, খেতাব প্রাপ্ত তাদের লিস্ট টা চেয়েছিলাম। কিন্তু তখন ওরা আমাকে দিতে পারল না। ওরা বললো যে, "আমরা এখনও লিস্ট পাইনি, আচ্ছা মন্ত্রণালয় থেকে আসুক তখন পাবেন"। পাবেন, পাবেন করে ২০০২ কি তিন সাল হবে, পেপারের মধ্যে ছবি, আজ নিজাম উদ্দিনের এত তম মৃত্যুবার্ষিকী, ৪ ঠা সেপ্টেম্বর সে মারা গিয়েছেন। ঐখানে দেখি তার ঠিকানা, গ্রামের বাড়ি মালাপাড়া, উপজেলা হচ্ছে ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। আমি মালাপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া আগেও গিয়েছি। মালাপাড়া উপজেলা হওয়ার আগে এটা বুড়িচং থানা ছিল। ৭০ এর নির্বাচন আমি কসবায় করেছি। এমএনএ ক্যান্ডিডেট ছিল, আইন মন্ত্রীর বাবা সিরাজুল হক সাহেব (বাচ্চু) মিয়া, ওনার নির্বাচন করেছি। আর বুড়িচং এমপি পদে দাড়িয়ে ছিলেন আমির হোসেন সাহেব, কসবায় দাড়িয়ে ছিলেন আমার দুলাভাই এমদাদুল বারী সাহেব। তাদের নির্বাচন করেছি তাই এলাকাটা আমার পরিচিত। ঠিকানাটা পাওয়ার পর আমি আর দেরি করতে পারলাম না। আমার এক বন্ধুকে বললাম, তোর গাড়িটা আমার দরকার গাড়ীটা আমাকে দে। গাড়িটা নিয়ে ঠিক সাথে সাথে আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম। আজকে তার মৃত্যুদিন এই উপলক্ষে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমি যাব, ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে খুব একটা দূরে নয়। আমি খুঁজে খুঁজে গেলাম গোমতি নদীর পাড়ে মালিপাড়া গ্রামে। সেখানে তার নামে একটা স্কুল করেছে স্থানীয়রা। নাম "শহীদ নিজাম উদ্দিন শিশু শিক্ষা কানন"। সে আর কোন দিন আমাদের কাছে কিছু চাইতে আসবে না। আমরা তাকে আর কিছু দিতেও পারবো না। যেখানে তাকে কবর দেয়া হয়েছে তার নামে ঐ জায়গাটার নাম "নিজাম নগর"। স্কুলটার অবস্থা তেমন ভালো নয়। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা কিছু কিছু সহযোগীতা করে স্কুলটি চালায়। আমি সরকারকে অনুরোধ করছি স্কুলটির উন্নয়নের জন্য।

দেশকে ভালোবেসে কতটুকু ত্যাগ করতে পারে দেশের সোনার সন্তানরা:

দেশকে ভালোবেসে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে দেশের সোনার সন্তানরা, একবারও কেউ ভাবেনি তারা তাদের নিজেদের জন্য, একবারও ভাবেনি কত বড় নেতার ছেলে তারা শুধু দেশের মানুষের কথা ভেবেই যুদ্ধে নেমেছিলো সবাই। আমি ক্যাম্পে প্রবেশ করেছিলাম মে মাসের শেষ সপ্তাহে। এখানে আমি ট্রেনিং নিয়েছি, ট্রেনার হিসেবে কাজ করেছি। এখন আমার দেশের ভিতরে যাবার পালা। অক্টোবর মাসে আমি মোটামুটি প্রস্তুতি নিলাম যে ভিতরে আসবো, কোন দলের সাথে আসবো কাদের সাথে আসবো সেটাও চূড়ান্ত হয়ে গেল। ফরিদপুরের সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন বাবুল সাহেব, উনার আসল নাম নূর মোহাম্মাদ, উনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন। অত্যন্ত বিপ্লবী মনের একজন মানুষ এবং অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক। উনি আমাকে বললেন, বাচ্চু তুমি আমার সাথে চলো। ওনার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি উনার সাথে যাব। আমাদের দিন, তারিখ ঠিক। রাতের বেলায় রওয়ানা দিব। ঠিক বিকেল বেলা ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব বললেন, 'বাচ্চু তোমার তো আজকে যাওয়া হবে না।' কেন স্যার যাওয়া হবে না কেন? আমার অসুবিধা কি? তিনি বললেন, দেখ মেজর সাহেব আমাকে হেডকোয়ার্টারে ডেকে নিয়েছিলেন, একটা ভিআইপি টিম আসছে। আমি বললাম ভিআইপি টিম মানে কিসের টিম? তিনি বললেন, একটা দল আসছে যারা বর্তমান প্রবাসী সরকার চালাচ্ছে তাদেরই সন্তানেরা, আর তোমাকে এদের ট্রেনিং দিতে হবে। আমি বললাম, আমার মনটা যুদ্ধের ফিল্ডে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, আমাকে আর আটকিয়েন না। তিনি বললেন, দেখ এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তোমাকে এটা করতে হবে। কি আর করবো ভাঙ্গা মন নিয়ে রয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেন বাবুল ভাইও আমাকে বোঝালেন, তুমি যুদ্ধে গেলেও যুদ্ধ করবা আর এখানে তুমি যুদ্ধের সৈনিক তৈরি করবে এটাও একটা বড় যুদ্ধ। এটাও তোমার কাজ, ডিউটি তো ডিউটিই। সেক্টর কমান্ডার যখন যেটা বলবে সেটা শুনতে হবে। আমি রয়ে গেলাম। পরের দিন দল আসলো, দলের মধ্যে দেখি নারায়নগঞ্জের আমাদের নেতা তখনকার এমএনএ শামসুজ্জোহা সাহেবের বড় ছেলে নাসিম ওসমান, দলের মধ্যে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের সাহেবের ছেলে শেখ হেলাল, দলের মধ্যে দেখলাম আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের এক ছেলে, ক্যাপ্টেন মুনসুর সাহেবের ছেলে, আরো কয়েকজন ভিআইপিদের সন্তান। এরা দলে আট জন । ঠিক আছে পরের দিন ট্রেনিংয়ের

জন্য তাদের কে নিয়ে বসেছি। তাদের বুঝাচ্ছি, তাদের কি কি করতে হবে, তাদের কি কি ট্রেনিং নিতে হবে। তখন আমি নাসিম ওসমানকে ডেকে বললাম, নাসিম তুমি যে এসেছো তোমর আব্বা জানেন? ও বললো, 'না আব্বা তো আগরতলায় আছে'। আমি বললাম, তুমি যে ট্রেনিংটা দিতে এসেছো সেটা কি তুমি জানো? ও বললো, হ্যা আমি জানি, আমি মনে মনে বললাম তুমি যখন জেনেই এসেছো আমার কিছু বলার নেই। তারা সুইসাইড স্কোয়াডের প্রশিক্ষণ নেবে বলে এখানে এসেছে। যাক, তাদের দুইটা দায়িত্ব আমার উপর বর্তিত হয়েছে, একটা হচ্ছে তাদেরকে সকাল বেলা আমাকে পিটি করাতে হবে, ২য় টা হচ্ছে তাদেরকে আমার এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং দিতে হবে। কিভাবে মাইন তৈরী করতে হয়, সেট করতে হয়, আর বাকি অস্ত্র ট্রেনিং যা আছে তা আর্মিদের ট্রেনাররা তাদের দিবে। ২য় দিন আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ করে ৩য় দিন যখন ট্রেনিং শুরু করেছি তখন আমার চোখে পড়লো শেখ হেলালকে। একটা বাচ্চা ছেলে, বয়স ১১ বছর হবে। আমি বললাম, কোন ক্লাসে পড়ো? ও বললো, ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমি বললাম, তোমাকে তো আমি ট্রেনিং দিব না। এই ট্রেনিংটা তুমি নিওনা তুমি বাইরে থাক। তাকে আর আমি সাথে নিলাম না। তখন সে তার এক আত্মীয়র কাছে গেল, সে ক্যাম্পের সাথেই থাকতো। বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়। বঙ্গবন্ধুর টুঙ্গীপাড়া বাড়ির সাথেই বাড়ি, তার নাম শেখ ফরিদ। আমরা তাকে ফরিদ নানা বলে ডাকতাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালো ছিলেন। কথাবার্তায় আমাদেরকে মাতিয়ে রাখতেন এবং হায়ার অফিসিয়াল যারা আসতেন তাদের থেকে আমাদের সুযোগসুবিধা দেবার জন্য আগবাড়িয়ে কথা বলে অনেক কিছুর সুযোগ করে দিতেন এবং ওনাকে সকলে খুব প্রাধান্য দিতেন। আমরা ওনাকে বেশ মান্য করতাম। পরে শেখ হেলাল ফরিদ নানাকে নিয়ে আসলো। ফরিদ নানা বললেন, কি নানা তুমি ওকে ট্রেনিং দিবা না কেন? আমি বললাম, না নানা আমি এতটুকু বাচ্চাকে এই ট্রেনিং দিতে পারবো না অসুবিধা আছে। তিনি বললেন, দাও নানা, ওকে প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছে। আমি বললাম, পাঠাক প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু এই ট্রেনিংটা নেবার সে উপযুক্ত না। উনি আর কোনো তর্ক না করে গিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেবকে নিয়ে আসলেন। ক্যাপ্টেন সাহেব এসে বলেলন, বাচ্চু তুমি তাকে ট্রেনিং দাও। আমি বললাম, না ভাই আমি যে তাকে ট্রেনিং দিব এখানে ডেটনেটর আছে, কখন গিয়ে ডেটনেটরে টিপ লেগে যায়, পুরো বিস্ফোরক দ্রব্য

আছে সব ব্লাষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন সকলের জীবন বিপন্ন হবে আমারও জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না। একটা বাচ্চা ছেলে ও। বুঝবেও না কোনটা থেকে কোনটা টিপ দিয়ে ফেলবে। টাইম পেনসিলে টিপ দিতে গিয়ে সে ডেটনেটরে টিপ দিয়ে বসবে, না তাকে ট্রেনিং দেয়া যাবে না, আমি এটা পারবো না। সুলতান সাহেব খুব কম কথার মানুষ ছিলেন। উনি দেখলেন তর্কে তর্ক বেড়ে যাবে, আমি নাখোশ হয়ে যাবো। উনি আর কিছু বললেন না। উনি ফরিদ নানা ও শেখ হেলালকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। বিকেল বেলা দেখি সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল সাহেব আসছেন। আসার পর আমাকে ডাকালেন, তিনি বললেন, "দেখ বাচ্চু এটাতো হাই অফিসিয়াল অর্ডার, তুমি তাকে ট্রেনিংটা দাও"। আমার কেন যেন জিদ চেপে গিয়েছিল। আমি এদের জন্য রয়ে গেলাম, আমি এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারলাম না, অক্টোবর মাসও চলে যাচ্ছে। ওই জিদে জিদে বলে ফেললাম না স্যার আমি দিব না। তখন মেজর জলিল বললেন, "দেখ দিস ইজ ইয়োর সেক্টর কমান্ডার্স অর্ডার।" মাথাটা নিচু করে থাকলাম। সুলতান ভাই আমাকে বললেন, আসো। মেজর জলিলকে বললেন, ঠিক আছে স্যার ওকে আমি বুঝাচ্ছি। ট্রেনিং তাদের শেষ করলাম। সাকসেসফুলভাবে প্রত্যেকটা ছেলে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ট্রেনিং নিল। এদের একজনেরও মাথায় চিন্তা আসলো না যে আমি রাষ্ট্রপতির ছেলে, আমি প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়, আমি বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়, এসব কিইছু না, কতক্ষণে তারা দেশের জন্য নিজের জীবনটা বিলিয়ে দেবে সে ভেবে অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে ট্রেনিংটা নিয়েছিল। এদের মধ্যে নাসিম ওসমান মারা গিয়েছে, আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন, সৈয়দ আশরাফের ইমিডিয়েট ছোট ভাই এক কলেজের শুনেছিলাম অধ্যক্ষ ছিলেন। উনি বেঁচে আছেন, শেখ হেলাল বেঁচে আছে, আর বর্তমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার মেয়র শেখ মির্জা, বাচ্চা ছেলে ছিল সেও বেঁচে আছে, আজকে তারা নামকরা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য তাদেও প্রত্যেকের অবদান আছে। তারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য জীবন দিতে গিয়েছিল। তারা কোন কিছুর বিনিময় না, কোনো লোভে না, তারা বাঙ্গালির অধিকার আদায়ের জন্য বাংলার মায়ের মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য। বাংলার জনগণের স্বাধীনতার জন্য, বাঙ্গালিদের স্বার্থে তারা জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্য সাধারণ জনগণের সাথে মিশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছিল যুদ্ধ করবে বলে। তারা ওখানে পোলাও মাংস দাবী করে নাই। তারা তো মুরগি না হলে

খাবো না–এটা বলে নাই। তারা তো তখন ভাল কাপড় পরার জন্য চিন্তা করে নাই। সাধারণ জনগণের কাতারে বসে সকাল বেলা দুটো রুটি আর এক বাটি ডাল, দুপুর বেলা একটু ভাজি একটুখানি ভাত, রাতে দুটো রুটি, ডাল আর ভাজি এই খেয়েই চলেছে। তাদের মন তো তখন একটুও বিদ্রোহ করে নাই। তারা একটু চিন্তাও করে নাই সোনার চামচ মুখে নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা কেন এখানে কষ্ট করবো? আমাদের জন্য ভালো খাবার দিতে হবে। আমরা বর্তমানের প্রবাসি রাষ্ট্রপতির ছেলে, আমরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়, আমরা বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়। আজকে দেশের মধ্যে একটু নেতৃত্ব পেলেই বর্তমান নেতাদের যে অবস্থা হয় কাপড়ের মধ্যে ধুলো লাগতে দেন না, সাধারণ মানুষের সাথে হাত মিলাতে চায় না হাতে ময়লা লাগবে বলে, এই বিষয়গুলো আমি তখন তাদের মধ্যে দেখিনি। তারা যাদের সন্তান ছিলো এই বাংলাদেশের জন্য তারা তাদের প্রাণ দিয়েছে আজীবন বাংলার স্বাধীকারের জন্য তারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন করে গিয়েছেন তাদেরকে আমি স্যালুট দেই। তাদের থেকে আমরা শিখেছি, এখনও তাদের চরিত্রকে আমরা অনুসরণ করে চলেছি, জানিনা আমাদের এই বক্তব্যে আগামী প্রজন্ম সংশোধন হবে কি না। আমার অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা যারা আছেন তারা যদি যে স্পীড নিয়ে, বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যেভাবে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলা মায়ের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যে ত্যাগ করেছিলেন আজ যদি একটু মুখটা খোলেন নতুন প্রজন্মকে যদি তা বলতে পারেন, নতুন প্রজন্মকে যদি সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তবে আমার মনে হয় আগামী দিনগুলো আমাদের সন্তানদের জন্য অত্যন্ত সুখকর হবে।

ঠিক যেন বাংলাদেশ থেকে একটা নক্ষত্র খসে পড়ে গেল:

এই ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন আমার খুব কষ্ট হয় এবং দুতিন দিন আমার মনটা খুব খারাপ থাকে। এজন্য এটা আমি কারো সাথে আলাপ করি না, বলতেও চাই না। সেটা হচ্ছে বাকুন্ডি ক্যাম্পের ঘটনা। আমি যখন ট্রেনার হিসেবে ছিলাম ওখানে যারা নতুন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আসতো তাদেরকে ট্রেনিং দিতাম। ট্রেনিং এর পর সকাল বেলা পিটি করাতাম। দুপুর বেলা কোন কোন দিন আমার ভাগ্যে পরত রাইফেল চালানো, কোন কোন দিন পরত আবার গ্রেনেড ট্রেনিং করানো, আবার তাবুতে তাদেরকে মোটিভেট করতে

হতো। এরপর সন্ধ্যার পর কোনো কাজ থাকত না, তখন কোন কোন সময় অফিসে বসে অন্য ট্রেনারদেও সাথে আলাপ করতাম। সামরিক বাহিনীর যারা ছিলেন তাদের সাথে আলাপ করতাম অথবা নিজের তাবুতে বসে আমার ক্যাপ্টেনের সাথে আলাপ করতাম। আবার বের হয়ে প্রত্যেকটা তাবুর বাইরে দিয়ে পজিশনটা দেখে আসতাম, যারা নাইট ডিউটি দিচ্ছে তারা কি অবস্থায় আছে, প্রত্যেকটা তাবুর হাল-হকিকত কেমন, কোনো অসুবিধা আছে কি-না কোনো অসন্তোষ আছে কিনা এগুলো ঘুরে দেখতাম। একদিন আমি তাবুতে ঘুরছি হঠাৎ শুনি একটা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসছে। স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহল হলো, এখানে কোন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ তো আসার কথা না। এরপর যে তাবু থেকে আওয়াজ আসছে সে তাবুটা লক্ষ্য করে গেলাম। ওখানে তখন অবস্থান করছিল খুলনা কমার্স কলেজের ভিপি শাহনেওয়াজ জামান আজাদ। স্বাধীনতার পর ঢাকা ভার্সিটির ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম খালেক, এরা ওই তাবুর মধ্যে থাকতেন। তার তাবুর মধ্য থেকে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসছে। আস্তে আস্তে গিয়ে আমি তাবুটার বাইওে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি বাদ্যযন্ত্র যেটা বাজাচ্ছে একটা টিনের কৌটা। কৌটার মুখটা ফেলে দিয়েছে, টিনের মধ্যে কাঠি দিয়ে তার বেঁধে একতারা বানিয়ে বাজাচ্ছে। খুব সুন্দর সুমধুর কণ্ঠে একটা ছেলে গান গাচ্ছে। দেশাত্মবোধক গান। এই গানটা জীবনে সেদিনই প্রথম শুনি। "গেরিলা, গেরিলা, আমরা গেরিলা, আমরা নবীন প্রাণ, গাই চেগুয়েভেরার গান, আমরা নবীন প্রাণ, গাই মার্কস-লেলিন এর গান। বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারায় আমরা বলিয়ান। গেরিলা, গেরিলা, আমরা গেরিলা, গানটা আমার এত ভালো লেগেছে আমি দাড়িয়ে অনেকক্ষণ গানটা শুনলাম। শোনার পর আমি আস্তে করে সরে গেলাম। কারণ, তারা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে গানটা বন্ধ কওে দিবে। তাই ঠিক আছে গান গাচ্ছে গাক। তাবুটা তো ছেড়ে আসলাম আমি। পরের দিন আজাদ ভাইকে বললাম, ভাই আপনার তাবুতে গান গায় কে? আপনি কি শুনেছেন? আমি বললাম, আমি কাল সন্ধ্যার পর গিয়েছিলাম খাওয়ার পর বাইওে থেকে শুনলাম। আছে একটা বাচ্চা ছেলে, অনেক ভালো ভালো দেশাত্মবোধক গান গায়। সালাম ভাই আমার তাবুতে একটু পাঠান না। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছেলেটা আসলো ১৩/১৪ বছর বয়স হবে, ছোট-খাটো দেখতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি? বলল, শ্যাম

দাস। কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস এইটে পড়ি, এইটে পড়ো তুমি আসছো এখানে? আমাদের এলাকায় আর্মিরা ঢুকেছে এবং খুব অত্যাচার করছে। গ্রামের সবাই চলে গেছে তাই, মার সাথে আমিও চলে আসছি। তোমার বাড়ি কই? মুন্সীগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ থেকে এখানে আসলে? হ্যাঁ, আমরা মাওয়া দিয়ে এসেছি এবং ভোমরা বর্ডার দিয়ে আমরা পার হয়েছি। বারাসাতে আমার মামার বাড়ি তাই আমরা এদিক দিয়েই এসেছি। তারপর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু অল্প বয়স দেখে আমাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। পরে আমি একজনের সাথে এই ক্যাম্পে এসেছি। অনেক ঘোরাঘুরির পর যার সাথে এসেছি সে আমাকে ট্রেনিংয়ের জন্য নিয়েছে। এরপর তাকে আমি ডেকে এনে প্রায়ই তার গান শুনতাম। দেশাত্মবোধক গান ছাড়া সে অন্য গান গাইতে চাইতো না। অপূর্ব গলা, তো কিছুদিনের মধ্যে আমাদের এখানে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা যারা ট্রেইনার ছিলেন সবার খুব আদরের পাত্র হয়ে গেল। বেশিরভাগ আমার সাথেই এটা ওটা করতো এক দিন আমাকে বলল, স্যার একটা কথা বলবো। আমি বললাম বলো, আপনি যখন ভিতরে যাবেন তখন আমাকেও সাথে নিয়েন। আমি আর কারো সাথে যাব না এরপর যখন আমি ভিতওে ঢুকলাম সুন্দরবন এ এসে আমি ওখানে ক্যাম্প করলাম। একটা বেড়িবাধের একপাশে টেম্পোরারি একটা ক্যাম্প করলাম। ওখানে সে আমার সাথে আসলো, থাকতো আশেপাশে। কিছু রাজাকার ছিল আমাদেরকে খুব বিরক্ত করা শুরু করল। গ্রেনেড চার্জ করত, গোলাগুলি করত তাদের জন্য আমরা একটা ফাঁদ পাতলাম, আমরা আমাদের এই ক্যাম্পটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে নিলাম। একদিন আমরা খবর নিলাম, আমাদের থেকে এক দেড় কিলোমিটার দূরে তাদের একটা ক্যাম্প আছে। আরেকটা মোংলা পোর্টের সাথে আছে, আমরা এখন চিন্তা করলাম আমরা ওদের ক্যাম্প আক্রমণ করব। আমার সাথে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু অসীম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন ওদের সাথে বসে একটা প্লান করলাম, আমরা ৮/৯ জন একটা রাজাকারের ক্যাম্প আক্রমণ করব। সন্ধ্যার পরপরই আমরা সেই ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হয়েছি। ওরা ক্যাম্প করেছে একটা শাখা নদীকে সামনে রেখে, যাতে আক্রমণটা সুন্দরবন এর দিক থেকেই হবে। সুন্দরবনের যেদিক দিয়েই মুক্তিযোদ্ধারা ঢুকবে সে দিক দিয়েই হবে। তারা এদিকটা সামনে রেখে পিছনে অনেক দূর গ্রাম, মাঝে বিল রেখে খুব সেইফ জায়গার মধ্যে তারা ক্যাম্প

করেছে। যাতে চারিদিকের যেখান থেকে উঠুক দেখা যাবে, নদীটা খুব একটা বড় না, শাখা নদী। এপার ওপার গুলি রেঞ্জার মাঝেই আমরা চিন্তা করলাম ওদেরকে পাড়ে থেকেই আমরা আক্রমণ করব। কিন্তু আমাদের সাথে এক আর্মির হাবিলদার ছিলেন উনি বললেন যে এখান থেকে আক্রমণ করে কিছুই করতে পারব না তাদেরকে। তাদের যদি কিছু ক্ষতি করতেই হয় তবে নদী পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। ঠিক আছে আমরা নৌকায় করে নদী পার হলাম। আমরা ৯ জন সেই শ্যামল ছিল আমার সাথে, আমরা দুজন আর সাতজন সেনাবাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের, আমরা বেশ দূর থেকে নদী ক্রস করে পার হয়ে প্রায় হাফ কিলো হেঁটে গিয়ে একদম ওদের ক্যাম্পটাকে পুরোপুরি আমাদের পজিশনে আনলাম। এরপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলাম এবং সেই হাবিলদার ছিলেন। উনি ক্রোলিং করে সামনে গেল, আমাদেরকে বললো আসতে। এখানে একটা কথা বলে রাখি শ্যামল ট্রেনিংএ গ্রেনেডটা খুব ভালো থ্রোইং করতে পারত। সে আমার সাথে আছে, তাকে অন্য কোন অস্ত্র দেয়া হয়নি। তার সাথে কোমরের মধ্যে জড়ানো বেশ কয়েকটা গ্রেনেড রাখা আছে। ওখানে যাওয়ার পর সিগনাল পাওয়ার পরপরই সেই হাবিলদারের প্রথম ফায়ার ওপেন করল। আমাদের চারজনের হাতে থাকা রাইফেল একজনের কাছে একটা এলএমজি ছিল ফায়ার শুরু হল। সাথে সাথে শ্যামল একটা গ্রেনেড চার্জ করল। সে বিশাল ভয়াবহ অবস্থা। এদিকে সামনে চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল। আশে পাশে এরমধ্যেই উভয় পক্ষের গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। আমি নিচে শুয়ে গুলি চালাচ্ছি এর মধ্যেই শ্যামল ওদেরকে কখন আরেকটা গ্রেনেট চার্জ করেছে, আমি দেখি নাই। কিন্তু সে থ্রো করতে পারে নাই। আমার গোলাগুলির এক ফাঁকে আমি শ্যামলকে বলছি, শ্যামল গ্রেনেড চার্জ করো, গ্রেনেট চার্জ করো কোন সাড়া নাই। আমার মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, আমি কতবার বললাম গ্রেনেড চার্জ করো না।" এরপর তাকে দেখি উপর হয়ে পজিশন নিয়ে আছে। আমি বললাম শ্যামল গ্রেনেড চার্জ করো, কোন কথা নাই। এরপর আমার হাতে রাইফেল। আমি যখন তাকে পায়ে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়েছি, দেখি গড়িয়ে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? আমি আশ্চর্য হলাম। এরপর যা হোক আমাদের গোলাগুলিতে আমাদের সাথে যাদের গ্রেনেড ছিল গ্রেনেড চার্জ করার পর ওরা জায়গা ত্যাগ করে চলে গেল। পাঁচটা লাশ আমরা ওখানে পেলাম আহত অবস্থায়

১১ জনকে আমরা ওখান থেকে ধরলাম। কিন্তু আমি দেখলাম শ্যামলের নিথর দেহ, তার প্রাণ নাই। উঠিয়ে দেখি সে ঠিক কপাল বরাবর রাজাকারদের গুলি খেয়েছে, ওর বডিটা নিয়ে আমরা আসলাম। আসার পর ওর রক্তে সব ভিজে গেছে। লুঙ্গি পরা ছিল গ্রেনেডগুলো রাখার সুবিধার্থে। তার পকেটে ছোট একটা কাগজ পেলাম তাতে লেখা, স্যার আমি মারা গেলে আমার খবরটা মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েন। আমার ঠিকানা খুব সম্ভব কুমারপাড়া বা দাসপাড়া এরকম কিছু একটা হবে মুন্সিগঞ্জে, ঠিক আছে, আমরা পরের দিন তার লাশটা পাঠিয়ে দিলাম, ওপাওে যাওয়ার পর ওখানেই তাকে দাহ করেছে, সৎকার ওখানেই করেছে। ওর আত্মীয় স্বজনের কাছে লাশটা ফেরত দিতে পেরেছে কিনা জানিনা, আমরা লাশ পৌঁছে দিয়েছি হিঙ্গলগঞ্জ আমাদের আরেকটা ক্যাম্পে। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে তারা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়েছে, এরপর তার পরের খবর আমি জানিনা। স্বাধীনতার পর, অনেকদিন পরে আমার একটা কিউরিসিটি জাগলো, যাইনা মুন্সীগঞ্জে, একটু গিয়ে কুমারপাড়ায় খুঁজে বের করি, নব্বইয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আমি মুন্সিগঞ্জ গেলাম। যদিও আমার বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে না, কিন্তু যাওয়া হয়নি। ওখানে গেলাম মনের মধ্যে একটা কৌতুহল যদি পেয়ে যাই তার মাকে বা তার আত্মীয়-স্বজন তাহলে একটু দেখে আসলাম। ওরা বললো, এটা তো অনেক আগের। হ্যাঁ এই গ্রামটা ভেঙে পদ্মায় নিয়ে গেছে। এখন আর এটার কোন অস্তিত্ব নাই। ঠিক বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে খসে পড়লো যেভাবে, না থাক না সেভাবে শ্যামল ও আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেল কিন্তু তার স্মৃতিটা রেখে গেল।

আজকে বাংলা মায়ের কত সন্তান বঙ্গবন্ধুর ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাগল হয়ে এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে তার সংখ্যা কে জানে? পাগলের মত গিয়েছে কেউ বলে যায়নি। প্রত্যেকে বলেছে যে, মা তুমি দোয়া করো আমি যেন বিজয়ী হয়ে ফিরতে পারি, প্রত্যেকে নাকি তার মাকে বলেছে বা আত্মীয় স্বজনকে বলেছে দোয়া করবেন যাতে দেশের জন্য আমরা জান দিতে পারি। আজ তোমরা স্বাধীনতা ভোগ করছো, তোমাদের কাছে অনুরোধ, এই যে নাম-না-জানা কত পথে-প্রান্তরে স্বাধীনতার জন্য কত লোক, কত বীর সেনা জীবন দিয়েছে তাদেরকে একটু স্মরণ করো, তাহলে তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাগুন্ডি ক্যাম্প থেকে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল:

নতুন প্রজন্ম তোমরা যারা এবং আমার যারা মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা আছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার আবেদন আমি আজকে আমার ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধা যারা এখান থেকে ট্রেনিং নিয়েছে তাদেও ব্যাপারে বলবো না, যারা বাকুন্ডি ক্যাম্পের পরিচালনায় ছিলেন তাদের ব্যাপারে কিছুটা বলবো এবং সবার কাছে আমার অনুরোধ সকলকে খুঁজে বের করা যায় কিনা তোমরা সেই চেষ্টা করবে। আমার ক্যাম্পটা উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট থানার বাকুন্ডি নামক জায়গায়। ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুল ছিল, পিয়ারী লাল এক ভদ্রলোক ছিলেন, ওনার বাড়িতে উনি স্কুলটা দিয়েছিলেন, স্কুলের চারদিকে প্রায় ১০০ বিঘা জায়গার মতো হবে ওনার খালি ছিল, আর এখানেই আমাদের ক্যাম্পটা স্থাপন করা হয়েছিল। এটা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার পাশ দিয়ে ইছামতি নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে দেবহাটা থানার উল্টো দিকেই ইছামতি নদীর পাড়েই ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণায়। এটা ৯ নম্বর সেক্টর, ৯ নম্বর সেক্টরে ২ টা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল একটা ছিল সুন্দরবনের ভিতরে হিঙ্গলগঞ্জে, আর একটা ছিল বাকুন্ডি, বাকুন্ডিটা একটা বৃহত আকারের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল। এটার সম্পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩ নম্বর আসামী লিডিং সীম্যান ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন, তৎকালিন উনি ক্যাপ্টেন সুলতান এবং সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন মেজর এম এ জলিল। আর এই ক্যাম্পটা পরিচালনার মধ্যে যারা ছিলেন এর মধ্যে কোষাধ্যক্ষেও দায়িত্বে ছিলেন আব্দুল খালেক, সহকারী কোষাধ্যক্ষ ছিলেন উনি খুলনা কমার্স কলেজের তৎকালীন ভিপি শাহ নেওয়াজ চৌধুরী আজাদ, ওনাদের সাথে ছিলেন আমাদের নারায়নগঞ্জের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা মনিরুল ইসলাম। ১৯৮১ সালে বিএনপির কর্মি সন্ত্রাসী দ্বারা নিহত মনিরুল ইসলাম সাহেব, আমি মিজানুর রহমান বাচ্চু, স্বাধীনতার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোসফির হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট কাজী নূরুল ইসলাম, নারায়নগঞ্জের আর এক মুক্তিযোদ্ধা অশোক কুমার দাশ এবং মুসলে উদ্দিন, সশস্ত্র বাহিনীর ছিলেন সুবেদার মেজর শামসুল আজম সহ-অধিনায়ক ছিলেন, ছিলেন হাবিলদার মেজর দেলোয়ার হোসেন মিন্টু উনি পুলিশের ছিলেন, আর্মির ইনচার্জ ছিলেন হাবিলদার মেজর হাফিজুর রহমান, সহকারী ইনচার্জ ছিলেন আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, ষ্টোর

কিপার ছিলেন এম এ গফুর, সহকারী ষ্টোর কিপার ছিলেন মোশারাফ হোসেন, মেডিকেল অফিসার ছিলেন কাজী এমদাদুল হক, হাবিলদার মেজর মোকাম্মেল হোসেন, গোপন সংবাদ দাতা ছিলেন পুলিশের গিয়াস উদ্দিন মিন্টু, ট্রেনিং ইনচার্জ ছিলেন এয়ারফোর্সের লুৎফর রহমান, ইনেসটেক্টর ছিলেন আব্দুর রশিদ, আমজাদ হোসেন, আমান উল্লাহ, একরামুল হক, খলিলুর রহমান এরা সবাই সেনাবাহিনীর ছিলেন, এছাড়া আরও ছিলেন পুলিশের হাবিলদার নূরুল ইসলাম নুরু, ডিসপাস রাইটার কুতুব উদ্দিন, এডমিনিসট্রেটিভ অফিসার মোতাহার হোসেন, আর একজন ইনেসটেক্টর ছিলেন আবু ইউসুফ, পুলিশ হাবিলদার শামসুল হক, মেস কমান্ডার ছিলেন আব্দুল মালেক। এরা সবাই পরিচালিত হতেন ক্যাপ্টেন সুলতানের নির্দেশে। আমি যেসব ভদ্রলোকদের নাম বললাম উনারা তৎকালীন ইপিআর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনির বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পুলিশের কর্মকর্তা ও সিপাহী ছিলেন। যে কয়মাস আমি ক্যাম্পে ছিলাম তাদেও সাথে ২৪ ঘন্টা কাজ করাতে খুব একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজও এদের চেহারাগুলি আমার মনে আছে, আমার স্মৃতির মাঝে আজও তারা বিচরণ করছেন। এরা সবাই ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনে তৎকালিন পটুয়াখালী জেলা, বর্তমানের বরগুনা জেলা, বরিশাল জেলা, পিরোজপুর জেলা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা, এবং যশোরের নড়াইলের দিকের অংশগুলি তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার বৃহত্তর ফরিদপুর, বৃহত্তর বরিশাল আর খুলনা এগুলো ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনে ছিল, আমি আজকে আমার সহযোদ্ধারা যারা আজও জীবিত আছেন, যারা মুক্তিবাহিনীতে ছিলেন বিশেষ করে বরিশাল এবং খুলনা বিভাগের, আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি যদি এর মধ্য থেকে কারো সন্ধান আপনারা পান তবে আমাকে দিবেন।

কী ঘটেছিল সেদিন, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১:

অনেক তো পাঠ্যবইয়ে, গল্পের বইয়ে পড়েছো ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কি হয়েছিল। আজ না হয় একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখেই শুনে নাও কেমন ছিল সে অনুভূতি যখন জানতে পারলাম আমার সোনার দেশটি আজ থেকে আর অন্যের অধীনে নেই, আমার দেশটি এখন পরিচিতি পাবে এক স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আমার গর্ব। আজকে আমি স্মৃতিচারণ করবো ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর

বিজয় দিবসের দিন আমার অনুভূতি কি ছিল? কিভাবে আমরা কাটিয়েছি তার কিছুটা তুলে ধরবো। আমরা ৬ তারিখেই আমাদের এলাকা মোংলাপোর্ট এর আসেপাশে শরু মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলাম, এর পর থেকে আমরা বাইরে থেকে কেউ এসে যাতে এলাকার কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল করে লোকাল এডমিনিষ্ট্রেশনটা কড়াকড়িভাবে ঠিক রাখতে ছিলাম। আমি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ থেকে একটা খবর পাচ্ছি, যে সুন্দরবনে কিছু রাজাকার পালিয়ে আছে তারা আমাদের ক্যাম্পের উপর একটা মরণ কামড় দেবে। আমি চিন্তা করলাম এই সুযোগটা তাদেরকে আমি দেব না, আমি ১৫ তারিখে সন্ধ্যার পর আমার টুআইসি রফিক সাহেবকে নিয়ে বসলাম বসে আলাপ আলোচনা করলাম, যে গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে রাজাকাররা সুন্দরবনে একত্রিত হচ্ছে তারা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করবে এবং একটা মরণ পণ যুদ্ধ আমাদের বিরুদ্ধে করবে। আর এটা ওরা করলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এই স্বাধীনতার ঊষালগ্নে এসে যদি আমাদের কোন মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা হারিয়ে ফেলি তাহলে তা হবে আমার জন্য সবচাইতে দুঃখজনক একটা ব্যাপার। আমরা আলোচনা করলাম ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করার আগেই আমরা ওদেরকে আক্রমণ করবো। রফিক সাহেব বললেন, স্যার আপনি ক্যাম্পে থাকেন আমরা যাই, আমি বললাম, না এটা ঠিক হবে না। এটার নেতৃত্ব আমিই দিব, আমাকেই যেতে হবে, তবে যারা নাকি এখানে শিক্ষিত, কলেজ পড়ুয়া ছেলেরা আছে তাদেরকে আমি সাথে নিব না, কারণ তাদের পরিবার আছে পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্ব অনেক, এখন তারা মানুষ হয়ে সংসার চালাবে আমি এই চিন্তা করে তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি পুলিশ, আনসার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরে বয়স বেশি দেখে লোক নিলাম। এর মধ্যে ছয় জন এলএমজি ম্যান নিলাম, আমরা ১৬ তারিখ সকাল বেলা একটা নৌকায় কওে সুন্দরবনের একটা শাখা নদী দিয়ে সুন্দরবনে নামলাম। যেহেতু সুন্দরবনের রাস্তাঘাট আমরা কিছুই চিনি না, তাই ফরিদ নানাকে বললাম নানা সুন্দরবনের রাস্তাঘাট আমরা কিছু চিনি না তাই রাস্তা চিনানোর জন্য কাউকে পাওয়া যাবে কিনা। নানা বললেন আমার এক শিকারী পরিচিত আছে নাম গোপাল শিকারী, নানা তাকে খবর দিতেই অল্প সময়ের মধ্যে সে হাজির হল আমাদের কথা শুনে, সে বললো অনেক চেষ্টা করেও পরিবারের কারণে আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারিনি তাই এই কাজটায় আমি যাব

আপনাদের সাথে। দাদা আমি জীবনে অনেক বাঘ, হরিন শিকার করেছি আমার ট্রেনিংএর দরকার হবে না, আপনাদের সাথে আমি যাব। আমি বললাম আপনি রাইফেল চালাতে পারেন? তিনি বললেন না দাদা রাইফেলের দরকার হবে না বললো না দাদা হবে, আমার কাছে বন্দুকে বুলেট ও বিভিন্ন ধরনের কার্টিজ আছে, আমি বললাম কতগুলো কার্টিজ আছে আপনার কাছে, সে বললো দাদা আমি তো বিভিন্ন লোকের সাথে শিকারে যাই, তো শিকার শেষে তারা অবশিষ্ট কার্টিজ গুলো আমাকে দিয়ে যায় তা প্রায় আড়াশো কার্টিজ আমার কাছে আছে। আমি বললাম, ঠিক আছে এমনকি সারাদিনও ওদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হতে পারে তাই আপনি আপনার মতো করে সরঞ্জাম নিয়ে নেন। আমরা কখন রওয়ানা দেব জিজ্ঞাসা করলে সে বললো দাদা সুন্দরবনের রাস্তা তো অনেক কঠিন রাস্তা তার ভিতর দিয়ে হাটতে পারবেন না, আমি বললাম আমরা পারবো, সে বললো না দাদা আপনি তো দেখেন নি, যদি দেখেন তখন বলতে পারবেন, এমনি স্বাভাবিক রাস্তায় আমরা ঘন্টায় চার পাচঁ মাইল হাটতে পারি কিন্তু ওখানে ঘন্টায় আধা মাইল ও হাঁটতে পারবেন না। আমি বললাম ব্যাপারটা কি? দাদা ওটা খুব সংকটপূর্ণ রাস্তা আপনি গেলে বাস্তবতা বুঝবেন। আমার কৌতুহল জাগলো এমন কি রাস্তা যে এক ঘন্টাতে আধামাইল হাটবো। ফজরের নামাজের পরেই আমরা রওয়ানা হলাম আমার সাথে ৪৫/৪৬ জন নিয়ে রওয়ানা হলাম। ইউসুফ বাধ সাধলো, তাকে নিতেই হবে, আমি বললাম না, তখন সে বললো তাহলে ক্যাম্পে ফিরে এসে আমার লাশটা দেখবেন। আমি স্যার আপনাকে একা ছাড়তে চাই না আমি আপনার সাথে যাব। আমি বললাম তুমি বাচ্চা ছেলে, সে বললো আমাকে একবার মৃত্যুর হাত থেকে আপনি নিয়ে এসেছেন আমি স্যার আপনাকে ছেড়ে কোথাও থাকবো না। আমাকে আর্মস দেন আর না দেন আমি আপনার সাথে যাব, আমি বললাম ঠিক আছে তোমার আর্মসই তুমি নিবা। আমরা চললাম আট থেকে সাড়ে আটটার দিকে আমরা বনের ভিতরে গিয়ে নামলাম। নামার সাথে সাথে দেখি গাছে সাপ ঝুলে আছে, আরো বিচিত্র ব্যাপার সাপ কেন? গোপাল শিকারী বললো এটা সুন্দরবনের ন্যাচার, প্রত্যেকটা গাছে আপনি সাপ দেখবেন তবে ওরা পড়বে না আপনাকে দেখলে ওরা গুটিয়ে উপরে উঠে যাবে। আপনি আমার সাথে আসেন, আমরা বনের ভিতরে উঠলাম, বনের ভিতরে ওঠার পরে যা দেখলাম তা আমার জীবনে দেখিনি তোমরা যারা গ্রামে আছো তারা বুঝবা

সুন্দরবনের ভিতরে গরুর খুটার মতো ছয় ইঞ্চি পর পর এরকম খুটা, এটার ভিতর দিয়ে কিভাবে হাঁটবো! তো ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলা লাগে, গোপাল নিজে হাঁটে বলে আধা মাইল বলছে এখন আমার মনে হচ্ছে, না ঘন্টায় আমরা কোয়ার্টার মাইল যেতে পারবো। যাহোক আমাদের যেখানে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের ইনফর্মাররা গোপাল শিকরীকে ইনফর্ম করে দিয়েছে, রাজাকাররা সুন্দরবনকে সামনে রেখে এবং বঙ্গোবসাগরকে পিছনের দিকে রেখে ক্যাম্প করেছে অর্থাৎ তাদের যদি এটাক করা হয় তাহলে বঙ্গোবসাগরের দিকে পালিয়ে যাবে। আমরা দেড়টা দুটার দিকে ওদের কাছাকাছি পৌঁছালাম ওদের ছাউনিগুলি দেখা যাচ্ছিল। আমরা ওদের ক্যাম্পটাকে ঘেরাও করে চারিদিকে পজিশন নিলাম, আমার সাথে রফিক সাহেব বললেন ওদের তো কেউকে দেখা যাচ্ছে না তো আমি একটা ফায়ার করে দেখি যে ওরা কি উত্তর দেয়। রফিক একটা ফায়ার করলো কোন উত্তর নাই, কতক্ষণ পর দেখি একটা ফায়ার ওখান থেকে হলো, আমরা বুঝলাম তারা ওখানে আছে এরপর আমাদের এলএমজি, রাইফেল গুলি গর্জে উঠলো, তারা দুই চারটে গ্রেনেড চার্জ করলো তারপর তারা নিরাস্ত্র, আমি আমাদের দলটাকে আর গুলি ছুড়তে নিষেধ করে বললাম তাদের পজিশনটা দেখে নেই, সবাই এ্যাডভান্স হও। ওরা আমাদের থেকে ৫০০ মিটারের মত দূরে ছিল আমরা এ্যাডভান্স হয়ে ২০০ মিটারের মত কাছাকাছি গেলাম এমন সময় দেখি পিছন থেকে গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে। অবিরাম গোলাগুলি, আমরা হতভম্ভ হয়ে গেলাম। ওরা কি পিছন থেকে এটাক করেছে? তখন আমি রাজাকারদের দিকে দুইটা এলএমজি তাক রেখে বাকিগুলো অপজিট দিকে তাক করে দেখতে লাগলাম শব্দের উৎসটা কোথায়? আমরা উঠে আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি যত যাচ্ছি তত গুলির শব্দ বিভিন্ন গুলির শব্দ। গ্রেনেড চার্জ হচ্ছে, গোলাগুলি হচ্ছে, হ্যাঁ আমরা অগ্রসর হয়ে যখন নদীর পাড়ের দিকে এলাম তখন দেখি আমাদেও ক্যাম্পের দিকে আওয়াজটা হচ্ছে। অজশ্র গোলাগুলি হচ্ছে গ্রেনেড চার্জ হচ্ছে। ভাবলাম ব্যাপারটা কি? আমার হঠাৎ মনে পড়লো আমার সাথে তো ওয়াকিটকি আছে। আমি আমাদের ক্যাম্পে যাকে ওয়াকিটকির দায়িত্বে রেখেছিলাম সেই রবের সাথে কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করছি কিন্তু সে রিসিভ করে না। আরো ঘাবড়ে গেলাম। এখন কি পজিশন যতোই সামনে আসি ততোই আওয়াজটা প্রকট হচ্ছে, আমি বললাম ওরা তো ক্যাম্প আক্রমণ করেছে,

তাড়াতাড়ি আমরা মাঝিদের সাথে যার হাতে যা আছে তা দিয়ে বেয়ে আসতে শুরু করলাম। সাত আট মিনিট পর দেখলাম ওয়াকিটকি রেড সিগন্যাল দিচ্ছে রব ব্যাক করেছে। রব আমাকে বললো, আপনি কোথায়? আমি বলালাম আমরা রাজাকারদের এ্যাটাক করেছিলাম কিন্তু পিছনে অনেক গোলাগুলির শব্দ শুনে ক্যাম্পের দিকে আসতেছি এটা কিসের গোলাগুলি? তোমাদের কি কেউ এ্যাটাক করেছে? ও বলে না, আপনে তাড়াতাড়ি আসেন। আমি বললাম কেন কি ব্যাপারটা কি? ও বললো পাকিস্তনী আর্মি স্যারেন্ডার করেছে আমরা সেই ফুর্তিতে গোলাগুলি করছি আর গ্রেনেড ফুটাচ্ছি। হায়রে আল্লাহ খুশিতে আমি যে তাদেরকে কিছু বলবো সে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমার সাথে আমার কাছাকাছি যারা বসেছিল তারা ওয়ারলেছের কথা শুনেছে এবার তারাও আনন্দে হৈচৈ করে উঠেছে। মাঝিরা বললো স্যার ব্যাপার কি? আমি বললাম ঢাকা স্বাধীন হয়ে গেছে আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। এবার আমার সাথে যারা ছিল তারা যার যার অস্ত্র আকাশের দিকে উঁচিয়ে ইচ্ছে মত গোলাগুলি শুরু করে দিল, তারা ফুর্তি করা শুরু করলো আমি নিষেধ করলাম না। যাক গুলিতো আমাদের আর দরকার নাই তাই করুক না একটু ফুর্তি। যাহোক তখকার যে আমার অনুভুতি তা তোমাদেরকে আমি বোঝাতে পারবো না। এটা আমার জীবনের একটা স্মৃতি, যদি তোমাদেরকে সেই জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে তোমদেরকে বোঝাতে পারতাম যে নয় মাসের যুদ্ধের পর আমরা যে একটা দেশ পেয়েছি আমাদের নেতৃত্ব দিবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, আমরা এই আশা বুকে নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছি এবং আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়ে গেছে আমাদের আর চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। আমরা ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে এলাম। তখন বিভিন্ন ভাবে জয় বাংলার শ্লোগান দিচ্ছে, আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, মুখোরিত আমার ক্যাম্প। এটা দেখে আশে পাশের যতো লোক ছিলো মহিলা বাচ্চা সকলে ভিড় করেছে। আমি অভিভুত হয়ে পড়লাম আমার জীবনের এটা একটা স্বরণীয় ঘটনা। সারারাত ধরে চললো আনন্দ, মহিলারা তেলের পিঠা পাটিসপ্টা পিঠা, মুরগির মাংস, ভাপা পিঠা কত কি নিয়ে হাজির হচ্ছে। আমরা লোক হচ্ছি ১৩২ জন কিন্তু শত শত লোকের খাবার আসতে লাগলো সকালে। মহিলারা নিয়ে এসে বলছে স্যার আপনি একটু খাবেন। আপনি যদি না খান আমি খুব দুঃখ পাব। সারারাত, সকাল, সারাদিন

শুধু খাবার আর হৈচৈ। আমার মনে হয় গ্রামে যত গাছে ফুল ছিল তা আর গাছে ছিল না। সব মুক্তিযোদ্ধাদের তারা ফুলের মালা দিয়েছে। এমন কেউ ছিল না যে আট থেকে দশটা মালা না পেয়েছে। ওই ইউনিয়নের যত লোক ছিল সকলে এসে ভিড় করেছে আমাদের ক্যাম্পে। আজকে আমার বয়স ৭৫ এর বেশি কিন্তু যখনই এসব স্মৃতি মনে পড়ে আমি আপ্লুত হয়ে পড়ি।

আজও জানতে পারলাম না কেন সেই ১ মাস আমাদের কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলো:

যুদ্ধ বিজয়ের পর বাড়ি যাওয়ার পালা, আমি আগে বলেছি ১৬ ডিসেম্বর সারাদিন একটা উৎসবের দিন ছিল, ১৭ তারিখ সারাদিন শেষে রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে খুলনা থেকে আমাকে মেসেজ করা হলো, ক্যাম্পের যিনি ইনচার্জ ছিলেন ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব আমাকে বললেন বাচ্চু তোমার সাথে ঢাকার যে কয়জন আছে তাদেরকে নিয়ে তুমি সকালেই রওয়ানা দাও, খুলনাতে চলে আসো। আমি ওনাকে বললাম, ক্যাম্পের চার্জ কাকে দিব, উনি বললেন আপাতত তুমি টুআইসিকে দিয়ে এসো পরে আমরা ব্যাবস্থা নিব। টুআইসি রফিক সাহেবকে ডেকে বললাম, আমাকে তো চলে যেতে হচ্ছে, সকালে আমি চলে যাব, আমার যারা মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা আছে সবাইকে একটু খবর দেন। সবাইকে খবর দেয়া হলো, সকলে সামনে আসলো, আমি সবাইকে বললাম অনেক দিন তোমাদের সাথে ছিলাম তোমাদের সাথে একটা আত্মীয়তার মতো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে, আমি তোমাদেরকে আমার মায়ের পেটের আপন ভাইয়ের মত দেখেছি তার মাঝেও অবস্থার প্রেক্ষিতে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে থাকতে পারি, আজকে আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি একটা বিরাট জয় নিয়ে আমারা যার যার বাড়িতে ফিওে যাব, আমরা এক এক জন এক এক জায়গা থেকে এসে একমনা হয়ে, এক পরিবার হয়ে লড়েছি, একে অপরের দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি এরপরও যদি কেউ আমার ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে থাকো তবে আমাকে বড় ভাই হিসেবে ক্ষমা কর দিও। আমি খেয়াল করলাম যে মুক্তিযোদ্ধা যারা আমার সামনে ছিল তাদের অনেকের চোখ পানিতে ছল ছল করছে। আমি তাদেরকে বললাম বেচেঁ যদি থাকি আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবো তোমরাও যদি পার কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হলে

যোগাযোগ করো। ১৭ তারিখ সকালে আমি বাজুয়া ক্যাম্প থেকে খুলনার উদ্যেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাতে নৌকা একটা ঠিক করা ছিল, ফজরের আযানের পর পর আমরা রওয়ানা হলাম, আমার সাথে আমার নারায়নগঞ্জের ছাত্রনেতা মনিরুল ইসলামের ছোট ভাই যে এখন আমেরিকা প্রবাসী প্রকৌশলী আব্দুর রব খোকা তাকে নিলাম ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেবের ছোট ভাই সালাউদ্দিন আহমেদ চুন্নু তাকে নিলাম, খুলনার শাহনেওয়াজ জামান আজাদ আমি আগে ওনার পরিচয়টা দিয়েছি উনি কমার্স কলেজের ভিপি ছিলেন, তার ছোট ভাই শাহ আলম চৌধুরী মিরাজকে সাথে নিলাম, ইউসুফ আমাকে বললো স্যার আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, আমি বললাম ঠিক আছে তুমি চলো আমার সাথে। আমরা বাজুয়া ক্যাম্প সকালে ত্যাগ করলাম, আমি অবাক হলাম আমার সাথের মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা রাতে কেউ ঘুমায়নাই, আমি কখন যাব, আমাকে নৌকায় উঠিয়ে দিবে আজও সেই স্মৃতিটা মনে পড়ে আমার চোখে পানি এস পড়ে, আমি দেখেছি তারা অনেকে বাচ্চাদের মতো হু হু করে কেদেঁছে আমাকে পায়ে ধরে সালাম করেছে দোয়া নিয়েছে আমি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি। যাহোক বিদায়ের পালা শেষ হলো, আমরা রওয়ানা দিলাম, ঠিক দুপুর নাগাদ খুলনায় এসে আমরা পৌঁছলাম, ১৮ তারিখ বাংলাদেশের প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেকটা জেলা প্রায় মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজাকাররা খুলনা শহরটাকে আকড়ে ছিল, ১৬ এবং ১৭ তারিখ মুক্তিবাহিনীরা শহরে ঢুকতে পারেনি, তবে ১৯ তারিখে একটা প্লাটুন হয় যে তাদেরকে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হবে, সাথে মিত্রবাহিনীও থাকবে, এ কথা তারা জানতে পেরে ১৭ তারিখ সন্ধ্যার পর থেকে রুপসা পেরিয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিল। ১৮ তারিখ আমি নেমে দেখি পুরো শহরে মিছিল হচ্ছে মানুষ একজন আর একজনকে কোলাকুলি করছে, সে এক অপূর্ব ব্যাপার মিষ্টি খাওয়া খাওয়ানো হচ্ছে। আমি আমার সাথে যারা ছিল তাদের নিয়ে হেডকোয়ার্টারে দেখা করলাম, হেডকোয়ার্টার ছিল তখন খুলনা সার্কিট হাউজের অপজিটে সবুর খানের একটা ক্লাব নাম ইউনাইটেড ক্লাব সেখানে। আমরা সেখানে অবস্থান নিলাম, মেজর সাহেবের সাথে দেখা করলাম তার সাথে সালাম বিনিময় হলো, উনি বললেন তোমার এদেরকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দাও, মুক্তিযোদ্ধাদের তখন অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল খালিশপুরের পাশে দৌলতপুরে, আমি থেকে গেলাম হেডকোয়ার্টারে এবং আমার সাথের ভাইদের পাঠিয়ে দিলাম

মুক্তিযোদ্ধার অস্থায়ী ক্যাম্পে। আমি হেডকোয়ার্টাওে ইউনাইটেড ক্লাবে থাকলাম এখানে মেজর জলিল সাহেব থাকতেন আর ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব থাকতেন দৌলতপুর। যাক ১৮ তারিখ গেল আমি থাকতে লাগলাম, ২২ তারিখে মেজর জলিল সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে মেসেজ এসেছে আমি কাল সকালে ঢাকা যাচ্ছি, তাই তোমরা ঢাকার যে কজন আছো তৈরি হয়ে যাও তোমরা আমার সাথে যাবে। দীর্ঘ ৯ মাস পর বাড়িতে ফিরবো তাই আনন্দে মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। সারাটা রাত আর ঘুমোতে পারিনি, সকালে পাঁচটা গাড়িতে করে আমরা রওয়ানা হলাম। পাঁচ গাড়ির মধ্যে দুইটা গাড়ি যোগাড় করে দিয়েছিলেন তৎকালিন বিএলএফ এর কমান্ডার বর্তমান বাগেরহাট জেলাপরিষদের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান টুকু ভাইয়ের ভগ্নিপতি তখনকার এমপি বারি ভাই, আমার সাথে ছিল তখন অশোক দাস, মুসলে উদ্দিন, আব্দুর রব, সালাউদ্দিন চুন্নু, ইউসুফ এবং বরিশালের আর একটা ছেলে রুহুল আমিন, প্রথম গাড়িতে সামনে বসেছেন মেজর জলিল সাহেব গাড়ি চালাচ্ছে মুসলে উদ্দিন পিছনে আমি এবং ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দিন সাহেব। ঠিক সকাল ৭ টায় আমরা রওয়ানা দিয়েছি। উদ্দেশ্য রাস্তার মধ্যে কোথাও আমরা নাস্তা সেরে নেব। যশোর ঢোকার আগে বসুন্দিয়া মোড়ে এসে দেখি রাস্তায় লাইন দেয়া আর্মি, ব্যাপরটা কি? আমাদেরকে থামালো আমরা সবাই গাড়িগুলি রাখলাম, একজন এসে ড্রাইভারের জানালায় টোকা দিল মুসলে উদ্দিন ভাই জানালা খুললে মেজর সাহেবকে দেখে স্যালুট দিল এবং তার পরিচয় দিল। স্যার আমি লেফটেনেন্ট হিডিড, আপনার জন্য স্যার একটা মেসেজ আছে, মেজর মঞ্জুর সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাথে আপনাকে সার্কিট হাউজে যেতে হবে। মেজর সাহেব তার সাথে কথা না বাড়িয়ে বললেন ঠিক আছে চলো, সামনে লেফটেনেন্ট এর গাড়ি আমাদেরকে স্কট করে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিছনে ওদের অনেক গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সার্কিট হাউজে গিয়ে হাজির হলাম। আমাদেরকে নিয়ে একটা বড় হল রুমে বসানো হলো। আমরা সবাই ওখানে বসলাম, ১০/১২ মিনিটের মধ্যে ওখানে খুব স্মার্ট একজন অফিসার ঢুকলেন এসে বললেন আই এম মেজর মঞ্জুর, মেজর প্লিজ মিট টু মি বলে হাত মিলালেন, তারপর বললেন তুমি তো সব জান এবং বোঝ, আমি শুধু অর্ডারটা পালন করছি। মেজর সাহেবকে একটা চিঠি দেখালেন তিনি হাতে না নিয়ে পড়লেন, পড়ে বললেন ঠিক আছে

তুমি তোমার দ্বায়িত্ব পালন কর। মঞ্জু সাহেব বলেলন তোমার সাথে যে সব মুক্তিযোদ্ধারা আছে তাদের কাছে আর্মস আছে সেগুলো স্যারেন্ডার করে দাও। আমরা একজন আর একজনের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, মেজর জলিল সাহেব ক্যাপ্টেন সাহেবকে বললেন সুলতান সবগুলি আর্মস এদেরকে বুঝিয়ে দাও। মঞ্জুর সাহেব তখন ৮নং সেক্টও কমান্ডার ওনার সাথে ছিলেন ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা। মঞ্জুর সাহেব হুদা সাহেবকে বললেন হুদা তুমি কার কাছ থেকে কি আর্মস পেয়েছো একটা তালিকা করে সব কিছু উল্যেখ কর। আমরা আর্মস দিয়ে দিলাম তারা তালিকায় উল্লেখ করে নিয়ে নিল। আমাদের সাথে পাচঁজন আর্মি কমিসন্ড অফিসার ছিলেন, একজন ক্যাপ্টেন, চার জন লেফটেনেন্ট এর মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন, আর মেজর জলিল সাহেব ছিলেন। এই পাঁচ জন এবং মেজর সাহেবকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে গেলেন, মেজর সাহেবের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ওনার সাথে আর আমাদের দেখা হয়নি, কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন,আমরা জানতাম না। আমরা যে ঘরের মধ্যে ছিলাম আমাদেরকে সেখানেই থাকার ব্যাবস্থা করা হলো এবং বলল পরবর্তী নির্দেশ না আসা পযর্ন্ত আপনাদেরকে এখানে থাকতে হবে। আমরা কনর্ফাম হয়ে গেলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমরাই প্রথম রাজবন্দী। যাহোক বাইরের কারো সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই, পাশাপাশি দুটো রুমে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছে আমরা ফ্লোরিং করে থাকি। দিন যেতে থাকলো, আমরা ২৩ তারিখে এ্যারেষ্ট হয়েছি, ডিসেম্বর মাস গেল জানুয়ারী মাস যেতে থাকলো হঠাৎ জানুয়ারীর ৮ তারিখে আমরা শুনতে পেলাম বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন উনি লন্ডন যাচ্ছেন, আমাদের মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা মুক্তির আলো জ্বললো, বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তি পেয়েছেন তখন আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। আমরা ৯টা মাস অনেক সম্মুখ যুদ্ধ করেছি আমাদের মধ্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা চলে গেছেন, এত কষ্ট করেছি দেশের জন্য তার পরেও কেন আমরা এরেষ্ট হলাম কারো কাছে কোন জবাব পেলাম না, কি আমাদের অপরাধ আমরা কি করেছি? ১০ তারিখ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলেন আমাদের সাথে বাইরে কারো কোন যোগাযোগ নেই এর মধ্যে ডিসেম্বরের ২৫ বা ২৬ তারিখ হবে পত্রিকায় খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল যে যশোরে মেজর জলিল তার দলবল সহ গ্রেপ্তার। খুব সংক্ষিপ্ত খবর ছিল সেটা পড়েছিলাম। ১২ তারিখ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিলেন, ১৬ তারিখ সকালে

আমরা ঘুমের থেকেও ঠিক মতো উঠিনি এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো, দেখি সেন্ট্রি, সে বললো, স্যার আপনারা সবাই ড্রয়িং রুমে আসুন মেজর সাহেব এসেছেন। ঠিক আছে আসছি, আমরা তৈরি হয়ে সকলে গেলাম ড্রয়িং রুমে। দেখলাম ৮নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জু সাহেব বসে আছেন ওনার সাথে ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা যিনি ৭ নভেম্বর সিপাহি বিদ্রোহে হত্যা হয়েছিলেন আর মেজর মঞ্জুরকে জিয়া হত্যা মামলায় ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। মেজর মঞ্জুর বললেন, আপনারা দেশের সূর্য্য সন্তান দেশ যতদিন থাকবে ততদিন বাংলার জনগণ আপনাদের সম্মান করেবে কিন্তু আপনাদের এই যে দুঃখ জনক অধ্যায়টা সংঘটিত হয়েছে আমার হাতে, আপনারা বিশ্বাস করেন আমি আজও জানি না কেন আপনাদেরকে এতদিন বন্দি রাখা হলো, আপনাদের অন্যায়টা কি? আমি সুলতান সাহেবকে চিনি, মেজর জলিল সাহেবকে চিনি, ৯ টা সেক্টরের মধ্যে যুদ্ধে পারদর্শী মেজর জলিল যার নাম বিবিসি থেকে প্রচার হতো, আজকে উনি কেন বন্দী হয়ে থাকবেন? যাহোক ঢাকা থেকে মেসেজ এসেছে অবিলম্বে আপনাদেরকে গণভবনে পৌঁছে দেবার জন্য। আপনারা ঢাকা কয়জন যাবেন? রুহুল আমিন বলল আমি এখান থেকে বরিশাল যাবো তাই ওকে বাদ দিয়ে ক্যাপ্টেন সুলতানকে বললেন তোমার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত আসে নি তাই তোমাকে ছাড়া বাকি সকলকে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু একটু সমস্যা আছে আমাকে আজকের মধ্যেই গণভবনে পৌছিয়ে দিতে কিন্তু আমাদের যে হেলিকপ্টার আছে সেটা ৪ সিটের, আপনারা এখানে ১২ জন, আমার নিয়ে যাওয়াটা একটা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে যাবে। তাই কিছু মনে করবেন না। আমি একটা গাড়িতে করে আপনাদেরকে পাঠাচ্ছি, উনি একটা মাইক্রোবাস ঠিক করে দিলেন আমরা রওয়ানা হলাম ৯ টার দিকে, ক্যাপ্টেন সুলতান ভাইকে রেখে আমাদের যেতে মনটা চাইছিল না তার পরেও উপায় নাই তাই ওনাকে রেখেই রওয়ানা হলাম। ঢাকা এসে সাড়ে চারটার দিকে পৌঁছলাম, রাস্তার মধ্যে আরিচা পার করার জন্য আমাদের জন্য বিশেষ ফেরির ব্যবস্থা ছিল, আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো গণভবনে, আমরা আসার সময় আমাদের যার যার আর্মস বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল তালিকা দেখে। গণভবনে ঢোকার সময় একজন সিকিউরিটি বললেন আপনারাতো আর্মস নিয়ে ভিতরে যেতে পারবেন না, তাই আর্মস গাড়ির ভিতরে রাখুন আমরা এগুলো পাহারা দিব। আমরা সেগুলো রেখে ভিতরে গিয়ে দেখি আমাদের জন্য

অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নারায়নগঞ্জের কয়েকজন নেতাকে নিয়ে মনির ভাই। মনির ভাই বললেন আমরা ১২ টা থেকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। তখন বুঝলাম আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য কার চেষ্টা ছিল। মনির ভাই বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে আমাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে আমার সাথে তারা ট্রেনিং করেছে, আমার সাথে যুদ্ধ করেছে, তারা কি অন্যায় করেছে, তারা আমার সাথে ছিল, আজকে প্রায় একমাস যাবৎ তাদেরকে বন্দী কওে রাখা হয়েছে যশোরে? বঙ্গবন্ধু সব কিছু শুনে তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে বললেন আমি চাই আজকে এ্যাজ আরলি এ্যাজ পসিবল তাদেরকে আমার সামনে হাজির করা হোক। ওখানে গিয়ে দেখলাম অনেক নেতা, মন্ত্রী যারা আছেন, তাজউদ্দিন সাহেবও সেখানে ছিলেন, আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুকে এক এক করে গিয়ে সালাম করছি কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুকে সালাম করার সময় আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। আমি বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কান্না শুরু করলাম, ওখানে যত লোক ছিল সবাই চুপ হয়ে গেল, আমি যার নির্দেশে, যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করেছি তার সামনে আমি দাড়িয়ে, একটা হিমালয়ের সামনে যেমন একটা মহিষের শাবক ঠিক তেমনি আমি। আমি আর আমার আবেগটা ধরে রাখতে পারিনি, আমি বঙ্গবন্ধুর পা জড়িয়ে ধরে অনবরত হাউমাউ করে কেঁদে যাচ্ছি, তখন আমাকে মনির ভাই ও শ্রদ্ধেয় মরহুম মেয়র হানিফ সাহেব ওনারা আমাকে জোর করে উঠালেন। আমি উঠে বঙ্গবন্ধুর দিকে যখন চেয়েছি ওনার চোখটাও ছলছল করছে, উনি মনির ভাইকে বললেন, মনির তুই বাসায় নিয়ে যা, ওকে সময় করে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আর উনি কোন কথা বলতে পারলেন না। পাশের রুমে আমাদের খাবার ব্যাবস্থা করেছিলেন আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। আমরা আবেগে এতো আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমরা ওখানে কেউই তেমন খেতে পারলাম না। যাইহোক ওখান থেকে রওয়ানা হলাম। ইউসুফকে আমি বললাম তুমি কি নারায়নগঞ্জ যাবা, না এখান থেকে চলে যাবা? ও বললো স্যার আমি তাহলে এখান থেকে বাড়িতে চলে যাই? আমি দুইশত টাকা তাকে দিলাম সে ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেল। আমি, মুসলে উদ্দিন ও আব্দুর রব আমরা তিনজন মনি ভাইদের সাথে নারায়নগঞ্জ চলে আসলাম। ক্যাপ্টেন সুলতান সাহেবের ভাই সালাউদ্দিন আহম্মেদ চুন্নু কাপাশিয়ায় থাকতো সে কাপাসিয়ায় চলে গেল। আমরা বাসায় এসে পৌঁছলাম। কিন্তু যুদ্ধের পরে আজকে ৫০ বছর চলে গিয়েছে, একটা

জিনিস আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, সেটা হলো কেন আমাদের গ্রেপ্তার করা হলো? বহু চেষ্টা করে বিষয়টা জানতে পারিনি, পরে মেজর জলিলের নামে কিছু অভিযোগ দিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আর্মি ট্রাইবুনালে ওনার বিচার হয়েছিল সেখানে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন আর একজন সেক্টর কমান্ডার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের সাহেব। মেজর জলিলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তিনি তা মিথ্যা প্রমাণ করে ৭/৮ মাস পর জেল থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। আমি আজও চিন্তা করি আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো? কে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? যুদ্ধের পরে বিনা দোষে, কার ষড়যন্ত্রে, কার কারণে, কার পাপে এতোগুলো দিন বন্দী অবস্থায় আমরা কাটিয়েছি?



বীর মুক্তিযোদ্ধা
এ.বি.এম. রুহুল আমিন হাওলাদার
কো-চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি

থাকবো না চলে যাব কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধের পতাকা বহন করবে তারা যেন আদর্শ নাগরিক হয়, সুশিক্ষীত হয় এবং তাদের দেশপ্রেম যেন অসাধারণ ও অনন্য হয়। কারণ তারা মুক্তযোদ্ধাদের সন্তান। তারা যেন অন্য মানুয়ের সন্তানদের থেকে যেন মাথা উঁচু করে চলতে পারে এই সমাজ ব্যবস্থায়। সেই চরিত্র নিয়ে তাদেরকে বলিয়ান হতে হবে। হয়তো তাদের চলার পথে কিছু প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে, বা হয়েছে, হচ্ছে, তার পরেও তাঁদেরকে মনে রাখতে হবে তারা মুক্তযোদ্ধার সন্তান, যুগ যুগ ধরে যেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে মানুষ সম্মান করে, সেই ভাবে নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মানুষের কাছে সমাদৃত হতে হবে, সাধারণ মানুষ যেন বলে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দেখো সে কত মহান, কত সৎ, কত ত্যাগী, সাধারণ মানুষের জন্য কত ভালোবাসা তার হৃদয়ে, সাধারণ মানুষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের চরিত্র হবে ব্যতিক্রম। মুক্তিযাদ্ধার সন্তানরা যদি নিজেদের কে আলাদাভাবে দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলে, নিজেকে পিতার মতো সৎ ও আদর্শবান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এই সমাজ ব্যবস্থায়, দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, এবং মুক্তিযুদ্ধেও চেতনায় উদ্দুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়াতে পারে

সাধারণ সমাজের মানুষের কাছে, আমাদের ত্যাগ ও আদর্শের স্মৃতি বহমান রাখে তাহলেই আমাদের ত্যাগ আর আদর্শ প্রতিষ্ঠা হবে সাধারণ মানুষের মাঝে। তাহলে আমরা তোমাদের কর্মের মাঝে বেঁচে থাকব, তোমরাই আমাদের পতাকা বহন করবে। আমরা যা চেয়েছিলাম বাংলার মানুষের মাঝে হাসি ফোটাবো বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ব, মানুষ সুখে থাকবে নিরাপদে থাকবে, একটি আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে উঠবে, পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের পতাকা উড়বে মানুষ তাকিয়ে বলবে বাংলাদেশের মানুষ অনেক ভালো, বাংলাদেশ আজ তাদের সমাজ ছাড়িয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে চলছে, এটাই আমি আশা করি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কাছে।

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আমি রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছি, বেঁচে থাকার কথা ছিল না, আমার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল, তার সাথে আমি ২৯ শে ডিসেম্বর যশোর এর কাছাকাছি ঢাকায় আসার পথে বন্দি হতে হয়েছিল, সেদিনটাকে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে, মেজর জলিল সাহেবের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে সরাসরি ছিলাম, কিন্তু তার পরেও স্বাধীন দেশে বাড়িতে ফিরে আসার পথে এই ধরনের একটা দূর্ঘটনা আমাদের রাজনৈতিক জীবনে এটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাজনীতি কতটা নির্মম। যাইহোক আমি আশা করি এরকম ঘটনা আর কারো জীবনে যেন না ঘটে, আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছি আমাদের সকলেরই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

আমার পরিচয়, আমি এ.বি.এম রুহুল আমিন হাওলাদার, আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে খুলনা ও খুলনার আশেপাশে, যশোরে, মংলা। আমরা যুদ্ধ শেষে বাড়িতে ফিরে আসি, এরপরে আবার লেখাপড়া শুরু করি, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম, আমি ১৯৮৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা কোটা থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি, পরবর্তীকালে আমি ১৯৮১ সালে উপমন্ত্রীর হিসেবে জুট ও টেক্সটাইল এর দায়িত্বে ছিলাম। পরে এরশাদ সাহেব যখন দল গঠন করেন আমাকে আহ্বান করেন তিনি, তার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল, তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, আমি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলে ছিলাম, তখন আমি ঢাকা মহানগরের দায়িত্বে ছিলাম, তেজগাঁও দায়িত্বে ছিলাম, ওইখান থেকেই এরশাদ সাহেব আমাকে মনোনীত করেন এবং

আমি নির্বাচিত হয়ে আসি। এরপরে এরশাদ সাহেব যখন দল করেন তখন আমি তার দলে যোগদান করি, তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সাথে থাকো। যখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ করতাম উনি তখন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আমার বহু সভায় তিনি গিয়েছেন তিনি খুব ভালো বাংলা বলতেন। তিনি কাছে নিয়ে আদর ও স্নেহ করতেন আমাদেরকে, তার মমত্ববোধ দিয়ে আমাদেরকে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পরে যারা বেকার মুক্তিযাদ্ধা ছিলেন, যাদের পারিবারিক অনেক সমস্যা ছিল, তাদের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন, বিশেষ করে আমি একথা অবশ্যই বলব, ইতিহাসে একদিন লিখবে, তিনি বলেছিলেন মুকিযোদ্ধা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান, মুক্তিযোদ্ধাদের এতোটুকু সম্মান দেওয়ায় তার ডাকে আমার সাড়া দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাই আমি তার দলে যোগ দিয়েছিলাম। সংসদ সদস্য হয়েছিলাম তার দল থেকে। প্রতিমন্ত্রী ছিলাম, মন্ত্রী ছিলাম, তার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য থেকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম, এবং তার দলের মহাসচিব হিসেবে আমি ১৮ বছর দায়িত্ব পালন করেছি। আজকে আমি জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান। এই দলের উষালগ্ন থেকেই আমি দলে আছি এবং সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমি এই দল করে যাচ্ছি। দেশের মানুষের যে ভালোবাসা এবং সমর্থন আমি পেয়েছি তার জন্য আমি এই দেশের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি হয়তো অনেক কিছু দিতে পারি নাই আমার ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে, কিন্তু আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, মানুষের দোয়া পেয়েছি, মানুষের সমর্থন পেয়েছি এবং মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার যে একটা উচ্ছ্বাস সমাজ ব্যবস্থায় থাকে তাও আমি পেয়েছি আমি বুঝতে পারি যে মানুষ আমাকে ভালবাসে। আমি সেই ভাবে চলার চেষ্টা করেছি যে মুক্তিযোদ্ধা হবেন একজন সমাজের আদর্শ, সমাজের বিবেক, সেই অবস্থানে থেকেই আমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, আমি দেশের মানুষের সহযোগিতায় এবং তাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি অনেক সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি।

১৯৭১ সালে দেশের একটি ক্লান্তিলগ্নে, বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে, ২৬ শে মার্চ অর্থাৎ ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত্রে পাক-হানাদার বাহিনী আমাদের বাঙালি জাতির ঠিকানা আমাদের দেশের ক্যাপিটাল ঢাকা, সেই ঢাকার উপরে অতর্কিতভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পরলো, যেখানে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ থাকেন, বুদ্ধিজীবীরা থাকেন, ছাত্রজনতা শ্রমিক যেখানে সবথেকে বেশি বসবাস করেন এই গুরুত্বপূর্ণ

জায়গায় তারা গভীর রাতে অপারেশন সার্চলাইট নামে হত্যাযজ্ঞ চালালো, রাজারবাগের বাঙালি পুলিশদের হত্যা করল। রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হলে আক্রমন করে হত্যা যজ্ঞ চালালো, যখন যেভাবে মানুষগুলো পেয়েছে তখন তাদেরকে গণহত্যা করল নির্বিচারে।

পরেরদিন দেশের মানুষের ভিতরে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিল, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দিল, আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলনে ছিলাম, সংগ্রামে ছিলাম, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করছিলাম তাই সেই ২৫ মার্চ রাত্রে তাকেও ওরা এরেস্ট করলো। আমরা ছাত্র-জনতা যে যেখানে আশ্রয় নিতে পারি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তারপরে আমরা অনুসরণ করলাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এই কথাগুলো আমাদের হৃদয়ে গোচ্ছিত ছিল, আমরা অনেক সাহস নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম, এরপরে শুরু হল ঢাকার বাহিরে অপারেশন, আমি তখন বরিশালে, আমরা দেখলাম এপ্রিল মাসে, সম্ভবত ২৩শে এপ্রিল শুক্রবার বরিশাল আক্রমণ করল, হানাদার বাহিনী বরিশাল দখল করল, সেখানে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের সাথে গোলাগুলি হলো, আমাদের ছাত্রবন্ধুরা এবং পুলিশের লোক এরা ঘুরে দাঁড়ালো কিন্তু ওদের সশস্ত্র আক্রমণ আমাদের পিছু হাটতে বাধ্য করলো। তারপরে ২৫ এপ্রিল তারিখে তারা পটুয়াখালী দখল করল। হেলিকপ্টারে করে সেখানে সৈন্য নামালো, অনেক লোককে মেরে ফেলল এবং অফিস-আদালত দখল করল। এরপরে কিছু দিন কাটলো আমরা সবাই মিলে কিভাবে এই শত্রুর মোকাবেলা করবো এই ভেবে আমরা সজ্ঘবদ্ধ হতে থাকলাম, এবং আমাদের কাছে কিছু অস্ত্র ছিল। আমাদের আমাদের সিনিয়র যারা সহকর্মী এবং পুলিশ বাহিনী (ইপিআর) থেকে যারা চলে আসলো এবং যারা সেনাবাহিনীতে ছিল তারা গ্রামে চলে এসে গ্রামের যুবক এবং উল্লেখযোগ্য লোকদেরকে নিয়ে ২০০ লোক কে তারা একত্রিত করল এবং দশটা রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং দেয়া শুরু করল। এর মধ্যে আমাদের কলসকাঠি, বাকেরগঞ্জে বারোটা জমিদার পরিবার ছিল, সেইখানে হিন্দুদের উপর অতর্কিত আক্রমন করল, ভোর রাত্রে গানবোট নিয়ে ঘেরাও করে ফেলল, একই দিনে প্রায় তিনশো লোককে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করলো, কলস

কাঠির পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী তার পানি রক্তে লাল হয়ে গেল, এবং প্রত্যেকটা লাশ নদীতে ফেলে দিল, নদীর পাড়েই আমাদের বাড়ি, অদূরেই পায়রা নদী, রাতে আমরা গোলাগুলি শুনলাম এবং সকালে দেখলাম মৃতদেহ গুলো নদীতে ভেসে যাচ্ছে।

আমরা তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা আমাদের জীবন বাজি রেখে এই মাতৃভূমিতে রক্ষা করবো, মুক্ত করবো আমাদেও দেশ, তখন আমরা ছোটাছুটি শুরু করলাম কোথায় অস্ত্র আছে, কোথায় আমরা একত্রিত হব, এইভাবে আমাদের ইউনিয়নে, আমাদের উপজেলায়, সমস্ত জায়গায় বঙ্গবন্ধুর কথামতো গ্রামে গ্রামে সমস্ত জায়গায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে সংগঠিত হতে লাগলাম। এরপরে আমি শুনলাম আমার দুই ভাই যারা আওয়ামীলীগ করত, তাদেরকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে, তাদের ডেড বডিও পাওয়া যায়নি, সেখানে যে যাব, সে পরিবেশও নেই, এবার আমরা বাড়ি থেকে বের হলাম, বের হয়ে বাকেরগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ থেকে দবদবিয়া নামক একটি জায়গায় রাত্রিযাপন করলাম, সেখান থেকে আমরা গেলাম বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জে এসে একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, আমাদের ছাত্র যুবক ভাইয়েরা এবং সেনাবাহিনীর কিছু লোকের নেতৃত্বে থানা লুট করে দখল করে নিলাম, মজিদ খান, কুদ্দুস মোল্লা সহ আরো কয়েকজন সাহসী লোক ছিল। আমরা ওখানে রাত্রে একত্রিত হয়ে দেখলাম যে এখানে যে পরিমাণ অস্ত্র আছে, তাতে আমরা সকলে যারা ছাত্র বা যুবক আছি, তাদের হাতে অস্ত্র পৌঁছাতে দেরি হবে, আমরা এখনো ট্রেনিং নিতে পারি নাই তাই ট্রেনিং নেবার জন্য আমরা আস্তে আস্তে ভারতের পথে রওনা হলাম। উজিরপুরে পয়সারহাট নামক একটা জায়গা আছে সেখানে হয়ে আমরা মধুমতি নদী দিয়ে গোপালগঞ্জ হয়ে মাগুরা ও যশোরের মাঝে আড়পাড়া ব্রিজের নিচ দিয়ে, অনেক কষ্ট করে পার হলাম। উপরে রাজাকার ও মিলিশিয়া পুলিশ ডিউটি করে, তারা দেখামাত্র গুলি করে যুবকদের, তখন মে মাস হবে হয়তো, বৃষ্টি এসে গেছে। আমরা তখন পার হয়ে যাচ্ছি তখন গুলি হলো। আমাদের সাথের অনেক গুলো লোক মারা পরলো। তারপরও আস্থা হারাইনি, বাড়িতে ফেরার আর কোনো সুযোগ নাই। আমরা অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি। বিভিন্ন জায়গায় পাক হানাদার বাহিনী তারা পজিশন নিয়ে আছে। আমরা সামনে যাবো, মৃত্যু হলে রাস্তায় হয়ে

যাক, কিন্তু ভারতে যাব ট্রেনিং নেবো। তারপর রাএে আমরা কালীগঞ্জ থানা অতিক্রম করলাম। ওখানে বাগদা বর্ডার নাম করে একটা জায়গা আছে সেখানে ফায়ার হলো। আমাদের, ভারতের সৈনিকেরা তারাও অস্ত্র নিয়েছিলো। এবং মেজর জলিল ঐ অঞ্চলের মধ্যে পরলো। যশোরের কিছু অংশ পরেছিলো খুলনার, ওইখানে তারা মটার দিয়ে ফায়ার করলো। দুই পাশেই গোলাগুলি হচ্ছে কিন্তু আমরা নিচ দিয়ে নৌকায় পার হয়ে বাগদা বর্ডার অতিক্রম করলাম। ওখানে বনগাঁয়ে একটা জায়গা আছে, সাব ডিভিশন হয়ে, সেখানে যাওয়ার পরে সেখানে আমাদেও ইউথ রিসিভিং ক্যাম্প ভারতের, সেখানে গিয়ে আমরা রের্কড করলাম সেখানে আমাদের মন্নান সাব ছিলো, তিনি আমাদের আপনজন। তার বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি। ৭০ সনের নির্বাচনে আমরা তার ভোট করেছি।

ওইযে আমরা তার ভোট করেছি, এটা তার মনে আছে। সে তখন এমপি। সে থিয়েটা রোডে ক্যালকাটায় অবস্থান করছেন। বাংলাদেশের কিছু অফিস মুক্তিযুদ্দের জন্য ওখানে করা হয়েছিল। আমরা ওখানে গিয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করলাম। বিশেষ করে মন্নান সাবের সাথে যখন দেখা হলো, আরো অনেক কথা কিভাবে দেখা হলো, অনেক ঝুঁকি ছিলো। যাওয়ার পরেই মন্নান সাব একটা চিঠি লিখে দিলো।পলতা ক্যাম্প, ওটা হলো বনগাঁয়ে। বনগাঁ থেকে অদূরেই, আমরা সেখানেই গেলাম। ঐ চিঠি অনুসারে ঐদিন রা ট্রেনিং হলো। পথেও আমরা কিছু দুর্ঘনার সম্মুখীন হইলাম। যাইহোক বেঁচে থাকাই ছিলো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা যখন বিহার, আগে ছিল ঝাড়খান প্রদেশ, সেকানে গিয়ে পৌঁছলাম। ঐ ঝাড়খানই এখন ক্যান্টনমেন্ট। ওখানে যাওয়ার পরেই সন্ধা হলো, ওখানে ৩১ টা তোপধ্বনি দিয়ে আমাদেরকে রিসিভ করলো। ওখানে আর্মির ট্রেন ছিলো ভিন্ন, সেই ট্রেনে করে আমাদের নিয়ে গেলো। রিসিভ করলো আর্মি, তখন আমরা বুঝলাম আমাদের সম্মান জানিয়েছে এবং আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে এইভাবে। ডিফেন্সের রুলস অনুসারে আমাদের তারা সেইভাবেই নিচ্ছে। তো সাহস ও আস্থা আরো বেড়ে গেলো। আমরা তারপরে ৬ নম্বর উইংয়ে গেলোম। সেখানে আমাদের ট্রেনিং শুরু হলো, জাহাজ কিভাবে উড়াইতে হবে ফ্লোটিং মাইন দিয়ে, এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা।

ওখানে হায়ার ট্রেনিং হলো, তিন মাসের, সেই ট্রেনিং নিয়ে আমরা মেজর জলিল ছিলো বাগুন্ডিয়া ঐখানে আমরা আসলাম। আসার পরে, ওখান থেকে আমাদের

অস্ত্র দিলো,সব দিয়ে দিলো। আমরা ভিতরে ঢুকলাম, রাস্তায় আমাদের কয়েক জায়গায় শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং আমরা সেখানে সফলতার সাথে সুন্দর বন এসে পৌছলাম। সুন্দরবনে ওখানে একটা বাজুয়া বাজার ছিলো, সেই বাজারে আমরা ক্যাম্প করলাম। ওখানে বঙ্গবন্ধুর একজন আত্মীয় ছিলো, সম্পর্কে চাচা। সে-ই আমাদের ইউনিটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। বঙ্গবন্ধুর রক্তে জরিত,আমাদের একটা আস্থা আসলো। তার নাম ছিলো শেখ ফরিদ, বঙ্গবন্ধুর মতোই চেহারা ছিলো, গোফ, চুল সব কিছুই বঙ্গবন্ধুর মতো দেখতে। মনে হলো জুনিয়র বঙ্গবন্ধু, আমরা খুবই উৎসাহী। ক্যাম্পের কমান্ডার হিসেবে অফিসিয়াল দায়ীত্বে ছিলেন মিজানুর রহমান বাচ্চা তার বাড়ি নারায়নগঞ্জে ওখানে বসেই অপারেশন হলো অনেক। অপারেশন গুলো শেষ করে যখন খুব কাছাকাছি এসে গেলাম, আমরা খুলনার পথে এগোতে থাকলাম, এবং ফুল বাড়িয়াতে একটা জায়গা আছে স্বাধীনতার পরে দেখা গেছে ঐখানে গাছগুলো ঝাঝড়া হয়ে গেছে, ওদের গুলিতে। যাইহোক আমরা শহরে প্রবেশ করে গেলাম। এটা ইতিহাসের কথা, ঢাকা যখন মুক্ত হলো ১৬ ডিসেম্বর, ওরা আত্মসমর্পন করলো কিন্তু খুলনা মুক্ত হতে ১৭, ১৮ তারিখ লাগলো। তারপর দুইদিন যুদ্ধ হলো, আমাদের অনেক গুলো বাহিনী আশেপাশে যে থানা গুলি ছিলো, সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এসে ঘিরে ফেললাম খুলনাকে। আমাদের যেখানে যে রেইঞ্জ দিয়েছে, ভাগ ভাগ করে দিয়েছে। এইখানে এই ইউনিট বা রেইঞ্জ থাকবে। আমাদের সাথে মিত্র বাহিনী ও প্রবেশ করলো, ওরা যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন অনেক অস্ত্র গোলাবারুদ আমাদের আয়ত্বে আসলো। সেই অস্ত্রগুলো নিয়েও পরে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। পরে মেজর জলিল এসে পৌছলেন। আসার পরে আমরা খুলনা দখল নিলাম। আমাদের ক্যাম্পটা ছিলো পোলট্রি ক্যাম্প খালিশপুরে। সুলতান সাহেব ছিলেন ক্যাপ্টেন, আমাদের ইউনিটের চার্জে ছিলেন তিনি। ওখানে ৮০০/৯০০ শত মুক্তিযোদ্ধা ছিলো। পরে আমরা জলিল ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। আমার দুইটা ভাইকে যে মেরে ফেললো, আপন বড় চাচার ছেলে, মেঝো চাচার ছেলে। এই কারনে আমার চাচাও ওখানে হার্টফেল করেলো। ওখানে একটা কবর স্থান আছে টুটপাড়ায়, ঐ কবর স্থানে আমার চাচাকে দাফন করা হয়। আমরা শুনলাম, দেখতে পেলাম না, কারন তখন তো আমি যুদ্ধে। ভাইদের লাশও পেলাম না। কিছু লোক ধরলাম সন্দেহ করে, তারা বললো তারা বিহারি। পরে দেশ স্বাধীন

হলো, তাদেরকে মেরে ফেলাও যাচ্ছে না, জলিল ভাইয়ের কাছে গেলাম, সে বললো, আইন তোমরা নিজের হাতে তুলে নিওনা। এইভাবে আমরা একটা সময় অতিক্রম করেছি, তবে যুদ্ধ কালীন সময়ে দিন কিভাবে গেলো, রাত কিভাবে গেলো টের পেলাম না। আর মৃত্যুর কথাও ভাবতাম না, ভাবতে পারিনি। ভারতে যখন যাই, পয়সার হাটে একটা পোষ্ট অফিস দেখতে পেলাম। চিঠি লিখে গেলাম মায়ের কাছে যে, মা আমি ভালো আছি। দোয়া করবেন আমি যেনো দেশকে মুক্ত করে আবার আপনাদের কাছে আসতে পারি। এই চিঠি যুদ্ধের পরে যখন বাড়িতে আসি, তখন দেখি চিঠিটা পৌঁছেছে অনেক পরে। আমাদের স্মৃতি বেশি বেদনাদায়ক, আমার বন্ধু মারা গেলো,তাকে আমরা কাঁধে করে নিয়ে শুয়ে দিলাম।

অনেক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এতো নির্মমতা, আত্মরক্ষা করা,আমি ও হয়তো মারা যাবো এই রকম অবস্থা, বর্ষার মতো গুলি হতো, যে বাঁচছে সে-তো ভাগ্যের জোরে বাঁচছে।সম্মখ যুদ্ধ অনেক কঠিন। আর আমরা গেরিলা ছিলাম হিট এন্ড রান। অনেক সময় শত্রুর সামনা-সামনি হতে হয়েছে। কিন্তু হিট এন্ড রানটা ছিলো, আমরা একটা পজিশন নিয়ে থাকবো, আমাদেরকে শত্রু যেন আক্রমন করতে না পারে কিন্তু আমরা যেন তাদেরকে আক্রমণ করতে পারবো এবং আক্রমণ করে আমরা পালাইয়া যাবো। এটা হলো গেরিলা। একটা ব্রীজ উড়াইয়া দিতে হবে। আমরা গেলাম এক্সপ্লোসিভ দিয়ে একটা ডেটোনেটর দিয়ে ব্রীজটা উড়িয়ে দিলাম। ফলে পাক আর্মিরা ঐ এলাকায় আর ঢুকতে পারলোনা। খুলনা এলাকার কথা বলছি যে, আমাদের যশোর, খুলনা, মোংলা, বাগেরহাট এসব অঞ্চলে পাক-হানাদার বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আমাদের সহযোদ্ধা, সহকর্মীরা যারা ছিলো তারা প্রত্যেকেই ঐ ট্রেনিংও ছিলো। প্রত্যেকই এটা করার পর সংকুচিত হয়ে আসলো।

পরে আমার মনে আছে ৮ নভেম্বর অপারেশন, এই অপারেশনটা খুব ভয়াবহ হয়েছিল। খুলনা,বরিশাল এবং চিটাগাংয়ে যতো ওদের গানবোট ছিলো সব আক্রমন করা হলো। এবং বিশেষ করে নেবি, গেরিলা এবং ভারতের হাই অফিসার্স যৌথ অপারেশন ছিলো। যখন আক্রমণ হয় তখন আমরা মোংলায়। তো এই যুদ্ধটা ভয়াবহ ছিলো, কিন্তু এটা সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল জানতো না বা ওসমানী সাহেব জানতো না। এটা ভারতের রণ কৌশল আর আমাদের যোদ্ধাদের

সমন্বয় বিশেষ করে নেভির যারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার খুলনার গানবোটগুলো মোংলার ওখানে আক্রমন করে, মোংলার ওখানে আক্রমণ হলো, বিদেশি মালামাল নিয়ে এসেছে কার্গো জাহাজ, ঐখানে দেখলাম দুই পক্ষের সৈন্যের মাঝে গোলাগুলি চলছে, ভারতের সৈন্যের সাথে আর পাক আর্মি সাথে। আমরা এইপাড়ে, ওরা এপাড়ে আসলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে ফেলবো। কিন্তু এর মধ্যে আমরাই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ভারতীয় জাহাজ গুলো, বোমারু বিমান গুলো একের পর একটা আক্রমণ করলো, পাকিস্তানি কিছু ছিলো, দুই পক্ষের যুদ্ধে পাকিস্তানি পরাজিত হয়ে গেলো। আমাদের ঐখানে ও কিছু লোক আত্মঘাতী মূলক কাজ হয়েছে, মিত্রবাহিনী বুঝতে পারেনি তারা আমাদের সৈনিকের উপর গুলি করেছে। যারা নদীতে ছিলো, জাহাজ ডুবে গেলো কিছু লোক সাতাঁর কেটে উপরে উঠলো। তারপর কয়েকজনকে বন্দি করলো, টর্চার করলো স্থানীয় রাজাকাররা। যখন ভারত আক্রমন করলো, তখন পাক আর্মি বুঝতে পারলো যে, তাদের কে পরাজিত হতে হবে। আস্তে আস্তে তারা দুর্বল হয়ে আসলো এবং ক্লোজ হইতে ছিলো। আমাদের আশেপাশে যে ঘাঁটি গুলো ছিলো তারা সব ক্লোজ করে খুলনায় চলে গেলো। আমরা ও বুঝলাম তারা নাই এখন আমাদের আগাতে হবে। সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হলো নেভিরটা। খুলনা যখন আমরা দখল করলাম, তখন তারা বাঁধা দিয়েছিলো, কিন্তু তারা পারেনি। তারা কোথাও আশ্রায় পায়নি, সব বাঙালী এক হয়ে গিয়েছিল।ততোক্ষণে আমাদেও এডভান্স পার্টি খুলনায় ঢুকে গেল, যারা স্থানীয় ছিলো তারাও খুলনায় ঢুকে গেলো, আমি কভারিং পার্টিতে ছিলাম, আমাদের পিছনে আর্টিলারী ছিলো, জলিল ভাই ছিলো, এইভাবে একটা ভয়াবহ সময় কেটে গেলো। যেটা স্বাধীন হওয়ার পরেও আমরা কিছু দিন, মানে স্বাধীনতার যে বিজয়, সেই বিজয় পতাকাটাকে যে কিভাবে অনুভব করবো,সেটা আমরা পারিনি। আমরা মনে করলাম এখনও বুঝি যুদ্ধ চলছে, আমরা যুদ্ধ করবো।

১০ ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন দেশে আসলো, এর আগে মেজর জলিলের সাথে একটা ভুল বোঝাবুঝি হইলো তার সাথে আমরা ১৫ জন ছিলাম। আমরা যখন খুলনা থেকে একত্র হয়ে আসতেছি- মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই, মোসলেউদদিন, আমাদের বরিশালের মস্তফা, তারপরে আমাদের গেরিলা আলম ছিলো (বিচ্চু) আলম গৌরনদীর ছিল। আমরা আসতেছি, আমাদের ক'টা মাইক্রোবাস আর

জলিল ভাইয়ের গাড়ি। আমাদের পথ রোধ করলো, এবং আমাদের হোল্ড করালো। ওখানে গোলাগুলি হলে আমরা ও মারা যেতাম, ওরাও মারা যেতো এই রকম একটা পরিবেশ। ওরা পজিশন নিয়েছিলো রাস্তায়। এটা জেনারেল মনজুর বাহিনী, ততক্ষণে মনজু যশোরে চলে আসছে। মনজু কিন্তু জয়েন্ট করেছে নভেম্বরে উনি পালিয়ে আসলো পাকিস্তান থেকে। উনি যশোরে এই সেক্টরে অধিনায়ক হলো, এখান থেকে অর্ডার ছিলো। মেজর জলিল কিছু কিছু বিষয় অপছন্দ করেছিলো এবং উনি ন্যায়ের পথে সত্যের পথে এবং দেশ প্রেমিক একজন সেনা নায়ক হিসাবে তিনি তার চরিত্র টা, তার কথা তার কর্মকান্ডে ফুটে উঠেছিল। প্রতিপক্ষ ওনাকে ভুল বুঝলো। পরে আমরা বের করলাম যে আমাদের অপরাধ কি? তখন আমার কাছে এসেলার যখন যশোর সার্কিট হাউসে নিয়ে যায় তখনও আমার কাছে এসেলার ছিলো। তারপর আমাদের অস্ত্র নিয়ে গেলো,রিসিভ দিয়েছিলো। সবাইকে নিয়ে ডিজআর্ম করলো, পরে ওখানে বন্দি করলো। যশোরে আমরা বন্দি অবস্থায় থাকলাম ইনটারগেশন ফেস করলাম। মেজর হুদা ছিল সেখানে যে পরে খালেদ মোশারেফের সাথে ৭ নভেম্বরের কু তে মারা যায়। আমরা বন্দি অবস্থায় থাকাকালিন আমাদের খোঁজ খবর নিয়েছে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে নাই। এটা একটা পলিটিকাল সিদ্ধান্ত ছিল। আমরা সেখানে ভিকটিম হয়ে ছিলাম। দেশ স্বাধীন বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পরে তিনি আমাদের মুক্ত করে দিলেন। সম্ভবত ২ জানুয়ারী মেজর জলিলকে নিয়ে আসলো তারা ক্যান্টনমেন্টে আর আমাদের কে রেখেছিল সার্কিটহাউজে। ক্যাপ্টেন সুলতান, মোস্তফা ভাই, বিচ্চু আলম, মিজানুর রহমান বাচ্চু ভাই, আমরা বাকিরা ছিলাম সার্কিটহাউজে। আমার মনে হলো যে আমরা মুক্ত হলাম কিন্তু আমরা মায়ের কাছে যেতে পারবো কি না জানিনা, এমন একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসলো যে, দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু আমরা ভিক্টিমাইজ হলাম কেন? এর পিছনে কি আছে? পরে আমরা কারণগুলো জানতে পারলাম। যাইহোক পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে ছেড়ে দিল এবং আসার সময় আসার খরচ বাবদ কিছু টাকাও দিয়ে দিল। আমরা রকেটে বরিশাল চলে আসলাম। আর অনেকে ঢাকা গেলেন। এই ঘটনাটা ছিল দেশ স্বাধীন হবার পরেও আমাদেও জীবনের উপর এটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা। সে সময় আমারা যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছি তা আমাদের হৃদয় পটে মাঝে মাঝে স্বরণ হয়।



বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদরীস আলী

যুদ্ধে যাবার দিনগুলো:

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদরীস আলী। পেশাগত জীবনে বিসিএস শিক্ষা (কারিগরি) ক্যাডার হিসেবে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চিফ ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল ইঞ্জিঃ) ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসরগ্রহণ করেছি।

আমি আমার কথার শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ ও রক্তে রঞ্জিত লাল-সবুজ পতাকা পেয়েছি। বিশ্বের বুকে আজ আমরা বীরের জাতি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকের মতো আমিও মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

একজন শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে আমার স্নেহাস্পদ প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা কোনো যুদ্ধে গেলাম, কোথায় প্রশিক্ষণ নিলাম, কীভাবে যুদ্ধ করলাম ইত্যাদি বিষয়ে আমার কাছে শুনতে চায়। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে কিছু ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। সেই সব ঐতিহাসিক পটভূমির কিছু অংশ আমার স্নেহাস্পদ শিক্ষার্থী ও নতুন প্রজন্মের জন্য তুলে ধরছি।

ঐতিহাসিক পটভূমি:

কিশোর বয়সে প্রত্যক্ষ করেছি ৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। আর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নৌকার পক্ষে নির্বাচনী প্রচার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী চেতনায় দীক্ষিত হয়েছি। আমার চাচাতো ভাই এডভোকেট রওশন আলী এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে যশোর সদর আসন থেকে নির্বাচনের লড়াইয়ে নামেন। তার পক্ষে আমরা রাত-দিন প্রচার কাজ চালাই। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ বিজয় অর্জন করলেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিজয়ী দলের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র বাঙালি হবার কারণেই তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শুরু করলো নানা ষড়যন্ত্র।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের নাম ছিল 'জাতীয় পরিষদ'।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এ নির্বাচন বয়কট করেন। নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৮টি আসন জিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের মর্যাদা পায়। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারিত্ব দাবি করেন। এই প্রক্রিয়ায় দু'অঞ্চলে দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠনের দাবি জানান তিনি। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির আচরণে পরিষ্কার হয় যে, তারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বকারী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দিতে রাজি নন।

পূর্বনির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা:

আমাদের বাড়ি (মোমিননগর নওদাগ্রাম) থেকে কয়েকটি বাড়ি পার হলেই আমার আব্বার (মুন্সী সায়েদ আলী বিশ্বাস) বন্ধু বাকের আলী চাচার বাড়িসংলগ্ন তার মুদি দোকান। এই দোকানে ছিল একটি ৩ ব্যান্ডের ফিলিপস রেডিও।

একাত্তর সালের রাজনৈতিক টাল-মাটাল দিনগুলোতে আমাদের গ্রামের প্রায় সব

মানুষ বাকের আলী চাচার দোকানে বিবিসি'র খবর শোনার জন্য হাজির হতো। আব্বার সাথে আমিও সেখানে যেতাম আন্দোলন-সংগ্রামের খবর শোনার অদম্য আগ্রহ নিয়ে। সে সময়ে ঘরে ঘরে রেডিও ছিলনা। হাতে গোনা দু'একটি বাড়িতে বা দোকানে রেডিও ছিল। তাই খবর শোনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতো ঐ সব বাড়ি বা দোকান।

১ মার্চ '৭১ বাকের আলী চাচার দোকানের রেডিও-এর সামনে নানান বয়সি মানুষের উদ্বেল প্রতীক্ষা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আজ রেডিওতে ভাষণ দিবেন। কী নতুন কথা বলবেন তিনি? দুরুদুরু কম্পিত বুকে শংকা, সকলেই অপেক্ষারত। কিন্তু না, প্রেসিডেন্ট ভাষণ দিলেন না। তার পক্ষে বেলা ১টা ৫ মিনিটে একজন ঘোষকের কণ্ঠ থেকে বলা হলো, "জাতীয় পরিষদের বৈঠক পূর্বনির্ধারিত ৩ মার্চ বসবে না। অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হলো।"

আশাভঙ্গের বেদনায় প্রথমে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেও ক্ষণকাল পরেই বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল-শ্লোগানে প্রকম্পিত হলো রাজপথ। থেমে গেল অফিস-আদালতের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম।

মিছিলে-শ্লোগানে উত্তাল যশোর:

আমার কিশোর বয়সের টগবগে রক্ত স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হলো।

আন্দোলন-সংগ্রামে দীক্ষিত যশোরবাসী মিছিল-শ্লোগানে নেমে আসলেন রাস্তায়। আমিও বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো," "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা" ইত্যাদি শ্লোগানের সাথে কণ্ঠ মিলালাম। চারিদিক থেকে আসছে খন্ড খন্ড মিছিল। মিছিলের নগরীতে পরিণত হলো সারা শহর।

৩ মার্চ'৭১ যশোরের ঈদগাহ ময়দানে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। এ সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার পক্ষে শপথ নেয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এখান থেকে মিছিল সহকারে কালেক্টরেট ভবনে গিয়ে উড্ডীয়মান পাকিস্তানি পতাকা আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে সেখানে স্বাধীন বাংলার পত্রিকা উত্তোলন করলেন গাজী আবদুল হাই (তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা)। জজকোর্ট ভবনেও উড়িয়ে দেওয়া হল স্বাধীন বাংলার পতাকা। খবর পেয়ে তিন ট্রাক পাকিস্তানি আর্মি আসে ঈদগাহ ময়দানে। উত্তেজিত জনতা বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল ছুঁড়লে তারা সার্কিট হাউজে গিয়ে

আশ্রয় নেয়।

এরপর জঙ্গি মিছিলটি যশোর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। ইতিমধ্যে ভবনটি পাকিস্তানি আর্মিরা নিরাপত্তার জন্য ঘিরে ফেলেছে। ছাদে অস্ত্র হাতে সতর্ক পায়চারীরত কয়েকজন আর্মি। জনতার ঢল ভবনের কাছাকাছি আসতেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়লো তারা। আর্মির নিক্ষিপ্ত একটি বুলেট চাটাইয়ের বেড়ার ঘরে গৃহকর্মে ব্যস্ত চারুবালা কর-এর বুকে গিয়ে বিঁধলো। একাত্তরের অগ্নিঝরা ৩ মার্চে স্বাধীনতার জন্য যশোরে প্রথম শহীদ হলেন একজন বয়স্ক নিরীহ গৃহকর্ত্রী "চারুবালা কর"। আহত হলো যশোর জিলা স্কুলের ছাত্র কিশোর সুলতান মাহমুদ লাবলু, ওমর আলীসহ আরো অনেকে।

চারুবালা করের মৃত্যুর সাথে সাথেই যশোর শহর অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। বিকেলে পুনরায় উত্তেজিত জনতা সংগঠিত হয়ে বুলেটবিদ্ধ চারুবালা করের লাশ মিছিলের অগ্রভাবে নিয়ে শুরু হলো লক্ষ মানুষের শবযাত্রা। "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো," "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা," "আপোস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম" ইত্যাদি গগণবিদারী শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

আমি ও গোলাম মোস্তফা কেশব লাল সড়কস্থ (বর্তমান শহীদ সড়ক) খোকা ভাইয়ের সুরসাথী মাইকের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একটি বুলেট আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভরত একজনের কানের নেতি ফুটো করে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তেই রক্তে ভরে গেল তার শার্ট। অল্পের জন্য আমরা প্রাণে বেঁচে গেলাম।

অসহযোগ আন্দোলন ও মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক:

৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তাঁর নির্দেশেই সকল অফিস-আদালত পরিচালিত হতে লাগলো। অসহযোগ চলাকালেই ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসলেন। ১৬ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠক শুরু করলেন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। কিন্তু বৈঠকের নামে ইয়াহিয়া খান কালক্ষেপণের কৌশল নিলেন।

এলো ভয়াল ২৫ মার্চ। মধ্যরাতের নীরবতাকে বিদীর্ণ করে মর্টার সেলের মুহুর্মুহু বিকট শব্দে প্রকম্পিত হলো ঢাকার আকাশ বাতাস। পাকিস্তানি বাহিনী অবিরামভাবে নিক্ষেপ করতে লাগলো মর্টার সেল। সাথে রাইফেল, মেশিনগান আর স্টেনগানের বিরামহীন গুলিবর্ষণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল,

রোকেয়া হল, ইকবাল হল, পলাশীর বস্তিসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় নৃশংস হত্যাকান্ড চালালো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে চলতে থাকা আলোচনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা না করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার অনুগত বাহিনীকে বাঙালি নিধনের সামরিক কোড "অপারেশন সার্চ লাইট" প্ল্যান কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। তাকে সমর্থন করলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। এই কোডের আড়ালে ছিল ভয়ংকর নির্দেশ ঃ "বাঙালি নয়, বাংলার মাটি চাই"।

সারা দেশবাসীর সাথে যশোরবাসীও গর্জে উঠল। পরদিন থেকে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো প্রতিবাদী মানুষ নেমে আসলেন রাজপথে। চারদিকে শ্লোগান মুখরিত মিছিল। "যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুকে মোকাবেলা করবা"– বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সেই আহ্বান বাস্তবায়িত হলো। "লাঠি-শড়কি-বর্শা" হাতে সত্যিকার অর্থে যার যা আছে তাই নিয়ে মুক্তিপাগল জনতা নেমে আসলেন রাস্তায়।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ:

আমাদের বাড়ি (মোমিননগর নওদাগ্রাম) থেকে ক্যান্টনমেন্ট অতি সন্নিকটে। বসত ভিটার এলাকা সংলগ্ন যশোর কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সীমানা শেষে ঢাকা-ঝিনাইদহ-যশোর হাইওয়ে, তারপর ঢাকা-যশোর-খুলনা রেল লাইন এবং রেল লাইনের ওপারেই যশোর ক্যান্টনমেন্টের এলাকা শুরু।

উত্তাল জনতা 'যার যা আছে' তাই নিয়ে রেল লাইনের পাশে অবস্থান নিলেন। একটানা ৬ দিন (২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল ১৯৭১ ভোর পর্যন্ত) যশোর ক্যান্টনমেন্ট অবরুদ্ধ করে রাখলেন তারা। ছাত্র-জনতার সাথে অবরোধে যোগ দিলেন বাঙালি সৈনিক ইপিআর, পুলিশ আর আনসার। এ সময় অবরোধকারী সংগ্রামী মানুষের জন্য খাবার সরবরাহে এগিয়ে এলেন গ্রামবাসী। ঘরে ঘরে মহিলারা উৎসব আমেজে বীর বাঙালির জন্য খাবার তৈরি করতে বসে গেলেন।

আমার মা (ফুল কুমারী সায়েদ) চাচি-ভাবি-বোনদের নিয়ে বসে গেলেন রুটি তৈরিতে। আব্বা সেগুলো সংগ্রহ করে চলে যেতেন রেল লাইনের ধারে। নিজ হাতে ঘুরে ঘুরে মুক্তিকামী জনতার মাঝে তিনি বিতরণ করতেন সেগুলো। ডাব-কলা-পেঁপে-পানি, চিড়ে-মুড়ি-গুড় নিয়েও অনেকে আসতেন এখানে। বীর

সন্তানদের জন্য কিছু করতে পেরে গর্ব বোধ করতেন তারা।

এলো ভয়াল ৪ এপ্রিল। মধ্যরাতের নীরবতাকে বিদীর্ণ করে মর্টার সেলের মুহুর্মুহু বিকট শব্দে প্রকম্পিত হলো যশোরের আকাশ বাতাস। পাকিস্তানি বাহিনি অবিরামভাবে নিক্ষেপ করতে লাগলো মর্টার সেল। সাথে রাইফেল, মেশিনগান আর স্টেনগানের বিরামহীন গুলিবর্ষণ।

আমেরিকা আর চীনের সরবরাহকৃত অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর আকস্মিক এই আক্রমণের মুখে ৬ দিন পর ভেঙ্গে পড়লো অবরোধের প্রাচীর। বীর জনতা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। মারাত্মকভাবে আহতও হলেন অনেকে। ৪ এপ্রিল ভোরে ক্ষুব্ধ পাকিস্তানি বাহিনি ট্যাংকবহর নিয়ে রণসাজে সজ্জিত হয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে ধাবিত হলো।

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাত্রা:

ঘটনার হঠাৎ এই পরিবর্তনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো সবাই। শুরু হলো জীবনের নতুন অধ্যায়। সাধের ভিটেবাড়ি ফেলে প্রাণ আর সম্মান বাঁচাতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ালেন অনেকে। কোন কোন পরিবার ইতোমধ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে দূরবর্তী কোন গ্রামে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। আব্বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না কী করবেন।

ঘটনার ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় আব্বাও শেষমেষ সাতপুরুষের বসতভিটে ছেড়ে যেতে রাজি হলেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। শুরু হলো নীড়হারা উদ্বাস্তু শরণার্থীর জীবন।

মা পিছন ফিরে বার বার আমাদের বাড়িটির দিকে তাকিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রমে তিলতিল করে গড়ে তোলা সাধের সংসার ফেলে যাবার বেদনায় এক সময় মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মায়ের কান্না সংক্রমিত হলো আমাদের মাঝে। মায়ের সচল পা বার বার থেমে যেতে লাগলো। তবুও নিয়তিকে মেনে নিয়ে শুরু হলো পথচলা।

কাঁচা রাস্তা, লাঙলের ফলায় এবড়ো-থেবড়ো ফসলের মাঠ, কখনো জমির সরু আইল ধরে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আমরা উঠলাম ১২-১৩ মাইল দূরে অজোপাড়াগাঁ জোড়াদহ হৈবতপুরের ডা. দুদ মল্লিক মামার (আমার বড় ভাইয়ের মামা শ্বশুর) বাড়িতে। মেঝো ভাই চলে গেলেন ভাবীসহ আরেক পাড়াগাঁ সোলুয়া গ্রামে তার শ্বশুর বাড়িতে।

আমরা যেখানে আশ্রয় নিলাম, সেই ডা. দুদ মল্লিক মামাদের সাথে আমাদের অতীতে তেমন যাতায়াত ছিল না। তারপরও এই দুর্দিন ও বিপদের দিনে আমাদের পেয়ে একটা আনন্দঘন পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তুললেন তারা। তাদের দু'কক্ষ বিশিষ্ট মাটির বড় ঘরের একটি কক্ষ আমাদের জন্য ছেড়ে দিলেন। আমাদের পরে আরো অনেক পরিবার এই গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়। দেখতে দেখতে ঘরছাড়া মানুষের অভয়াশ্রমে পরিণত হলো গ্রামটি।

সহপাঠী কামরুজ্জামান টুকু তার মামাদের সাথে এই গ্রামের অন্য একটি পরিবারে আশ্রয় নেয়। আরেক সহপাঠী গোলাম মোস্তফাদের (বাকের আলী চাচার জ্যেষ্ঠপত্র) পরিবারও এই গ্রামে অন্য আরেকটি পরিবার আশ্রয় নেয়।

পড়ালেখা নেই সময় কাটেনা। মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়াই। কোথায় কোন গ্রাম পাকিস্তানি বাহিনী আগুনে জ্বালিয়ে দিলো, কোথায় কাকে ধরে নিয়ে গেল, মেরে ফেললো ইত্যাদি খবর সংগ্রহ করি। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এমনি এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে আমরা জানতে পারলাম ডা. দুদ মল্লিক মামা ভারতে যাবেন। আমাদেরকে সঙ্গে নেবার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। প্রথমে তিনি রাজি হচ্ছিলেন না, তবে আমাদের পীড়াপীড়িতে রাজি হলেন এবং একথা গোপন রাখতে বললেন।

মুক্তিযোদ্ধা হবার বাসনায় ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা:

জুলাই মাসের প্রথমার্ধে ডা. দুদ মল্লিক মামার সাথে বাবা-মাকে না নিয়ে আমি, কামরুজ্জামান টুকু ও গোলাম মোস্তফা মুক্তিযোদ্ধা হবার বাসনায় বেরিয়ে পড়লাম ভারতের উদ্দেশ্যে। আমরা জোড়াদহ হৈবতপুর থেকে যাত্রা শুরু করে সাতমাইল-ঝনঝনিয়া–সোলুয়া বাজার-আটলে হয়ে এপারের সীমান্তগ্রাম কাশিপুর পর্যন্ত ৩০-৩৫ মাইল দীর্ঘ হাঁটাপথ পাড়ি দিয়ে বিকেলে পৌঁছালাম ভারতের সীমান্ত বয়রা বাজারে। পেটে প্রচন্ড ক্ষুধা। গোলপাতার ছাউনির একটি জরাজীর্ণ মিষ্টির দোকানে বসে চিড়া-দই খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। সেখানেই একটু বিশ্রাম নিয়ে বাসে চড়ে রওনা দিলাম বনগাঁয়ের উদ্দেশ্যে।

কোথায় উঠবো তার কোন ঠিকানা ছিল না আমাদের কাছে। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বনগাঁয়ের মতিগঞ্জস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে উপস্থিত হলাম। সেখানে কোন রকমে ডা. দুদ মল্লিক মামার থাকার ব্যবস্থা হলো। স্থান অভাবে আমাদের জায়গা হলো না। আমাদেরকে একটি ছেলের সাথে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয় হলো। সে

আমাদেরকে নিয়ে এলো বনগাঁ বাজারের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর উপর নির্মিত বোট ব্রিজ সংলগ্ন একটি লাল রংয়ের বিল্ডিং-এর বারান্দায়। এখানে রাত কাটানোর কথা বলে সে চলে গেল।

কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি আমরা। এখানে কেমন করে ঘুমাবো? ক্রমে রাত গভীর হতে লাগলো। দীর্ঘপথ চলায় ক্লান্ত শরীর, চোখ ঢুলুঢুলু। কাছে থাকা শুকনো চিড়ে খেয়ে কাপড়ের পুঁটলি মাথার নিচে দিয়ে খালি মেঝের উপর শুয়ে পড়লাম। রাত গভীর হবার সাথে সাথে মশার আক্রমণ তীব্র হতে লাগলো। ফুটপাতের বস্তিবাসীর মতো প্রায় নির্ঘুম রাত কাটলো আমাদের।

সকালে এক বুক আশা নিয়ে আওয়ামী লীগ অফিসে গেলাম। 'মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবার অভিপ্রায়' ব্যক্ত করলাম। আমাদেরকে জানানো হলো এখনো নিয়মিত ট্রেনিং শুরু হয়নি, শুধুমাত্র পুলিশ-ইপিআর-আর্মি যারা সীমান্ত পার হয়ে এখানে আসছে তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হচ্ছে। আমাদেরকে দেশে ফিরে গিয়ে অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার পরামর্শ দিলেন।

মনটা ভেঙ্গে গেল। আশাহত মন নিয়ে পরের দিন আমরা দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মন ফিরে আসতে চায় না, তবুও ফিরে আসতে হলো। স্থানীয় এলাকার আওয়ামী লীগ নেতা হওয়ায় ডা. দুদ মল্লিক মামাকে দাপ্তরিত কাজের প্রয়োজনে ওখানে রেখে দিলো।

পুনরায় ভারত গমন:

মে-জুন মাসের দিকে পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের এদেশের দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও দালালদের নির্যাতনের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করলো। হত্যা, ধর্ষণ, ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া, বিহারীদের বাঙালির ঘরবাড়ি লুটপাটের ঘটনা প্রতিদিন ঘটতে লাগলো। তরুণ-যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন ও হত্যা এবং কিশোরী-তরুণীদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ করার মাত্রা বেড়ে গেল। এমনি এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে আমি, টুকু ও গোলাম মোস্তফা পুনরায় মুক্তিযোদ্ধা হবার তীব্র বাসনা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বনগাঁয়ের উদ্দেশ্যে।

এবার আমরা জোড়াদহ হৈবতপুর থেকে সাতমাইল-ঝনঝনিয়া-সোলুয়া বাজার-দশ পাকিয়া-খানপুর দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে বয়রায় উপস্থিত হলাম। এখান থেকে

বাসযোগে বনগাঁতে গেলাম। বাসে বনগাঁ যাবার পথে বাংলাদেশ থেকে আসা কয়েকজন যুবকের সাথে পরিচয় হলো। তাদের সহায়তায় আমরা বনগাঁর একটি মাদ্রাসায় রাত্রি যাপন করলাম।

সকালে আওয়ামী লীগ অফিসে গেলাম। সেখানে যশোরের ৪ নং নোয়াপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিমল রায় চৌধুরীর সাথে দেখা হলো। তিনি একাধিক্রমে ২৪ বছর এ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও যশোর জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তার কাছে মুক্তিযোদ্ধা হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাদেরকে খুবই উৎসাহ দিলেন এবং একটি চিরকুট লিখে আমাদের হাতে দিয়ে চাঁপাবাড়িয়া ক্যাম্পে যেতে বললেন। তার এই সহযোগিতা পেয়ে আমরা খুবই আনন্দচিত্তে চাঁপাবাড়িয়া ক্যাম্পে উপস্থিত হলাম। সেখানে ডা. দুদ মল্লিক মামা ও যশোর বাহাদুরপুরের আবদুল ওয়াদুদের দেখা পেলাম। তারা ক্যাম্পের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। তাদের দেখে "মুক্তিযোদ্ধা হতে পারবো, মনের ইচ্ছা পূরণ হবে"– এই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। তাদের কথামতো রিক্রুটিং লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

লাইন এগিয়ে যেতে লাগলো। যারা বেশ স্বাস্থ্যবান এবং লম্বা তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই ভর্তি করে নেয়া হচ্ছে। যারা রোগা-পাতলা ও খাটো তাদেরকে বাদ দেয়া হচ্ছে। আমি ছিলাম বেশ হালকা পাতলা এবং ওদের তুলনায় একটু খাটো। ফলে বুক দুরুদুরু করতে লাগলো। যদি আমাকে ভর্তি না করে? কিন্তু না, আমিও ভর্তির সুযোগ পেলাম! যেন বুকের ওপর থেকে দশমনি ভারি পাথর সরে গেল।

চাঁপাবাড়িয়া ক্যাম্পের দিনগুলো

চাঁপাবাড়িয়া ইয়থ ক্যাম্পের মধ্যে অবস্থিত একটি বিশাল পুকুরের পূর্ব পাড়ের একটি তাবুতে আমাদের রাতে থাকতে দেয়া হলো। শুরু হলো নতুন জীবন। তাবুর নিচে দল বেঁধে ঘুমানো। নির্দিষ্ট সময়ে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করা, ভোরে বাঁশি বাজার সাথে সাথেই উঠে মাইলের পর মাইল দৌড়ানো, অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতার শৃংখলে বন্দি এক জীবন।

এই ক্যাম্পে হাশিমপুরের তোফাজ্জেল হোসেন ও হামিদপুরের ইউনুসসহ যশোরের অনেকের দেখা পেলাম। সপ্তাহে একদিন বিকেলে ক্যাম্প থেকে বেরুবার সুযোগ পেতাম। এদিন আমরা চলে যেতাম বনগাঁ শহরে।

অনেকে কৌতূহলের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আমাদেরকে

"জয় বাংলার লোক" বলে সম্বোধন করা হতো। অনেকে বাংলাদেশের নানান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, যুদ্ধের খবরাখবর জানতে চাইতেন। পূর্ব বাংলা থেকে যারা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির সময় বা তারও পরে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতের বনগাঁতে গিয়ে সেটেল হয়েছেন, তারা আমাদেরকে যথেষ্ট স্নেহ ও সম্মান করতেন। তবে ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের অনেকে আমাদেরকে "বাঙ্গাল" বলতেন। এ সময় মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত।

সুযোগ পেলেই চলে যেতাম জাতীয় পরিষদ সদস্য এড. রওশন আলী ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে (অ্যাডভোকেট রওশন আলী, আমার চাচাতো ভাই)। ১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হবার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রওশন ভাইকে বনগাঁতে একটি বাড়ি সরকারিভাবে বরাদ্দ দিয়েছিলেন। সহযোদ্ধা টুকুর পরিবারের সাথেও মাঝেমধ্যে দেখা করতে যেতাম। তারা শরণার্থী শিবিরে না উঠে বনগাঁস্থ কাঠের ব্রিজ সংলগ্ন জ'পুরের একটি আধাপাকা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ আপা (টুকুর মেজো বোন) আমাদেরকে খুব উৎসাহ দিতেন।

চাঁপাবাড়িয়া থেকে পরে ক্যাম্প পোলতা ডাঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ জায়গাতে রক্তচোষা জোঁকের খুবই উপদ্রব ছিল। বিøচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমরা সেখানে তাবু টাঙিয়ে থাকার ব্যবস্থা করি। এখানকার জোঁকের কামড় আমাদের অনেকের শরীরে রয়েছে ।

বনগাঁয়ের মতিগঞ্জস্থ লাল দালানে ছাত্র লীগের অফিস খোলা হয়। মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার কাজে এই অফিসে আলী হোসেন মনি, রবিউল আলম, আব্দুস সালাম, এ. জেড. এম. ফিরোজ, আবদুল মান্নান, মতিয়ার রহমান, গাজী আবদুল হাই, রাজেক আহমেদ, জালাল উদ্দিন রতন, সালেহা বেগম, রওশন জাহান স্বাতি, মমতাজ বেগম, আশরাফ চৌধুরী, ইকু চৌধুরী, খয়রাত হোসেন, মিকাইল হোসেন মিন্টু, ইকবাল আনোয়ার ফারুক, সরদার লুৎফর রহমান প্রমুখ ছাত্র লীগ নেতৃবৃন্দ ব্যস্ত থাকতেন। এদের সাথে আলাপচারিতায় যুদ্ধের নানান খবরাখবর জানতে পারতাম।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষার্ধে রতন ভাই (জালাল উদ্দিন রতন যশোরের তৎকালীন ছাত্র লীগ নেতা ও একজন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। তার বাসা ছিল যশোর শহরের ঘোপে) চাঁপাবাড়িয়া

ক্যাম্পে এসে টুকু, গোলাম মোস্তফা ও আমাকে মতিগঞ্জের ছাত্র লীগ অফিসে নিয়ে আসলেন এবং আমাদেরকে বিএলএফ-এর গেরিলা কমান্ডের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে কাজ করার জন্য বললেন।

শত্রু কবলিত স্বদেশে ফিরে আসা:

আলী হোসেন মনি ভাই ও সালাম ভাই আমাদেরকে রবিউল আলম ভাইয়ের কাছে একটি চিরকুট লিখে দেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিলেন। রবিউল আলম ভাই ছিলেন বৃহত্তর যশোরের (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল) বিএলএফ-এর ডেপুটি লিডার।

আমরা তিনজন (আমি, টুকু ও গোলাম মোস্তফা) বাসযোগে বনগাঁ থেকে আসাওয়া ব্রিজ পর্যন্ত আসি। বন্যার পানির তোড়ে ব্রিজ ভেঙে যাবার কারণে নৌকায় নদী পার হয়ে ভ্যানযোগে বয়রা বাজার পর্যন্ত আসতে হলো।

বয়রার একটি ছোট্ট রেস্টুরেন্টে আমাদের আরেক বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের দেখা পাই। তার বাড়ি যশোরের আড়াতদহে। দেশের ভিতরের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কাছ থেকে অবগত হই এবং আমরা কীভাবে আমাদের টার্গেট পয়েন্টে যাবো সে ব্যাপারে তার পরামর্শ চাই। সে সীমান্তের নদী পার হয়ে খানপুর-ছুটিপুর-উজিরপুর হয়ে সোলুয়া বাজারে এসে রাস্তা পার হয়ে আড়াতদহে যাবার পরামর্শ দিলো।

আমরা তার পরামর্শ অনুযায়ী আড়াতদহে আসি এবং তাদের বাড়িতে উঠি। তার বোন মাজেদা খাতুন রাতে আমাদেরকে রান্না করে খেতে দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছু একটা করতে পারা তার কাছে ছিল ভীষণ গর্বের বিষয়। দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তার মধ্যে কোন ভয় ছিলনা, অদম্য তার সাহস।

আমরা সারারাত জেগে কাটাই। ফজরের ওয়াক্তে রওনা দিয়ে দৌলতদিহি-খোজারহাট-কনেজপুর-ডাকাতিয়া হয়ে আমাদের বাড়ি মোমিননগর নওদাগ্রামে এসে পৌঁছি।

সমগ্র গ্রাম খাখা করছে জনমানব শূন্য। পাকিস্তানি আর্মি আর রাজাকার-বিহারীরা বাড়িঘরে আগুন দিয়ে সব জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে গেছে। পোড়া বাড়িগুলো শুধু সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে প্রতিশোধ স্পৃহা আমাদের তীব্র হলো। যেভাবেই হোক পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করে বাংলাকে স্বাধীন করতে হবে মনে মনে শপথ গ্রহণ করি। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলি ‘মধুগ্রামের’ দিকে।

যশোর শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত যশোর সদর থানার বি.এল.এফ-এর ঘাঁটি মধুগ্রাম হলো আমাদের নতুন ঠিকানা। সীমান্ত থেকে পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসতে তখন কোন কষ্টই অনুভূত হয়নি, যা এখন ভাবতে গেলে অবাক লাগে।

পথে পথে ভয়-বিপদ। পাকিস্তানি বাহিনী কিংবা তাদের দোসর রাজাকার, আল-বদর কিংবা দালালদের হাতে ধরা পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত। তাই আমরা কখনো রাস্তা, কখনো পাটক্ষেত-ধানক্ষেত-বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম পিছে ফেলে এগিয়ে চলেছি। খোঁজ নিয়েছি পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান। নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই তবেই সামনের দিকে এগিয়ে গেছি।

একাত্তর সালটি ছিল অতিবর্ষার বছর। কর্দমাক্ত গ্রামীণ পথ। কাদা-পানি ভেঙ্গে, বৃষ্টিতে ভিজে কাংখিত ঠিকানায় এক সময় পৌঁছে গেলাম।

যুদ্ধের জীবন:

বি.এল.এফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট) বা মুজিব বাহিনীর বৃহত্তম যশোর অঞ্চলের উপ-প্রধান গাজী ভাই (এটি তার ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম রবিউল আলম)-এর নেতৃত্বে শুরু হলো জীবন বাজি রেখে যুদ্ধের জীবন। গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল আমরা যথাযথভাবে মেনে চলেছি ।

এই সেন্টারে আরো যারা সহযোদ্ধা ছিলেন, তাঁরা হলেন রফিকুল হক চাকলাদার (পুরাতন কসবা), নজরুল ইসলাম চাকলাদার মন্টু (পুরাতন কসবা), জালাল উদ্দিন রতন (ঘোপ), খোরশেদ আলী (মধুগ্রাম), মাহমুদা বেগম (মধুগ্রাম), অধ্যাপক আবদুল হাই (যোগী), হানিফ আলী মোল্লা (বোলপুর), আবদুল লতিফ (ইছালী), কামরুজ্জামান টুকু (রেল রোড), ইউসুফ আলী (মধুগ্রাম), শামসুর রহমান (মধুগ্রাম), ইকবাল আনোয়ার ফারুক (আর. এন. রোড), সরদার লুৎফর রহমান (ঘোপ), আকরাম হোসেন (বাহাদুরপুর), আবদুল মান্নান (মধুগ্রাম), রুহুল আমিন (মধুগ্রাম), হাসানুল করিম কামাল (ঘোপ), মিকাইল হোসেন মিন্টু (ঘোপ), মোহাম্মদ আলী স্বপন (বারান্দিপাড়া), মাস্টার আবদুল জলিল (ডাকাতিয়া), সৈয়দ আলী (মধুগ্রাম), আবদুর রহমান (মধুগ্রাম), আবু হাসান চাকলাদার মোহন (পুরাতন কসবা), শাহজাহান আলী (ঘোপ), আবুল কাশেম (যোগী), আলেক (মধুগ্রাম), আকরাম হোসেন (পাঁচ বাড়িয়া), মতিয়ার রহমান

(ঘোপ) প্রমুখ।

মধুগ্রাম, বোলপুর ও আমাদের গ্রামটি পাশাপাশি। সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে শত্রুপক্ষের তথ্য সংগ্রহের জন্য লিডার গাজী ভাই আমাদেরকে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন। আসা-যাওয়ার পথে দু'একবার আমাদের বাড়ি দেখতে গেছি। বাড়ির করুণ অবস্থা দেখে মনটা হুহু করে কেঁদে উঠলো। যে উঠোনে আমার শিশু-কিশোর বয়সের দুরন্ত সময় কেটেছে, সেই উঠোন ঘন বনজঙ্গলে ভরা। ফাঁকা বাড়ি – সবই লুট হয়ে গেছে। শিয়াল-কুকুরের অভয়ারণ্য এখন এটি। মরা মানুষের মাংস খেয়ে নাদুশনুদুশ শিয়াল আর কুকুর ঘুরে বেড়াতে দেখেছি উঠোনময়।

আমাদের পরিবারটি অক্টোবর মাসের দিকে জোড়াদহ হৈবতপুর ছেড়ে বোলপুরের মতলেব ভাইদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মাঝেমধ্যে মধুগ্রাম থেকে এসে সংগোপনে এই বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতাম। তখন পরম আদরে মা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। বলতেন, "সাবধানে থাকিস।" মা নিজ হাতে মুখে তুলে ভাত খাওয়াতেন। তার হাতে ভাত না খেয়ে কখনো আসতে দিতেন না। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের মা হিসেবে মায়ের আচরণে গর্বিত হবার লক্ষ্মণ ফুটে উঠতো। তাঁর চোখ যেন গর্ব করে বলতো, "তোমরা দেখে যাও, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত মা"

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রঃ

মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত রাখা এবং মনোবল শক্ত রাখতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্রের' অবদান বিশাল। এছাড়া রণাঙ্গনের সংবাদ, জল্লাদের দরবার, বিভিন্ন নাটক ও সংগীত আমাদেরকে ভুলিয়ে দিত স্বজনের কথা। চোখে একটি মাত্র স্বপ্ন ভেসে উঠতো সেটা হলো হানাদারমুক্ত 'স্বাধীন বাংলাদেশ'।

সে সময় যে সমস্ত গান আমাদেরকে অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগাতো তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো-

"কারার ঐ লৌহ কপাট খুলে ফেল কর রে লোপাট"
"জনতার সংগ্রাম চলবে"
"জয় বাংলা বাংলার জয়"
"বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা"

"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"
"মুজিব বাইয়া যাওরে"
"শোন একটি মুজিবের কণ্ঠ থেকে"
"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"
"বিজয় নিশান উড়ছে ঐ"
"রক্ত দিয়ে নাম"
"জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবেই"
"তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর"
"পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে"
"এক নদী রক্ত পেরিয়ে "
"এক সাগর রক্তের বিনিময়ে"
"বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ"
"নোঙ্গর তোলো তোলো"
"যশোর রোড"
"সালাম সালাম হাজার সালাম"
এমনি অনেক গান ।

আমাদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার ও খাসী মানত ঘোষণাঃ

দ্বিতীয়বার আমরা যেদিন ভারতে যাই, সেদিন খানপুর এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। এ ঘটনায় সেখানে বেশ কয়েকজন নিহত হয়। ঘটনাটি ঘটে আমরা খানপুর পার হয়ে যাবার পর। কিন্তু আমাদের পরিবারের কাছে খবর আসে খানপুরে পাকিস্তানি আর্মির গুলিতে আমরা মারা গেছি।

আমাদের পরিবারগুলোতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তবুও মহান আল্লাহর দরবারে জীবিত সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় তারা খাসী কোরবানী দেবার মানত করেন। এ ঘটনাটি আমরা দেশের অভ্যন্তরে ফিরে আসার পর জেনেছি। মৃত ঘোষিত সন্তানকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাবার যে কী আনন্দ তা ভাষায় বর্ণনাতীত। আমাদের মা-বাবাকে দেখে আমরা তা উপলব্ধি করেছি।

গোপন বার্তা নিয়ে ভারতে যাত্রা:

নভেম্বরের প্রথমার্ধে আমাদের কমান্ডার রবিউল ভাই একটি গোপন বার্তার চিরকুট লিখে আমাকে ও টুকুকে বনগাঁয়ের ছাত্রলীগ অফিসে পৌঁছে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

এবার আমাদের আরেক সহপাঠী বোলপুরের জাহাঙ্গীর হোসেন ভারতে যাবার জন্য আমাদের সঙ্গী হলো। আমরা তিন জন ডাকাতিয়া হয়ে জগহাটি গ্রামে এসে জাহাঙ্গীরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। পরদিন সকালে সোলুয়া বাজারের পাশ দিয়ে গরিবপুর হয়ে মাশলে আসি। সেখানকার কপোতাক্ষ নদ নৌকায় পার হয়ে বয়রা বাজারে উঠি। পেটে প্রচন্ড ক্ষুধা। বয়রা বাজারের একটি জরাজীর্ণ মিষ্টির দোকানে বসে ক্ষুধা নিবারণের জন্য চিড়ে-দইয়ের অর্ডার দিলাম।

একটি মজার ঘটনা:

এখানে একটি মজার ঘটনা ঘটলো। আমাদের দেশে তখনো ওজনের একক গ্রাম-কেজি চালু হয়নি। আমি 'একশ করে চিড়ে ও দই' দেবার কথা বলার একটু পরেই কিশোর বয়সী একজন হোটেলকর্মী এসে তিন জনের জন্য তিন প্লেট দই-চিড়ে দিয়ে গেল। জাহাঙ্গীর অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "একটা একটা করে একশ' চিড়ে এত তাড়াতাড়ি গুণলো কী করে রে?"

ওর প্রশ্ন শুনে আমি ও টুকু হেসে ফেললাম। দীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তিও অনেকটা কেটে গেল। আমাদের দেশে তখনও ওজনের একক ছটাক-সের।

আমরা আগে কয়েকবার ভারতে যাবার কারণে ওজনের একক 'একশ গ্রামের' বিষয়টি আমাদের জানা ছিল। জাহাঙ্গীরের জানা ছিল না বলেই অবাক হয়ে সে ঐ প্রশ্নটি করেছিল।

যাহোক, চিড়ে-দই আর চা খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে আমরা বনগাঁয়ের বাস ধরলাম। সন্ধ্যা নাগাদ বনগাঁয়ে এসে পৌঁছালাম। জাহাঙ্গীরকে পোলতাডাঙ্গা ক্যাম্পে ভর্তি করে আমি ও টুকু জ'পুরে টুকুর বাবা-মায়ের সাথে দেখা করলাম। রাতে সেখানেই থাকলাম। সকালে টুকুর মেজো বোন বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ আপা আমাদেরকে ছাত্র লীগ অফিসে নিয়ে গেলেন। গোপন বার্তার চিরকুট পৌঁছে দিয়ে আমরা টুকুদের বাসায় ফিরে এলাম। এখানে কয়েকদিন থেকে আমরা দুজন আবার দেশের অভ্যন্তরে মধুগ্রামে ফিরে এসে রবিউল আলম ভাইয়ের সাথে যুক্ত হলাম।

যশোর ক্যান্টমেন্টের পতন:

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী দুর্গ বলে খ্যাত যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটলো ৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের নবম ডিভিশনের সঙ্গে ভারতীয় নবম পদাতিক ও চতুর্থ মাউন্টেন ডিভিশনের প্রচণ্ড লড়াই হয়। বিকেলেই পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা বুঝে যায়– যশোর দুর্গ আর কোনোভাবেই রক্ষা করা সম্ভব নয়।

'প্রাচ্যের স্টালিনগ্রাড' খ্যাত যশোর সেনানিবাসের পতন হওয়ার পরই পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এ দুর্গের পতনের পর পূর্বাঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ নিয়াজির অভিমত উদ্ধৃত করে এক বার্তায় বলা হয়, 'যশোরের বিপর্যয়ের ফলে প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের পতন প্রায় আসন্ন ...। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া না গেলে জীবন রক্ষার জন্য বরং ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা বাঞ্ছনীয়।'

এদিনই বেনাপোল অঞ্চলে দায়িত্বরত লে. কর্নেল শামসকে নওয়াপাড়ার দিকে দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ব্রিগেডিয়ার হায়াত। আর নিজের ব্রিগেড নিয়ে রাতের আঁধারে খুবই গোপনে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিনি পালিয়ে যান খুলনার দিকে। ৬ ডিসেম্বর এভাবেই একাত্তরে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা হওয়ার গৌরব অর্জন করে যশোর।

৭ ডিসেম্বর ভোরে ৮ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর ও মিত্রবাহিনীর নবম ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল দলবীর সিং যশোরে প্রবেশ করেন।

প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা যশোরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভা:

আমাদের গর্বের, আমাদের অহংকারের আরেকটি দিন ১১ ডিসেম্বর। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জেলা শহর হিসেবে প্রথম পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয় যশোর। মুজিবনগর সরকারের প্রথম জনসভাটিও অনুষ্ঠিত হয় এ জেলা শহরে।

একারণেই ১১ ডিসেম্বর বাঙালির জাতীয় জীবনে অন্যতম স্মরণীয় একটি দিন। শুধু যশোর নয়, দেশবাসীর জন্যেও এ দিনটি গৌরবের।

এদিন বিকেলে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত বাংলাদেশের মাটিতে যশোর টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো "মুজিবনগর সরকারের" প্রথম জনসভা। জনসভায় ভাষণ

দিলেন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ।

উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট রওশন আলী, সোহরাব হোসেন, ফনীভূষণ মজুমদার, তবিবর রহমান সরদার, প্রাদেশিক সদস্য মোশাররফ হোসেন এলএলবি, মইনুদ্দিন মিয়াজী, চরমপত্রের লেখক ও পাঠক এম. আর আখতার মুকুল, চলচ্চিত্র পরিচালক ও স্টপ জেনোসাইড চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় খবর পাঠক সালেহ আহমদ (এটি তাঁর ছদ্মনাম)। প্রকৃত নাম সৈয়দ হাসান ইমাম। বহু চলচ্চিত্রের নায়ক ও অভিনেতা), বিএলএফ-এর ৪ নং অঞ্চলের (দক্ষিণ অঞ্চল) প্রধান তোফায়েল আহমেদ (তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা) প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ প্রতিষ্ঠা করলেন যশোরে বাংলাদেশের 'প্রথম স্বাধীন জেলা প্রশাসন'। আর যশোরে বাংলাদেশের প্রথম জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিযুক্ত হলেন মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে সড়ক পথে যশোরে প্রবেশ করেন এবং জনসভা শেষে যশোর রোড হয়ে সড়ক পথে কলকাতা ফিরে গেলেন। এই জনসভায় যোগ দিতে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য সাধারণ মানুষ এসেছিলেন। শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া কেউ কেউ এ সভায় যোগ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ ভারতের বনগাঁ থেকে সাইকেল চালিয়ে এসেছিলেন টাউন হল মাঠের জনসভায় যোগ দিতে।

মুক্ত বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম এ জনসভার খবর সংগ্রহের জন্য উপস্থিত ছিলেন লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিক পিটার গিল, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সিডনি এম এইচ সানবার্গ, বালটিমোর সান পত্রিকার প্রতিনিধি ও ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার প্রতিনিধিসহ বহু বিদেশি সাংবাদিক।

"জয় বাংলা" শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বিজয় উল্লাসে হাজার হাজার মানুষ ছুটে এলেন টাউন হল ময়দানে। মুহূর্তেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে এ ময়দানটি মুক্তিযোদ্ধা-জনতার মহামিলনমেলায় পরিণত হলো। সে এক অপরূপ দৃশ্য। বর্ণনাতীত ।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সর্বস্তরের মানুষকে স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনায় দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'আর ধ্বংস নয়, যুদ্ধ

নয়। এ মুহূর্তের কাজ হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলা'।

একই সঙ্গে তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'আপনারা আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। অপরাধী যেই হোক, তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করবেন'। তাজউদ্দিন আহমদ আরো বললেন, 'স্বাধীন দেশে ধর্ম নিয়ে আর রাজনীতি চলবে না। আর তাই জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো'।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ যশোরের জেলা প্রশাসক ওয়ালিউল ইসলাম ও কোতায়ালী থানার ওসি কাঞ্চন ঘোষালকে আইন শৃংখলা যাতে অবনতি না ঘটে তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিলেন। এ জনসভা যখন চলছিল, খুলনায় তখনও পাকিস্তানি সেনারা শেষ চেষ্টা হিসেবে যুদ্ধ করছিল। খুলনা পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয় ১৭ ডিসেম্বর।

অপারেশন খালিশপুর:

১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানি বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলেও খুলনার খালিশপুরের বিহারী অধ্যুষিত এলাকা তখনো মুক্ত হয়নি। যশোর থেকে পিছু হটা পাকিস্তানি আর্মিরা খালিশপুরে অবস্থান নিয়ে তখনো বিহারীদের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করছিল। এ খবর শোনার পর মুক্ত যশোরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহনীসহ খুলনার দিকে বীরদর্পে রওনা দিলেন।

আমি, গোলাম মোস্তফা, হানিফ মোল্লা (বোলপুর) ও আইউব আলী (যশোর কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে বাসা ছিল) আমাদের বন্ধু পুরাতন কসবার রহিমা মঞ্জিলের আলতাফ হোসেনের একটি ট্রাকে চড়ে অস্ত্র হাতে খুলনার দিকে ছুটে গেলাম। খালিশপুরের বিহারী ক্যাম্পের ভিতর থেকে মুহুর্মুহু গুলি ছুটে আসছে। আমরা তাড়াহুড়া করে ট্রাক থেকে নেমে একটি পরিখার মধ্যে অবস্থান নিলাম। এরপর চারিদিক থেকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণ শুরু হলো। কারোর প্রতি কারোর কোন কমান্ড নেই। যে যেদিক থেকে পারছে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে অগ্রসর হচ্ছে।

হঠাৎ একটি গুলি আমার বাঁ পাশের কান ঘেঁষে শা করে ছুটে গেল। একচুল এদিক ওদিক হলে আমার মাথার খুলি উড়ে যেত। গুলির বিকট শব্দে আমার বাম কান তালা লেগে গেল। ঐ কান দিয়ে তখন আর কোন শব্দই শুনতে পাচ্ছিলাম না। এখনো আমি সেই কানে কম শুনি।

আমাদের সাথে বাগেরহাট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এসে যুক্ত হলো। তারা ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে গুলি করতে লাগলো। এক সময় পরাস্ত হলো বিহারী ও পাকিস্তানি বাহিনী। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য বিহারী প্রাণ হারায়। খুলনা রেলিগেটের দিক থেকে কিছু পাকিস্তানি আর্মি সারেন্ডার করার উদ্দেশ্যে হাত উঁচু সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে থাকে। এখানে বসবাসরত ইরানীরা স্থানীয় মসজিদে আশ্রয় নেয়।

সকাল ১১টার দিকে খুলনা সার্কিট হাউজে হেলিকপ্টারে এসে নামলেন মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। খালিশপুর মুক্ত করে বিকেলে আনন্দ-উল্লাস করতে করতে আমরা যশোরে ফিরে আসি।

পথিমধ্যে আমরা শুনতে পাই ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ৯৩ হাজার পাকিস্তানি আর্মি নিয়ে নিয়াজী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। খুশীতে আমরা আতশবাজির মতো আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকি। "জয় বাংলা" শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে যশোরের দিকে অগ্রসর হই। আশপাশের সাধারণ জনগণও "জয় বাংলা" শ্লোগান ও করতালি দিয়ে আমাদেরকে অভিনন্দিত করছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন:

পাকিস্তানের লাহোর থেকে ৮০ মাইল দূরে লায়ালপুর শহরের মিয়ানওয়ালি কারাগারে দীর্ঘ ৯ মাস বন্দি থাকার পর বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভোরে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনির একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মুক্তি পাওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু প্রথমেই তাঁর স্বপ্নের 'বাংলাদেশে' আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সেটা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষে প্রতিবেশি দেশ ভারতের আকাশসীমা ব্যবহার করা। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে তৃতীয় দেশ হিসেবে ইরান অথবা তুরস্ককে বেছে নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হলে বঙ্গবন্ধু তা নাকচ করে দেন। এরপর তাঁকে লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি বেছে নিয়েছিলেন লন্ডনকে। কারণ ঐ সময় বিদেশে সবচেয়ে বেশি বাঙালির বসবাস ছিল ব্রিটেনে। ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের সাথে বঙ্গবন্ধুর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংবাদ তার ইচ্ছা অনুযায়ী পাকিস্তানি সরকার প্রকাশ করেনি। তিনি বলেছিলেন "আমি নিজেই বিশ্বকে জানাতে চাই আমার মুক্তির বার্তা।"

লন্ডনে বঙ্গবন্ধু মাত্র একদিন যাত্রা বিরতি করেছিলেন।

লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণের পর তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি টেলিফোনে কথা বলেন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও।

৮ জানুয়ারি বিকেল ৫টায় লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটস্থ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ভবনে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ। তিনি এখানে বঙ্গবন্ধুর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ একটি বৈঠকে মিলিত হন। ব্রিটেন তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে আসার প্রায় ১ মাস পর ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিটেন বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পরে ৯ জানুয়ারি ব্রিটেনের বিমান বাহিনির একটি বিশেষ বিমানে তিনি স্বদেশের পথে যাত্রা করেন। হিথ্রো বিমানবন্দরের সকল প্রথাগত প্রটোকল ভেঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ গাড়ির দরজা খুলে বঙ্গবন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিয়ে নজিরবিহীন সম্মান দেখান।

লন্ডন থেকে যাত্রা করে ১০ জানুয়ারি সকালে তিনি দিল্লির পালামা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সমগ্র মন্ত্রিসভা, তিন বাহিনির প্রধান, অন্যান্য অতিথি ও সেদেশের জনগণ।

১০ জানুয়ারি দিল্লি থেকে যাত্রা করে দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মাটিতে পা রাখেন বঙ্গবন্ধু। আনন্দে আত্মহারা লক্ষ লক্ষ বাঙালি তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাকে স্বতস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানান। বিকেল ৫টায় রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে তিনি ভাষণ দেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দান করে; দেশ ফিরে পায় তার প্রিয় নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে।

বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র সমর্পণ:

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ। ব্রিজ কালভার্ট সব যুদ্ধের সময় উড়িয়ে দিয়েছে শত্রু বাহিনী। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। প্রায় সবারই হাতে অস্ত্র। এই সুযোগে রাজাকার, আল-বদর আর চোর-ডাকাতেরা গুপ্ত হত্যা ও ডাকাতি শুরু করলো। আর বদনাম রটাতে লাগলো মুক্তিযোদ্ধাদের নামে ।

এই অবস্থা থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দেবার আহ্বান জানালেন। তারিখ নির্ধারিত হলো ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল।

বঙ্গবন্ধুর এই আহবান মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া ফেললো। উৎসব-আনন্দে সারাদেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার দিকে রওনা হলো। আমরাও যশোর থেকে অনেকগুলো বাস-ট্রাক নিয়ে বিজয়ানন্দে রাইফেল, স্টেনগান আর মেশিনগানের ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঢাকা গেলাম। ঢাকা স্টেডিয়ামে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম) নির্মিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম গ্রহণ করছেন। আর মুক্তিযোদ্ধারা জেলা ও বাহিনীভিত্তিক লাইন ধরে বঙ্গবন্ধুর সম্মুখে অস্ত্র জমা দিচ্ছেন। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে অস্ত্র গ্রহণ করলেন। আমিও আমার অস্ত্র জমা দিলাম।

অস্ত্র সমার্পণ পর্ব শেষে সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু আবেগে আপ্লুত হয়ে হৃদয়গ্রাহী একটি ভাষণ প্রদান করলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, '.... তোমাদের ধন্যবাদের চেয়ে অনেক বেশি পাওনা। যেটা দেবার ক্ষমতা আমার নাই। আমার আছে প্রাণভরা ভালোবাসা। আমি তোমাদের সেই প্রাণভরা ভালোবাসা দিলাম। তোমাদের এই বাহিনীর ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাস অনেকেই জানে না। সেই ইতিহাস একদিন লেখা হবে, সেই দিন তোমরা জানতে পারবা। গণবাহিনী, মুজিব বাহিনী, যে সমস্ত বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে, যে সমস্ত বীর বাঙালি শহীদ হয়েছে, আত্ম-উৎসর্গ করেছে, সকলকে আমার অন্তরের ভালোবাসা জানাই....'।

আরো অনেক কথাই বললেন বঙ্গবন্ধু। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম।

ফিরে এলাম প্রিয় জন্মভূমি যশোরে:

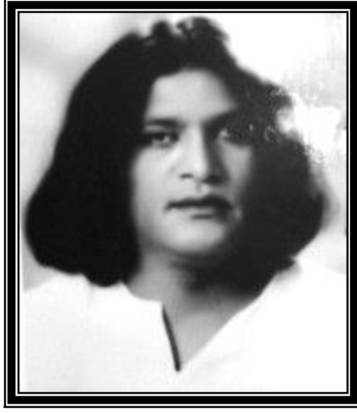
অস্ত্র সমর্পণ শেষে আমাদেরকে আউটার স্টেডিয়ামে (বর্তমান মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম) জেলাভিত্তিক লাইনে দাঁড়াতে বলা হলো। আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের বিএলএফ প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী হোসেন মনি ভাইসহ আরো কয়েকজন ছুটাছুটি করে লাইন ঠিক করছেন। আমাদেরকে কেনো এখানে দাঁড় করানো হয়েছে জানিনা। মনি ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম "এখানে আমাদের কেন দাঁড় করানো হয়েছে"? মনি ভাই বললেন, "রক্ষী বাহিনীতে চাকরি দেয়া হবে। যারা চাকরি করতে চায় তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য

এই লাইন"।

চাকরি হবে - এই আনন্দে মন পুলকিত হলো। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলাম, তাহলে লেখাপড়ার কী হবে? এখন চাকরিতে ঢুকলে বড়জোর সিপাই হতে পারবো- অফিসার তো হতে পারব না।

বিষয়টি আমার কমান্ডার বিএলএফ-এর উপ-প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল আলম ভাইকে বললাম। তিনি আগে লেখাপড়া শেষ করার পরামর্শ দিলেন। কথাটি মনোপুত হলো। কাল বিলম্ব না করে লাইন থেকে চুপিসারে বেরিয়ে আমি আর টুকু সোজা চলে গেলাম সদরঘাট।

পকেটে তখন ভারতীয় পাঁচ'শ রুপি। অস্ত্র জমা দেবার পর প্রতিজন মুক্তিযোদ্ধাকে এই টাকা দেয়া হয়। বাংলাদেশের মুদ্রা তখনো চালু হয়নি। এই টাকার বলে বলিয়ান হয়ে চেপে বসলাম স্টিমারে। ঢাকা থেকে নৌপথে নদীর অপরূপ রূপ আর সুন্দরবনের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে খুলনা পৌছালাম এবং খুলনা থেকে সড়ক পথে ফিরে এলাম মুক্ত স্বাধীন প্রিয় জন্মস্থান যশোরের মোমিননগর নওদাগ্রামে।



যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শব্দ সৈনিক মফিজ আঙ্গুর

মফিজ আঙ্গুর জন্মে ছিল একটি ধর্মপরায়ন মুসলিম পরিবারে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার, বাসুদেবপুর এর লস্করহাটি গ্রামে। বাবা মৌলভী মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ এবং মাতা জামিলা আহম্মেদ। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। বাবা তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার জর্জের জুড়ি এবং কংগ্রেস পার্টির সক্রিয় সদস্য। মাতা রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার বাসুদেবপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। পিতা মৌলভী মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ এর বসতবাড়ী ছিল অবিভক্ত বাংলার ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর গ্রামে। তিনি বাংলায় এসে ছিলেন আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে। তার এখানে থাকার কোন বাড়ী ছিল না, বিধায় তিনি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার, বাসুদেবপুর গ্রামের প্রতাপশালী ব্যক্তি মৌলভী আবদুল হামীদ এর বাড়ীতে লজিং মাষ্টার হিসাবে বসবাস করতে থাকেন।

তিনি নিজে লেখাপড়া করতেন এবং হামীদ সাহেবের ছোট ছোট ছেলেদের পড়াতেন। এভাবে বেশ কয় বছর কেটে যায়। একদিন মফিজ উদ্দীন মাদ্রাসা থেকে বাড়ী আসছিলেন, বাড়ীর ভিতর ঢুকতে যাবেন এমন সময় তার চোখ গেল পানির কুয়াতলায়। তিনি দেখলেন একটি মেয়ে কুয়া তলায় পানি তুলছে, তিনি তার মুখ দেখতে পেলেন না তার পিছনটি দেখলেন। মেয়েটির পিছন দেখেই

তিনি মেয়েটিকে পছন্দ করতে লাগলেন। এরপর হতে তার লেখাপড়ায় তেমন আর মন বসতে চায় না। এভাবে দিন যেতে লাগলো। লেখাপড়ায় মন না থাকায় হামীদ সাহেব একদিন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মফিজ উদ্দীন তাকে সব খুলে বললেন, হামীদ সাহেব ছিলেন অনেক ভাল এবং বুদ্ধিমান । এই প্রস্তাব শুনে তিনি ভেবে দেখলেন এই প্রস্তাব মেনে নিলে তার মেয়ে ভালই থাকবে। মফিজ উদ্দীনকে তার ভালই লাগে ভাল ছেলে। অত্যন্ত ভদ্র, স্পষ্টবাদী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। হামীদ সাহেব ভাল একটি দিন দেখে মফিজ উদ্দীন এবং হামীদ সাহেবের মেজো মেয়ে জামিলার বিবাহ দিয়ে দেন। বিয়ের পর মেয়ে জামাইকে হামীদ সাহেব নিজের কাছেই রাখতে চাইলেন। কিন্তু মফিজ উদ্দীন ঘরজামাই থাকতে চাইলেন না। গ্রাম হতে একটু দূরে পাশবর্তী গ্রাম লস্করহাটিতে বাড়ী করলেন।

মফিজ সাহেব আরবি পড়িয়ে যা পেতেন তাই দিয়ে তার সংসার চলতে লাগলো। এর মধ্যে তাদের ঘরে একে একে এক মেয়ে ও দুই ছেলের জন্ম হয়। বড় মেয়ে মোসাম্মদ তাহমিনা বেগম, বড় ছেলে মোঃ আব্দুল মান্নান এবং মেজো ছেলে মোঃ নজরুল হান্নান রেন্টু। এর মধ্যে মফিজ উদ্দীন লস্করহাটির একজন নাম করা মৌলভী হয়ে উঠেছেন। সংসারের স্বচ্ছলতা আনার জন্য মৌলভী সাহেব গোদাগাড়ী হাটের ইজারাদারের ব্যবসা শুরু করেন। কয়েক বছর তার সংসার ও জীবন আনন্দেই কেটে যায়। এরপর তিনি বুঝতে পারেন তার মুখের সাথে সাথে দুঃখরা ও পালা দিয়ে আসছে। কারণ গোদাগাড়ীর স্থানীয়রা মৌলভী সাহেবের পান্ডিত্য ও সততার ব্যবসায়ী মনোভাব মেনে নিতে পারছিল না। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করে আসছিলেন দীর্ঘ দিন থেকে। এই সুযোগটাই মৌলভী সাহেবের বিরোধীরা কাজে লাগায়। বিট্রিশ সরকারকে মৌলভী সাহেবের ঠিকানা দিয়ে দেয়। মৌলভী সাহেব বাড়িতে থাকতে পারছিলেন না। এদিকে মৌলভী সাহেবের স্ত্রী সন্তান সম্ভাবা। তিনি রাতে সন্তান সম্ভাবা স্ত্রীকে দেখে যেতেন। স্ত্রীর পেটে হাত রেখে তিনি বলতেন, “এ সন্তানকে আল্লাহ্ রক্ষা করবেন”। এ সময় মৌলভী সাহেবের সংসারে অর্থ কষ্ট শুরু হয়। তিন সন্তান নিয়ে তাঁর স্ত্রী অভাব অনটনের মধ্যে দিন যাপন শুরু করেন। তবু তাঁর স্ত্রী মৌলভী সাহেবের ওশ্বর বাড়ি যেতে চাননি বা কেনো রকম সাহায্যের আশা করেননি বা গ্রহণ করেননি।

এটা মৌলভী সাহেবের ও তাঁর স্ত্রীর বলিষ্ট আত্মসম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যদিও মৌলভী সাহেবের স্ত্রীর বাবা ও মার কাছে, অনেক সহায় সম্পত্তি ছিল। মৌলভী সাহেবের শ্বশুর খোরাসান যুদ্ধে তাঁর ৫০ বিঘা জমি মুসলমানদের উন্নয়নে দান করে দেন। এমনই শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন মফিজ আঙ্গুরের মাতা। এ কারণেই তিনি কখনোই পিতা- মাতার সম্পত্তি গ্রহণ করেননি। এর মধ্যে তাকে একরাতে ব্রিটিশ সৈনিকরা এসে ধরে নিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন কারাবাস করে, তিনি মুক্তি পান। কারাবাস থাকাকালীন মৌলভী সাহেবের সাথে কারাবাসরত স্বদেশী উদ্ধর্তন কর্মকর্তাদের একটা সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কারাবাস থেকে এসে তার চলাফেরা সমাজের আরোও সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে শুরু হয়। যা কোনো ভাবেই মৌলভী সাহেবের বিরোধীরা মেনে নিতে পারছিলো না। নানাভাবে তারা চাইছিলো মৌলভী সাহেবের ক্ষতি করতে। এর মধ্যে মৌলভী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র পৃথিবীতে এসেছে। মৌলভী সাহেবের সংসারের আবার সুখ ফিরে আসে। তাঁর নাম রাখা হয় মোঃ রফিকুল আলম। আর তাঁর নানাভাই আদর করে রাখেন আঙ্গুর। যেহেতু তিনি দেখতে এতেই ফর্সা এবং সুন্দর হয়েছেন যেন আঙ্গুর ফলের মতো সবুজ বর্ণের বিচ্ছুরণ লেগে থাকে সারাক্ষণ তাঁর মুখে। সবার আদরের মাঝেই কিছুদিন পার হয়ে যায়। শিশু মফিজ আঙ্গুরকে তাঁর মা একদিন এক গামলা পানি দিয়ে বসিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন একটা রাজগোখরা সাপ গামলার পানিতে মফিজ আঙ্গুরের সাথে খেলা করছে। উল্লেখ্য সেই সময় লস্করহাটি গ্রামটি ছিল বেশ গাছ গাছালিতে পূর্ণ। মফিজ আঙ্গুরের পিতা বাড়িতে আসলে সবকথা শুনে বলেন, আমার এ ছেলে দেশ ও দশের উন্নয়নে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে একদিন। তার কিছু দিন পরেই মফিজ আঙ্গুরের পিতার অকাল মৃত্যু হয়। শিশু মফিজ আঙ্গুর সহ চার সন্তান নিয়ে বহু কষ্টে তার মা তাদের পিতার আদর্শে মানুষ করার প্রতায় গ্রহণ করেন। তিনি সেই শিশু বয়সেই যেন মার সকল কষ্ট বুঝতে পারতেন। মাকে কখনোই বিরক্ত করতেন না। এর মধ্যে বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায় পাশের গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী এক পরিবারে। বোনের আদরের ভাইকে নিজের কাছে নিয়ে রাখতে চাইলে তিনি মাকে ছাড়া যাবে না বলে দেন। এর মধ্যে বড় ভাই ও কিছুটা উপার্জন সক্ষম হয়ে উঠে এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক বিত্তশালী পরিবারে লজিং মাস্টার হিসাবে থেকে পড়াশুনা করতে থাকেন। বাড়িতে যা, মেজো ভাই আর

মফিজ আঙ্গুর। মার জন্য ঘর ঝাড়ু দেওয়া, রান্নার কাজে সাহায্য করা সব আঙ্গুর মার সাথে সাথে থেকে করতেন।

শিশু বয়সে মার হাতেই তাঁর লেখাপড়ার শুরু হয়। খুব সহজেই তিনি বর্ণ পরিচয় শিখে নেন। পরে বাসুদেবপুর প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হন। তিনি তাঁর সকল মামাতো, খালাতো ভাইবোনদের নিয়ে স্কুলে যান। কারণ স্কুলটা ছিল তাঁর নানা বাড়ির দিকে। ছোট বোনদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বর্ষা বাদলের দিনে ছোট বোনদের নিজের কাঁধে করে স্কুলে নিয়ে যেতেন ও নিয়ে আসতেন। যাতে বোনদের গায়ে কাঁনা না লেগে যায়। এই ভাবে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাস করেন। হঠাৎ করে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং দুই পায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর মা ভাবলেন তাঁকে মাদ্রাসায় পড়াবেন। তিনি কয়েক মাস পড়ে দেখেন, মাদ্রাসার ছেলেদের গ্রামের বাড়ি বাড়ি চাঁদা তোলার জন্য প্রায় হুজুরেরা পাঠাচ্ছেন। রোদে পুড়ে, বর্ষার পানিতে ভিজে শিক্ষার্থীরা প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবুও অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেন হুজুরেরা। প্রায় বিনা কারণেই বেত দিয়ে অমানুষের মত মারধর করেন। খাবার দেন না ঠিকমত। অভিভাবকদের বললে তারা মনে করেন মাদ্রাসায় না পড়ার জন্য ছেলেরা এমন কথা বলে, শয়তান চায় না তাদের ছেলেরা আলেম হোক। কিছুতেই বিশ্বাস করেন না।

একদিন মফিজ আঙ্গুরকেও চাঁদা তোলতে পাঠাতে চান মাদ্রাসার হুজুররা, তিনি প্রতিবাদ করেন। বলেন, "আমি কুরআন শিখতে এসেছি ভিক্ষা করতে না।" সমাজের কিছু মানুষ তাকে অকেজো বোঝা মনে করতো। "আমি কোন চাঁদা তুলতে যাবো না। আর আমার পরিবার কখনোই শিখাইনি না খেয়ে থাকলে ও অন্যের কাছ থেকে চেয়ে খেতে হবে। মহান আল্লাহতালা হাত-পা দিয়েছেন কাজ করে উপার্জন করবো, কাজ করে খাবো তবু চাঁদা তুলতে যাবো না।" তিনি স্বাভাবিকভাবে দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে না পারলেও হামাগুরি দিয়ে হাঁটতেন এবং আট-দশটা বাচ্চার থেকে বেশি। পরিশ্রম করতে পারতেন। এই কথা শুনে মাদ্রাসার হুজুররা রেগে যান, এবং তাঁকে মারতে উঠেন। তিনি বলেন, "আমার পায়ে হাত দিবেন না। আমাকে কেউ কখনো মারেন নি আর আমি এমন কোন কাজ করি না যাতে অভিভাবকগণের কষ্টের কারণ হয়।" মফিজ আঙ্গুরের তীব্র

প্রতিবারের মুখে হুজুররা আর কিছু বলতে পারে না। আর তিনি মাদ্রাসায় পড়বেন না বলে বাড়ি চলে আসেন। তারপর মাধ্যমিকে ভর্তি হন প্রেমতলী সুখ বাসিয়া বহুমুখী (কৃষি) উচ্চ বিদ্যালয়। সেখানেও কেউ কেউ তাকে নিয়ে তীব্র ঠাট্টা, বিদ্রুপ করতে থাকে। ন্যাংড়া-খোঁড়া তুই লেখাপড়া করে কি করবি? তোকে তো ভিক্ষা করে। খেতে হবে। তিনি তীব্র প্রতিবাদ করতেন। তিনি বলতেন, "আমি কখনোই ভিক্ষা করে খাব না।" তিনি মাকে কিছুই। বলতেন না, তবুও তার মা বুঝতে পেরে বড় ভাইকে বলেন তখন বড়ভাই তাঁর কাছে রেখে কাজ শিখাতে চান এবং নিয়ে। যান। বড়ভাই ততদিনে কোর্টে কাজ করতে শুরু করেছেন। মফিজ আঙ্গুরকে দলিল লিখতে দেওয়া হয়। দলিল কয়দিন। লিখে দেখেন একজনার জমি আরেকজন লিখে নিচ্ছে। তিনি বড়ভাইকে বলেন বিষয়টা, বড়ভাই বলেন, পৃথিবীতে এমনই হয় "জোর যার মুলুক তার।" তিনি বলেন, "আমি জেনে শুনে এমন কাজ করতে পারবো না।" এর মধ্যে তার মনের মধ্যে আব্বাস উদ্দীনের দরদী কন্ঠের সুর বাসা বাধতে শুরু করেছে। শৈশবে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান শুনে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত হন। পারিবারিকভাবে সকলে ছিলেন রক্ষণশীল। তবুও চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রখ্যাত ওস্তাদ মংলা মাষ্টারের কাছে এক বছর সংগীতের তালিম নেন। কিন্তু তিনি শুধু সারগাম শিখাচ্ছেন দেখে, তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। এরপর পাবনার উল্লাপাড়ায় এসে গৌরী শংকর বাবুর কাছে তালিম নেন। তারপর বানেশ্বর স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তি হন ও গান চর্চা করতে থাকেন। এসময় তিনি ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং রাজনৈতিক কারণে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যে একজন গান শিখানোর কথা বলে বরিশালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তার পছন্দমতো শিক্ষক না পেয়ে চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকায় তখন তাঁর থাকার কোন স্থান না থাকায় এতিমখানায় থাকতে শুরু করেন এবং আব্বাস উদ্দিনের খোঁজ করতে থাকেন। আব্বাস উদ্দীনের গাওয়া...

"ফাঁন্দে পড়িয়া বকা কান্দেরে।" গানটিই মূলত তাঁকে গানের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। আব্বাস উদ্দীনের বাসায় গিয়ে দেখেন তিনি বাসায় নাই। মফিজ আঙ্গুরের সকল কথা শুনে মোস্তফা জামান আব্বাসী ও ফেরদৌসী রহমান তাঁকে বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ভর্তি করে দেন। এবং ওস্তাদ মুন্সী রইস উদ্দীনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। মোস্তফা জামান আব্বাসী নিজের গাড়ি করে তাঁকে

বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে নিয়ে যেতেন। ওস্তাদ মুনসী রইস উদ্দিনের তত্ত্বাবধায়নে বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ৬ বছর সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন। তালিমকালে তিনি ওস্তাদ গুলমোহাম্মদ খাঁ, ওস্তাদ বেদার উদ্দিন আহমেদ, কানাই লাল শীল, ওস্তাদ মোহাম্মদ খসরু, কুটি মনসুর, আব্দুল আলীম, মোস্তফা জামান আব্বাসী, ফেরদৌসী রহমান প্রমুখ সংগীতজ্ঞাদের সানিধ্যে আসেন। শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী তাকে ঢাকার ওরিয়েন্টাল হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। এখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করেন। এর মধ্যে মাস্তান শাহ্-এর সাথে তাঁর দেখা হয় এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারার মধ্যে তিনি প্রবেশ করতে থাকেন। এ সময় তিনি বিখ্যাত লোক গায়ক রজ্জব দেওয়ানের বাড়িতে গৃহ শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। কিন্তু পড়াশুনা আর এগোয়নি। তিনি জগন্নাঘ বড়ুয়ার সহযোগিতায় ব্লাইন্ড ফেডারেশন সংগীত বিদ্যালয়ে সহকারী সংগীত প্রযোজক হিসাবে চাকুরীতে যোগ দেন। বুলবুল ললিতকলায় পাশ করে। যখন প্রথম রংপুর বেতার কেন্দ্র শুরু হয় তখন রংপুর বেতারের একজন নিয়মিত শিল্পী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। রংপুর কেন্দ্রে ৬ বছর সংগীত পরিবেশন করেন। রংপুর বেতারে মফিজ আঙ্গুরের গান শুনে তাঁর বড় ভাই তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং রাজশাহী বেতারে যোগদান করান। ১৯৮৯ সালের আগ পর্যন্ত তিনি রাজশাহী বেতারের নিয়মিত পল্লীগীতির শিল্পী এবং যন্ত্র শিল্পী ছিলেন। রাজশাহী বেতারে তিনি অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন, যা আজও পর্যন্ত রেকর্ডে রাজশাহী বেতার হতে প্রচারিত হয়। যেমন-

"গুণ গুণাগুণ গান গাহিয়া কি বলে যাও"
"জলে ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না"
"সাইলো সই বন্ধু বুঝি, আর এলো না"
"সখি আর কয় না নিষ্ঠুর বন্ধুর কথা"
"আমি আর কি দেখা, বন্ধুর পাবো না"
"কাপড় বুনায় কারিগর, কৌশলে লুকাইছে দেখ তার ভিতর"
"তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে"

প্রতি মধ্যে মস্তান শাহ্ বাংলাদেশ হতে ভারতে চলে যাবার ইচ্ছাপোষণ করেন। তখন মফিজ আঙ্গুরকে রাজশাহী জেলার বাঘার চকছাতারীতে বসবাসকারী

বাংলার শেষ ওলী শাহ্ সুফী হযরত খাজা খোরশেদ আলী চিশতী আল-নেজামী (রঃ) কাছে বায়াত গ্রহণ বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বলেন। এরপর দেশের পরিস্থিতি উত্তাল হতে থাকে। মফিজ আঙ্গুর যেহেতু ছাত্র অবস্থায় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন তাই অনেকেই তাঁকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দেন। এর মধ্যে তাঁর সুভাকাঙ্গী ছিলেন রাজশাহী বেতারের আমজাদ হোসেন বড় অফিসার, কাজী আব্দুর রহমান (অফিসার), এটিএম শিকদার এ.আর.ডি, শিল্পী রফিকুল আলম প্রমুখ। কিন্তু তিনি অফিস করে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। ৭ই মার্চের ভাষণের পর দেশের অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। ২৫শে মার্চ ভয়াল রাত্রিতে দেশের ঘুমন্ত জন সাধারণের উপর, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনাসহ বিভিন্ন এলাকায় একযোগে হামলা চালিয়ে অসংখ্য বাঙ্গালিকে হত্যা করেছিল। পাক হানাদার বাহিনী। বর্বরতার সেই রাত্রির পরে রাজশাহী বেতারে ও পাক হানাদার বাহিনী আক্রমণ চালায়। এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড করে শিল্পী কলা- কুশলীকে হত্যা ও আহত করে। মফিজ আঙ্গুর ও কয়েকজন পানির ড্রেনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সেই যাত্রায় বেঁচে যান। রাজশাহী বেতার হতেই তাঁকে সবাই ট্রেনে তুলে দেয়। ট্রেনে করে তিনি। আড়ানীতে আসেন।

আড়ানীর ডাকরা গ্রামের জহুরুলদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। জহুরুলের বাবা আঙ্গুরের বড় ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন। কিছুদিন থাকার পর পাক হানাদার বাহিনী জানতে পেরে যায়, মফিজ আঙ্গুর ডাকরা গ্রামে আছেন। এরপর পাক হানাদার বাহিনী। এক নৃশংস হত্যাকান্ড শুরু করে গ্রামে। গ্রামটিতে আগুন লাগিয়ে সাধারণ লোকজনকে হত্যা করা শুরু করে, তখন জহুরুলের বাবা মফিজ আঙ্গুরকে বাড়ির মাটির গর্ত করা কাঁচা সেপটি ট্যাংকের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। সেপটি ট্যাংকের পোকা মফিজ আঙ্গুরকে ঢেকে ফেলে, যার ফলে পাক বাহিনী তাকে খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। দীর্ঘ সময় সেপটি ট্যাংকে লুকিয়ে থাকার পর তাঁকে তোলা হয় এবং গ্রামের স্বাধীনতা পক্ষে সবাই বলেন, মফিজ আঙ্গুরকে এইভাবে ডাকরা গ্রামে। লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাই জহুরুলের বাবা একজনকে ঠিক করেন। তিনি সাইকেলে করে ভারতে রেখে আসবেন। ভারতে যাবার পথে মফিজ আঙ্গুরকে পাক বাহিনী ধরে ফেলে। কিন্তু পাক বাহিনী মফিজ আঙ্গুরকে নামে চিনতো, তাঁর চেহারা দেখেনি। বিধায় সাইকেল আরোহীকে মফিজ আঙ্গুর

ভেবে পাক ক্যাম্পের নিম গাছের ডালে উল্টো করে টাঙ্গিয়ে ফেলে এবং যেভাবে খাসি ছিলা হয় সেইভাবে ছিলতে থাকে আর তাঁর সহযোদ্ধাদের নাম জানতে চায়। এই নিযার্তনের মধ্যেই পাক ক্যাম্পে পাশের গ্রাম হতে কিছু মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে আসে। যারা নির্যাতন চালাচ্ছিল তারাও সেই মেয়েদের দেখতে চলে যায়। এই সময় সেই বীর সাইকেল চালক মফিজ আঙ্গুরকে বলেন, “এই সুযোগ, আপনি পালিয়ে যান। আমি তো আর বাঁচবো না, আপনি বেঁচে দেশকে স্বাধীন করেন।” তখন মফিজ আঙ্গুর পাশের খালের মধ্যে গড়িয়ে পড়েন এবং সাঁতার কেটে নদীতে চলে যান। পাক বাহিনী বুঝতে পেরে স্পিরিট বোর্ড চালিয়ে নদীতে খুঁজতে শুরু করে। মফিজ আঙ্গুর ভেসে আসা কুচরিপানা মাথায় দিয়ে কোন রকমে নদীতে ভেসে থাকেন এবং স্রোতে তিনি পাক ক্যাম্প থেকে গভীর নদীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এইভাবে নদীতে প্রায় দুই দিন তিনি ভাসতে থাকেন। হঠাৎ করে একটা ছোট নৌকা দেখতে পান। মাঝিকে বলেন, “মাঝি ভাই আমাকে বাঁচান, গত দুইদিন ধরে আমি পানিতে ভাসছি।” এ কথা শুনে মাঝি তাঁকে তাড়াতাড়ি নদী থেকে তুলে তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং খাবার ও শুকনো কাপড় দেন। মাঝির বাড়িতে একটু বিশ্রাম নিয়ে মাঝিকে বলেন, মাঝি ভাই যেভাবে পারেন আমাকে ভারত বর্ডারে রেখে আসেন। মাঝির সহযোগিতায় মফিজ আঙ্গুর ভারতে প্রবেশ করেন এবং খুঁজতে খুঁজতে তিনি ভারতের বিহার, চাকুলিয়া মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পৌঁছান। সেখানেই তিনি ২৮ দিনের যুদ্ধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রাজশাহীর বর্ডার পার হয়ে খন্ড খন্ড যুদ্ধ করতেন। আবার বর্ডার পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করতেন। এইভাবে তিনি সসস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন ৭ সেক্টরের ৪নং সাব সেক্টরে। এর মধ্যে তিনি সন্ধান পান ভারতের মুর্শিদাবাদের লালগোলা সেকালিপুর স্কুলে গেরিলা ক্যাম্প এবং সেখানে যোগদান করেন। লালগোলা গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে বেশিভাগই প্রশিক্ষণার্থীরা ছিলেন। রাজশাহী পুলিশ বাহিনীর সদস্য। তার মধ্যে আব্দুর সাত্তার (হাবিলদার), নরু, কাশেম, মোহর, সারোয়ার রুহুল আমিন, তবিরুল প্রমুখ মফিজ আঙ্গুরের কাছের বন্ধু হয়ে উঠেন। ট্রেনিং শেষে ক্যাম্পে ফিরে তাদের গান শুনাতেন। নিয়মিত। গান শুনে সকলেই উৎসাহী, অনুপ্রানিত হতেন।

একদিন লালগোলা ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রদর্শনে আসেন মেজর গিয়াস। প্রদর্শন শেষে

বলেন, "এখানে গান করে কে?" সবাই তখন মফিজ আঙ্গুর এর নাম বলেন। মেজর গিয়াস গান শুনতে চাইলে তিনি তাঁকে কয়েকটি গান গেয়ে শুনান। তখন মেজর গিয়াস বলেন, "তুমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কেন যাচ্ছো না?" তাঁর উত্তরে মফিজ আঙ্গুর বলেন, "আমার শরীরে যতক্ষণ শক্তি আছে আমি অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবেলা করতে চাই।" এই কথা শুনে মেজর গিয়াস অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেন এবং বলেন, "এমন দেশমাতৃকার সন্তান যার ঘরে আছে সেই দেশমাতাকে কোন শত্রু বেশি দিন বন্দি করে রাখতে পারে?"

এরপর মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তিনি প্রেমতলী, মহারাজপুর, অনুপনগর, কাশিমপুর, চারঘাট, ধূলাউড়ির হাট (চর), অভয়াব্রিজ ধ্বংশসহ অনেক দুর্ধর্ষ মুক্তিযুদ্ধের অভিযান করছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় রাজশাহীর তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কামারুজ্জামান যুদ্ধ ক্যাম্প প্রদর্শনে আসেন। ক্যাম্প প্রদর্শন শেষে তিনি জানতে চান, "এই ক্যাম্পে গান করেন কে? আমি শুনলাম এই ক্যাম্পে একজন ভালো গায়ক আছেন।" সবাই তখন মফিজ আঙ্গুরকে দেখিয়ে দেন। তখন তিনি গান করতে বলেন, মফিজ আঙ্গুর গান গেয়ে মন্ত্রী মহাদয়কে শুনান। মন্ত্রী মহাদয় বলেন, "তোমার তো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাওয়া প্রয়োজন।" মফিজ আঙ্গুরকে মন্ত্রী মহাদয় গাড়ী করে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।

মফিজ আঙ্গুর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ও সকলের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন। তারমধ্যে আশফাকুর রহমান খান, বেলাল মোহাম্মদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, শামসুল হুদা, টি.এইচ শিকদার, মোস্তফা আনোয়ার, আলী যাকের, শহীদুল ইসলাম, আবু ইউনুস, সমর দাস, বদরুল হাসান, তিমির নন্দী রফিকুল আলম, প্রণব দে, কামাল লোহানী, সুব্রত বড়ুয়া, অনিল কুমার, রথীন্দ্রনাথ রায়, কল্যাণী ঘোষ, উমা খান, মলয় গাঙ্গুলী ফকির আলমগীর, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, সুবল দাশ, কাদেরী কিবরিয়া প্রমুখ অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসতেন তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হাতে প্রচারিত

"কাপড় বুনাইয়া কারিগর, কৌশলে লুকাইছে দেখ তার ভিতর"

"আমার মায়ের সাদা কাপড়ে রক্তের লাল দাগ দিচ্ছে পাকবাহিনী"
"জয় বাংলা, বাংলার জয়"
"পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল"
"তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে"
"সালাম সালাম হাজার সালাম"
"বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা"
"শোন একটি মুজিবরের থেকে"
"নোঙর তোল তোল"
"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"
"জনতার সংগ্রাম চলবেই"
"ছোটদের বড়দের সকলের"
"কারার ঐ লৌহ কপাট"
"সোনা সোনা সোনা" ইত্যাদি।

সহ প্রায় সকল সমাবেত সঙ্গীতে মফিজ আঙ্গুর কণ্ঠ প্রদান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য ট্রাকে করে গান গেয়ে। গেয়ে সাহায্য যোগার করতেন। এর মধ্যে তিনি ভারতের অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ২৭/১০/১৯৭১ গান পরিবেশনের আমন্ত্রণপত্র পান এবং গান পরিবেশন করেন। দীর্ঘদিন মফিজ আঙ্গুরের কোন খোঁজ খবর তাঁর পরিবার পাচ্ছিল না।

সেই যে মার্চ ১৯৭১ সালে রাজশাহী বেতারে গিয়েছিলেন আর বাড়ি ফিরে আসেন নি। তাঁর মা কাঁদতেন আর রাস্তার পানে তাকিয়ে থাকতেন। কেউ রাজশাহী শহর হতে এলে ছেলের খবর জানতে চাইতেন। মফিজা আঙ্গুরের হারমনিটাকে যত্ন করে রাখতেন আর কাঁদতেন। কাউকে ধরতে দিতেন না। একদিন তিনি তাঁর বাবার বাড়ি বাসুদেবপুরে যাচ্ছিলেন। প্রতিমধ্যে তার পরিচিত এক বড় ভাই ডাক দিয়ে বলেন- "জামিলা তুমি ছেলে ছেলে করে সারাদিন রাত কান্না কর, তোমার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে মরে নাই, বেঁচে আছে। এই শোনো অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান করছে।" অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান পরিবেশন করে মফিজ আঙ্গুর অক্টোবর

মাসেই আবার যুদ্ধের মাঠে যোগ দেন। তাঁর সহ মুক্তিযোদ্ধারা তাকে স্বশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেন। মফিজ আঙ্গুরের মন পড়ে থাকতো যুদ্ধের ময়দানে তাই তিনি ঠিক করেন, অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবেলা করবেন। সেই কারণে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চলে আসেন রাজশাহীর যুদ্ধের পূর্বের ক্যাম্পে। মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে আবার শুরু হয় সসস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অভিযান। সসস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি ঘটনা তিনি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রেমতলী গোদাগাড়ীর সংযোগকারী একটি লোহার ব্রিজ ছিল। আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মিলে ব্রিজটি ধ্বংশ করার প্রত্যয় গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প হতে বের হই। নৌকা করে রাতের বেলায় আমরা ব্রিজের কাছাকাছি পৌছাই। কিন্তু ব্রিজটি ধ্বংস করার মত দুরত্ব কমাতে পারছিলাম না। কারণ ব্রিজটিকে তখন স্থানীয় রাজাকার বাহিনী পাহারা দিচ্ছিল। আর নদীর পানি ও উত্তাল ছিল। যে কারণে নৌকার গতি ঠিক রাখা যাচ্ছিল না। তখন আমরা জানতে পারি ব্রিজের কাছাকাছি আর এক মুক্তিযোদ্ধার দল স্থল পথে ব্রিজটি ধ্বংশ করার জন্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় তাদের কাছের গোলাবারুদ ভিজে প্রায় অকেজো হয়ে গেছে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, আমাদের গোলাবারুদ স্থলভাগের মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিব। কিন্তু নদীর উত্তাল ঢেউ দেখে আমার সহযোদ্ধারা দ্বিধায় পড়ে যাই। কিভাবে গোলা বারুদ পৌছাবো! বর্ষার মৌসুমে নদীর পানির উথাল-পাতাল অবস্থায় রাতের আধারে অভিযান, এর মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। তখন একজন সহযোদ্ধা বলেন, আজ আমরা অভিযান শেষ করতে পারবো না মনে হয়। তখন বলি, আমার বুকে মাইন বেঁধে দেন, আমি এই নদী, এই রাস্তা খুব ভাল করে চিনি। কাছেই আমার গ্রামের বাড়ি। আমার সহযোদ্ধারা বলতে থাকেন, "না ভাই আপনি পারবেন না। আর এটা আপনার জন্য অনেক বিপদজনক হবে। এর চাইতে আজকে অপারেশন বন্ধ থাকুক।" কিন্তু আমি বললাম, "আমি পারবো আমার কিছুই হবে না বিস্ফোরক বুকে বেঁধে দেন।" আমার কথা মতো সকল বিস্ফোরক প্রস্তুত করে আমার বুকে বেঁধে দেয়। আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং সাঁতার কেটে ব্রিজের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। মহান আল্লাহতালার অশেষ রহমতে আমি গোলাবারুদ পৌঁছে দিতে সক্ষম হই। এবং স্থলভাগের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলে ব্রিজ ধ্বংশ

করতে সক্ষম হই। এই অপারেশনে আমরা চারজন ছিলাম তারমধ্যে কাশেম ভাই পরবর্তীতে শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধ চলছিল ধূলাউড়ির হাট (চর) এলাকায় আমরা প্রায় ৫৬জন মুক্তিযোদ্ধা তখন যুদ্ধ করছিলাম আমরা খুব অসুবিধায় ছিলাম। আমরা ভুলক্রমে হানাদার বাহিনীর নাগালের কাছে এসে পড়েছিলাম। আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি এমন সময়। হানাদারদের কয়েকটি সেল আমাদেরকে আঘাত করল। ৫৬ জনের মধ্যে অনেকেই অর্থাৎ তিন জন (নারায়ন, আসাদুল্লাহ, খগেন্দ্র) ছাড়া সবাই কিছু না কিছু আঘাত পেয়েছিলাম। তবুও আমরা থেমে যায়নি। ধুলাউড়ির হাট (চর) কে শত্রু মুক্ত করেছিলাম।

একদিন মেজর গিয়াসের নির্দেশে রাজশাহীর সাথে চাপাইনবাবগঞ্জের সংযোগ ব্রিজসমূহ ধ্বংশের আদেশ পাই। মুক্তিযোদ্ধারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করেন। আমি যে দলে ছিলাম সেই দলের ভাগে ছিল অভয়াব্রিজ। ২২ আগষ্ট এ ব্রিজটিও আমরা ধ্বংশ করতে সক্ষম হই।" এইভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের অনেক যুদ্ধে বীরদর্পে শত্রু ঘাঁটিতে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়াও উল্লেখ্যযোগ্য যুদ্ধে ক্ষেত্র হলো- কাশিমপুর, অনুপনগর, মহারাজপুর, প্রেমতলী, চারঘাট প্রভৃতি।

স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে ১৯৭১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১০০ (একশত) ঘন্টার লাগাতার যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের জয়ের মুখে হঠাৎ করে পাক হানাদার বাহিনীর নিক্ষিপ্ত গুলি এসে তাঁকে ঝাঁঝরা করে দেয়। আহত অবস্থায় তাকে মেজর গিয়াস এবং ডঃ এমদাদের নির্দেশে তাঁর সহযোদ্ধারা বহরমপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেখে আসেন। সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা বলে, তিনি যখন জ্ঞান ফিরে পান এবং চোখ খোলেন দেখতে পান তিনি হাসপাতালের বিছানায় চিকিৎসারত। কিন্তু তাঁর হাত, পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কিছুতেই হাত, পা নাড়াতে পারছিলেন না। স্বাধীনতা অর্জিত হলেও দেশমাতৃকার এই বীর সন্তান আজীবন তাঁর ডান হাত ও বাম পায়ের শক্তি ফিরে পান নি আর।

গ্রামের সব মুক্তিযোদ্ধারাই প্রায় ফিরে আসছেন। না হয় তো তাদের খবর পাচ্ছেন কিন্তু মফিজ আঙ্গুর ফিরতে দেরি করায় সবাই ভাবেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর মা কিছুতে মানতে রাজী ছিলেন না মফিজ আঙ্গুর শহীদ

হয়েছেন। তিনি বারবার বলেন, "আমার বীর মুক্তিযোদ্ধা ছেলে শহীদ হতে পারে না। সে আসবেই, আমাকে মা বলে ডাকবে।"

এদিকে গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা অস্থির হয়ে উঠেন এবং বলতে থাকেন। এদেশের রাজাকার, আল বদরের জন্য আমাদের মফিজ আঙ্গুর ভাই শহীদ হয়েছেন। এদের স্বাধীন দেশে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নাই। এর মধ্যে রাতই মতি আঙ্গুর জানুয়ারির ২ তারিখে গ্রামে ফিরে আসেন। মফিজ আঙ্গুর গ্রামের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, আল্লাহর রহমতে আমি আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি। তারপর গ্রামের সবাই আনন্দ-উল্লাস শুরু করেন, গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বার, আশরাফুল, মোসলিম খোকা, এনামুল হক, সাত্তার, তাজুল, শাহজাহান আলী মাস্টার, আলফাজ উদ্দীন মন্ডলসহ আরো অনেকে তাঁকে লস্করহাটী গ্রাম ও ক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা সহকারে বরণ করে নেন। তিনি স্বাধীন দেশ পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। এবং তাঁর পূর্বের পেশা গান পরিবেশন শুরু করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে প্রতিদিন রাজশাহী বেতারে আসা-যাওয়া শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য খুব অসুবিধা হয়ে উঠে। তাই তিনি রাজশাহীর পদ্মা পাড়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করেন। ভাবুক মফিজ আঙ্গুর পদ্মা নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশে আরো ভাবুক হয়ে উঠেন এবং নিয়মিত বাঘার দরবারে যাওয়া আসা শুরু করেন ও আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ শুরু করেন। এর মধ্যে আসে বাংলাদেশের এক কলঙ্কিত কালো রাত ১৫ই আগষ্ট। বঙ্গবন্ধুর স্ব-পরিবারে নিহত হওয়ায় মফিজ আঙ্গুর সমাজ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। তখন তিনি কোথাও মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর কথা বলার পরিস্থিতি পাচ্ছিলেন না। তিনি কিছুতেই এই হত্যাকান্ড মেনে নিতে পারেননি। এই হত্যাকান্ডের পূর্বে ১৯৭৪ সালে মার্চ মাসের দিকে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দেখা করেন। বঙ্গবন্ধু ও তাকে বাংলার টাইগার বলে অভিহিত করেন। বলেন, "তোর কি লাগবে?" তিনি বলেন, "আমার কিছুই লাগবে না।" কিন্তু মফিজ আঙ্গুর জানেন না কি। এক অদৃশ্য শক্তি বলে, রাজশাহী বেতারের তৎকালীন বড় অফিসার তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালেই রাজশাহী বেতারে বেতন ভুক্ত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ভারাক্রান্ত মনে অফিসের কাজে যোগদান করেন। অফিসের কাজ করতে তিনি কখনই

অনীহা প্রকাশ করতেন না। যে কারণে তাকে অনেক সময় তাঁর কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হতো। যেমন, নাট্য বিভাগের কাজ, সংবাদ বিভাগে এবং বিভিন্ন যন্ত্র পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করতে হতো। যে কারণে তিনি পল্লীগীতির নিজস্ব শিল্পী হয়েও লড়ি বাদক, পারকেশন বাদক, জুড়ি বাদক হিসেবে ও কাজ করেছেন। এভাবেই মফিজ আঙ্গুর ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বেতারে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং ঢাকায় এসে এসে টেলিভিশনে গান করতেন কিন্তু তাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী প্রোগ্রাম দেওয়া হত না। এতে রাজশাহী হতে ঢাকায় যাওয়া আসার খরচ ও উঠতো না। এর মধ্যে ১৪ই মার্চ ১৯৮৩ সালে মেজর গিয়াসের সাথে দেখা হয়। মেজর গিয়াস বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রোগ্রাম সেক্রেটারীকে একটি চিঠি লিখেন। পরবর্তীতে রাজশাহী বেতার থেকে তিনি ১৯৮৯ সালে ঢাকার শাহাবাগ বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। রামপুরা ভাড়া বাসা থেকে প্রতিদিন তিনি জংধরা হুইল চেয়ার গাড়ী ঠেলে দীর্ঘ জ্যাম পাড়ি দিয়ে শাহাবাগের বেতার অফিসে আসতেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চাকরিরত ছিলেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিনি পল্লীগীতির নিজস্ব শিল্পী এবং যন্ত্র শিল্পী (পারকেশন বাদক) হিসাবে ও তালিকাভুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও তাঁর সংগঠন "মফিজ আঙ্গুর শিল্পী গোষ্ঠী" এবং "মফিজ আঙ্গুর ও তাঁর দল" তালিকাভুক্ত সংগঠন হিসাবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে। শুধু বাংলাদেশ টেলিভিশনে না বাংলাদেশ বেতারেও অনুষ্ঠান পরিবেশন করছে। নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মফিজ আঙ্গুর গঠিত সংগঠন বিনোদনমূলক ও সমাজ উন্নয়ন, এবং সমাজ গঠন মূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করেছে এবং করে চলেছে।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোড়ল বজলুল করিম

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার পর মনে মনে নিয়েছিলাম যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারপর আরো বিশ্বাস হয়ে গেল ২৫শে মার্চ কাল রাত্র। ২৫ মার্চ কাল রাত্রে অসহায় বাঙ্গালীর উপর বিরতীহীন পাক সেনাদের গুলিবর্ষণ, তান্ডবলীলা, জ্বালাও পোড়াও লুটপাট হত্যা, তাই আমরা আর ঘরে থাকতে পারলাম না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত হতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমরা অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মরহুম সুলায়মান মোড়ল, শেখ রুহুল আমিন, বারাশীয়া (ফকিরহাট) গ্রামের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিঃ নায়েক আঃ কাদের, আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই নূরুজ্জামান (তখন তার বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর, সে ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট), ফকির আজমল, মোঃ আজিজুল হক, আহম্মদ শেখ, নূর ইসলাম শেখ, আফজাল মোড়ল এবং পারকুরশাইল গ্রামের শেখ ইশারত আলী, শেখ নজরল ইসলাম, শহীদ শেখ হোসেন আলী, শহীদ মোড়ল, অহীদ শেখ, ইশারত শেখ মোট ১৬ জন আমাদের গ্রাম হতে কেউ কেউ দুপুরের খাবার খেয়ে না খেয়েই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গ্রামের উত্তর দিকে বিলের ভিতর দিয়ে মরহুম আঃ আজিজ মোড়লের খোলা বাচাড়ী নৌকায় করে হানাদার মুক্ত এলাকা দিগংগা বারুইগাতী হয়ে সারলিয়া রাজপাট আমাদের এক আত্মীয় মোঃ হাসেম মিয়া বাড়ীতে রাত্র যাপন করি। ভোর রাতে পায় হেটে চুনখোলা গিয়ে নৌকা যোগে যশোর জেলার আড়পাড়া বরইচারা হয়ে কালিবাবু রোড (সিএন্ডবি) পার হয়ে দিনের বেলায় একটা আখ খেতে দিন যাপন করি। রাতে বাগদা বডারের কাছেই রাত্র যাপন করি। মাদারতলা নামক একটা বাজার পাই কিন্তু কোন বসতি দোকান ছিল না। পরের দিন সকালে বাগদা বডার পার হয়ে বাস যোগে বশিরহাট ক্যাম্প এ নাম লিখিয়ে ভ্যাবলা ক্যাম্পে অবস্থান করি। স্বসস্ত্র ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্য হতে ৩ জন ১) মরহুম সুলাইমান মোড়ল, ২) আফজাল মোড়ল ৩) শহীদ মোড়ল বিহার বীরভূম ট্রেনিং সেন্টারে যায়। পরে ওরা অন্য দলের সাথে ট্রেনিং শেষ করে বাগেরহাটের কান্দাপাড়ার আমজাদ মিঞার সাথে আসে। আমরা বাকি সবাই টেট্রা ক্যাম্পে অবস্থান করি। ৭/৮ দিন থাকার পর বিহার চাকুলিয়া স্বসস্ত্র ট্রেনিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। একই সঙ্গে আমাদের ইউনিয়নের বাকপুরা গ্রামের শেখ লেয়াকত আলী, শেখ বেয়াজ উদ্দিন ছিল। এবং মোঃ আতিয়ার জোমাদ্দার, মোশারাফ জোমাদ্দার, নওয়াব আলী খা সহ আরো অন্যান্য ইউনিয়নের বীর মুক্তি সেনারা আমাদের সাথে ছিল। পূর্বেই আমাদের গ্রামের আহম্মদ শেখ এবং নূর ইসলাম শেখ কিছু জিনিসপত্র কেনার উদ্দেশ্যে ক্যাম্পের বাইরে আসে এবং পরবর্তীতে আর ক্যাম্পে ফিরে যায় নি। পরে বাকী সবাই স্বসস্ত্র ট্রেনিং নেয়ার জন্য ট্রেন যোগে চাকুলিয়ায় পৌছাই। এক মাস ট্রেনিং এর মধ্যে প্রতিটা ইভেন্টে আমি প্রতিযোগীতায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাশ করি ও প্রথম স্থান অধিকার করি। রাইফেল সুটিং এ ১১টা উইংস ছিল এবং সেই উইংস গুলিতে সব প্রতিযোগী ট্রেনারদের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ করি। ২য় হয় বাকপুরা গ্রামের শেখ লেয়াকত আলী। ট্রেনিং শেষ করে বেগুনদিয়া ক্যাম্পে আসি। ওখানে মেজর এম এ জলিল (৯নং সেক্টর কমান্ডার) এর কাছে রিপোর্ট করার পর দুই-তিন দিন সেখানে থাকি। পরে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে ৯নং সেক্টরের অধীনে সর্ব বৃহৎ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শতাধিক মুক্তিসেনা বাগেরহাট শহরের উত্তর অঞ্চলে প্রধান ঘাটি করার উদ্দেশ্যে বড় ২টি বাস যোগে বাগদা বডার পার হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথের মধ্যে আমাদের একটি বাস দূর্ঘটনায় সেটির মধ্যে আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই সহ আরো অনেকেই ছিলাম। সেখানে আমরা অনেকেই আহত হই। বাসটি বিকল হয়ে গেলে পাশে থাকা ইন্ডিয়ান আর্মিদের ঘাটিতে সংবাদ পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গাড়ী নিয়ে এসে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমাদের অন্য গাড়ীটি সহ বাগদা বডার পার করে দেয়। আমাদের দলের ভিতর থেকে ৩জন খুব গুরুতর আহত হওয়ার কারণে ঐ আর্মি ক্যাম্প হাসপাতালে চিকিৎসা অবস্থায় থেকে যায় এবং তাদের অস্ত্র আমরা নিয়ে আসি। আমরা বডার পার হয়ে নিরাপদ এলাকা দিয়ে

খুব সতর্কতার সাথে সোর্সের মাধ্যমে দিনে সুন্দরবন এবং রাতে খুলনা জেলার তেরখাদা থানার এলাকা হয়ে শন্তোষপুর হাইস্কুলে এসে ঘাটি করি যা বাগেরহাট থানার অর্ন্তগত এবং সেখানে থেকে বিভিন্ন এলাকার পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করি। প্রতিটা যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর ক্যাম্পে আক্রমণ করা কালীন সময়ে আমাদের সঙ্গী শেখ হোসেন আলী সহ ২ জন শহীদ হন। গোটাপাড়া, পানিঘাট, চিরলিয়া বিষ্ণুপুর, বাবুরহাট, বয়াসিংগা নামক এলাকায় পাক বাহিনীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। তাছাড়া চিত্রা নদীর এপার ওপার পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ লেগেই ছিল। এর ভিতর আমার স্মরণীয় গোটাপাড়া ও বাবুরহাট যুদ্ধে হানাদার বাহিনীদের পরাস্ত করে ওদের অনেকের লাশ নদী হতে উদ্ধার করি ও সাথে যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করি। আমরা যুদ্ধকালীন সময়ে নিজ এলাকায় না থাকার কারণে ঐ সময়ে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীরা আমাদের পরিবারের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার রজব আলীর লালনকৃত রাজাকাররা আমাদের বাড়ী ঘর লুট-পাট ও জ্বালাও পোড়াও করেছে।

এভাবে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে ৭/৮ মাসব্যাপী যুদ্ধ হওয়ার পর এক পর্যায়ে বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধে হানাদার বাহিনীরা পর্যাক্রমে পরাজিত হতে থাকে এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলে আমরা বাগেরহাট শহর মুক্তকরণ অভিযান অব্যহত রাখি এবং রাজাকার বাহিনীর প্রধান ফকির রজ্জব আলী তার দলবলসহ পালিয়ে যায় এবং ১৭ই ডিসেম্বর আমরা বাগেরহাট শহর দখল করি এবং বিজয় পতাকা উত্তোলন করি। আমরা বাগেরহাটে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম এর নিকট আমাদের সকল অস্ত্র জমা দিয়ে ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকি (নূরল আমিন হাইস্কুলে) উল্লেখ্য ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকাকালীন আমি বিএইসএম পদে নিযুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করি। পরে ক্যাম্প বিলুপ্ত হবার পর লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ীতে চলে আসি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রকৌশলী শহীদউল্লাহ চৌধুরী এনডিসি (অবঃ)

আমি ১৯৭১ সালে এসএসসি পরিক্ষার্থী ছিলাম। ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ ঢাকা স্টেডিয়ামে একটা ক্রিকেট খেলা হচ্ছিলো, আমি ও স্টেডিয়ামে বসে ক্রিকেট খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ করে শুনলাম যে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় যে পার্লামেন্টের একটি সেশন হওয়ার কথা ছিল, সেটা সে পোস্টপোন্ড করে দিয়েছে। এখবরে জনতা ও যারা ভিতরে দর্শক ছিল সবাই উত্তেজিত হয়ে খেলাটা পন্ড করে দিল। এবং এরপরে আমরা বেরিয়ে লোকজনের পিছনে পিছনে হোটেল পূর্বাণীতে আসলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বানী হোটেলে উনি একটা সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দিলেন। আমরা ওখানে গেলাম। আসলে যে আমি ওই সংবাদ সম্মেলনে গিয়েছিলাম, সেটা ঠিক কোন একটা উদ্দেশ্যে যাইনি। কারণ আমি একটা কিশোর ছিলাম। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, তো উনারা যাচ্ছে আমরাও গেলাম। ওখানে বঙ্গবন্ধু ওনার ভিন্ন আদেশ জারি করলেন, বললেন যে আজ থেকে সারাদেশে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবরোধ হবে। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে, অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে এবং কোন বাঙালি রেডিও বা টেলিভিশনে পাকিস্তানিদের কোন সংবাদ প্রচার করবে না, এরকম অনেক নির্দেশনা দিলেন। ওখান থেকে আমি চলে আসলাম। তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস গ্রাউন্ডে আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেল। ওই প্রশিক্ষণটা যে কি, কেন প্রশিক্ষণটা হচ্ছে বা কি হচ্ছে, সেসব না বুঝেই ওখানে চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে আমরা স্কুল

কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা প্রথমে পিটি প্যারেড করি, কাঠের রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং নেই। ৭ ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের দিন ঠিক হল এবং ঢাকা শহরে তখন চরম উত্তেজনা, আমরা ভাবলাম যে বঙ্গবন্ধু ঐদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। এবং আমাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার ঘোষণা মানেই হলো উনি বলবেন যে আজকে থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দিলাম। উনার বক্তৃতা শুনলাম, ওনার বক্তৃতা শুনে আমি শুধু না অলমোস্ট সবাই আমরা একটু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলাম। কারণ উনি এমন কিছু বললেন না, উনি যদিও লাস্টে বললেন যে "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" কিন্তু এর বাইরে আর অন্য কিছু বলেন নাই। বললেন যে, তোমরা যে যার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও, এই করো সেই করো কিন্তু আমরা তখন খুব বেশি খুশি হতে পারিনি। যাহোক আজকে আমি বুঝি যে উনি অনেক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। ঐদিন যদি উনি এর বাইরে অন্য কোন কথা বলতেন, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কিনা আমার সন্দেহ আছে। কারণ আপনারা জানেন যে ৭০ দশকে পৃথিবীজুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি একটা নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। উনি যদি স্বাধীনতার ডিক্লারেশন দিতেন তারমানে ইস্ট পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সারা বিশ্বের যে সাপোর্ট সেটা আমরা পেতাম না। আর দ্বিতীয় কথা হল উনি পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির লিডার। উনার কাছে ১৬৭ জন এমপি আছে। তো সেই হিসেবে উনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাই উনি এটা বলতেই পারেন না। যাই হোক, ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাঠে আমাদের প্রশিক্ষণ চলছে। এদিকে পাকিস্তানি অথরিটির সাথে ইয়াহিয়া খান, ভূট্টো ওান্যান্য সবার সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা চলছে। তখন আমরা একটা দোলাচলের মধ্যে আছি আসলে কি হবে। যেহেতু যুদ্ধ একটা কঠিন বিষয়। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই ছিল না। আমরা অনেকে একটা রঙিন স্বপ্নের মতোন জগতে ছিলাম, মনে হয় যে আমরা এরকম কাঠের রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং করতেছি, আর ভাবছি এই পাকিস্তান আর্মির যে মডার্ন ওয়েপন যাদের কাছে আছে তাদের সাথে আমরা মনে হয় এমনি জিতে যাব। এভাবে ২৫ শে মার্চ চলে আসলো। আমাদের বাসা ঢাকার বকশীবাজার, ২৫ তারিখ রাতের ১ টার দিকে আমার বাবা আমাদের ঘুম থেকে উঠালো, আমি আমার ইমেডিয়েট বড় ভাই আমরা দুজন আমাদের বাড়ির একতালায় একটা রুমে ঘুমাই। উনি এসে

খুব দরজা ধাক্কাচ্ছেন। আমরা ঘুম থেকে উঠে বললাম, কি হইছে? কি হইছে? উনি বললেন যে, "তোরা কি মরে গেছিস নাকি? সব শেষ হয়ে যাচ্ছে।" আমি বললাম, কি বলছেন আপনি সব শেষ হয়ে যাচ্ছে! উনি বললেন, "ছাদে যা।" আমাদের বাড়ীটা তিনতালা, তিনতালার ছাদে গিয়ে দেখি যে শহীদ মিনার এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির এলাকার দিকে অনেক বিস্ফোরণের আওয়াজ। ট্রেসার বুলেটের অনেক আলো হয়, সেই আলোটা দেখা যায় এবং গোলাগুলির আওয়াজ আমরা শুনতে পেলাম। সেই রাত্রে আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না আসলে কি হতে যাচ্ছে। পরদিন সকালে আমার তিন নম্বর ভাই, উনি একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত, উনি বললেন যে, বিবিসিতে বলছে যে আর্মি ক্র্যাকডাউন করেছে। তারপর সকালবেলা ৯টার দিকে রেডিও পাকিস্তান থেকে ঘোষণা আসলো, ইয়াহিয়া খান ভাষণ দেবে। আমরা সেই ভাষণটা শুনলাম। সেই ভাষণের মোদ্দা কথা হলো যে, শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছে। আওয়ামীলীগ তাকে সহযোগীতা করতেছে। সেজন্য তাদেরকে সায়েস্তা করার জন্য, দেশকে বাঁচানোর জন্য পাকিস্তান আর্মি মাঠে নেমেছে এবং তারা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। ঐদিন বেলা ১২টার দিক থেকে ২টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়েছিলো, ঐদিন থেকে কারফিউ জারী করা হয়েছিলো। ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত কারফিউ থাকবেনা। আমাদের পাড়াতে বন্ধু-বান্ধবরা কারফিউ থাকলেও আসলো, তো আমরা বললাম চল, আমরা দেখে আসি কোথায় কি হলো। একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী ১৪-১৫ বছরের ছেলে, তাঁদের তো অত চিন্তাধারা নেই যে কি হতে পারে বা কি বিপদ আসতেছে। আমাদের বাসা থেকে দুই কি আড়াই কিলোমিটার দূরে জগন্নাথ হল। আমরা আমাদের বাসা থেকে সোজা যে রাস্তা গেছে, সেটাই জগন্নাথ হল ক্রস করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছে, সেই পথে হাটতে হাটতে জগন্নাথ হলের দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি যে মাঠের মধ্যে অনেক মাটির গর্ত করা। ওখানে ভিতরে গিয়ে দেখি যে অনেকগুলো ডেডবডি আছে। ঠিকমত বুঝা যায়না, দুই একটার হাত বেরিয়ে আছে। দুই একজনের মাথার চুল দেখা যাচ্ছে। এরকম অনেকগুলো বডি দেখলাম কিন্তু কতগুলো বডি, সেটা বলতে পারবনা। তারপর ওখান থেকে হাটতে হাটতে ইকবাল হল যেটা বর্তমানে জহুরুল হক হল, ওখানে গেলাম। ওখানে ৩ টা ডেডবডি দেখলাম। জহুরুল হক হলের গেটের মুখে একটা পুলিশের ডেডবডি

আর ক্যান্টিনের ছাদে একটা মাঝ বয়েসী লোক ও একটা ছেলের ডেডবডি দেখলাম। ওখান থেকে আমরা পলাশীর ফায়ারব্রিগেডের দিকে গেলাম। ওখানে গিয়ে আমি ২৩টা ফায়ারম্যানের লাশ দেখতে পেলাম। ওদেরকে এক সাড়িতে মারা হয়েছে। এই জিনিসগুলো দেখে আমার মনে হলো যে আমরা বোধহয় শেষ হয়ে গেলাম, ধ্বংস হয়ে গেলাম, আমাদের বাঙ্গালীর আর কোনো আশা ভরসা রইলনা। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। এবং খুব অসহায় লাগতেছিলো। ২৬ তারিখ সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাসায় একটা মিটিং হলো। আমাদের বাসার ৩ তালার ভাড়াটিয়ার ২টা ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমার সেজ ভাই ইউনিভার্সিটির লেকচারার। আমরা সব ভাইয়েরা সবাই মিলে বসলাম এখন আমাদের কি করা উচিৎ বা করনীয় কি? তখন তো আমাদের সামরিক কলাকৌশল সম্বন্ধে কোনো ধারনাই ছিল না, তাই যার যেটা মনে হচ্ছে, সেটা বলতেছে। মিটিং এ সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা আর্মিকে ঠেকানোর জন্য ব্যারিকেড দিব, আমাদের ওখানে কংকৃটের বড় বড় পাইপ পড়ে ছিলো, কন্সট্রাকশন কাজের জন্য আনা হয়েছিলো, একটা নষ্ট পিকাপ ছিলো, এগুলো দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার চিন্তা করলাম। সেভাবে আমরা আমাদের বাসা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় যতগুলো পাইপ পেয়েছিলাম, সেগুলোকে দিয়ে ব্যারিকেড দিলাম। ২৬ তারিখ পার হয়ে গেলো। ২৭ মার্চ সন্ধায় চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর বিদ্রোহের কথা জানতে পারলাম। এখবরটা আমাদেও অনেক উজ্জীবিত করেছিল। ২৯ কি ৩০ তারিখের দিকে আমাদের বাসায় আরেকটা মিটিং অনুষ্ঠিত হল। যারা আগেরদিনের মিটিং এ ছিলো, তারা থাকলো। আমরা আলোচনা করতে লাগলাম, আমরা যে ব্যারিকেড দিলাম, তা দেখে যদি আর্মি আমাদের এলাকার লোকজনদের মেরে ফেলে, তাহলে কি হবে? আর এধরনের ব্যারিকেড তো কিছুইনা, একটা ধাক্কা দিলেই তো সরে যাবে। তখন আবার সিদ্ধান্ত হলো, আমরা ব্যারিকেডগুলো সরিয়ে দিব, কারণ এতে কোনো লাভ নেই। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ব্যারিকেডগুলো সরিয়ে ফেললাম। এভাবে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত আমরা পার করে দিলাম। ২রা এপ্রিল থেকে ঢাকা শহরে কারফিউটাকে শিথিল করে ফেলা হয়েছে। দিনের বেলা কোনো কারফিউ নেই, রাতের বেলা শুধু কারফিউ বহাল রাখা হলো। তো আমাদের বাসার সামনের রাস্তাটা উর্দূরোড হয়ে একদম চকবাজার হয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর

দিকে গিয়েছে। ২রা এপ্রিল থেকে দেখছি যে, হাজার হাজার লোক ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভাবতে লাগলাম আমরা কোথায় যাবো? আমাদের গ্রামের বাড়ী চিটাগাং। সেখানে যাওয়ার মত রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়ার তেমন কোনো ব্যাবস্থা নেই। এছাড়া ঢাকার কাছাকাছি কোনো গ্রামেরও তেমন কেউ পরিচিত নেই। এভাবে ২-৩ দিন ধরে আমরা দেখলাম যে হাজার হাজার লোক বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে ঐদিকে গেলো। পরে জানতে পারলাম যে এই পলায়নরত বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তান আর্মি নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। অসংখ্য লোক মারা গিয়েছে। তার নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা আমি বলতে পারবনা। এরপর আমাদের তো হাতে কোনো কাজ নেই। ঐ বয়সী ছেলেরা তো ঘরে বসে থাকেনা। আমরা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের ভিতরে একটা পুকুর ছিলো, সেখানে গিয়ে মাছ ধরতাম। এভাবেই আমাদের দিনগুলো পার হয়ে যেতে লাগলো। এরপর ১৭ই এপ্রিল আমাদের স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হলো এবং জয়বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার শুনতে পেলাম। অনেক ভেবেচিন্তে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। কিন্তু আমরা আমাদের ঐ বয়সে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া বা মেহেরপুর ঐ এলাকাগুলোতে কখনো যাইনি, কিভাবে যেতে হয় তাও আমরা জানিনা। আমরা ম্যাপ দেখে দেখে মেহেরপুরের আম্রকানন, যেখান থেকে আমাদের স্বাধীনতার প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল, সেখানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। এখনকার মত এত আধুনিক ম্যাপ তখন ছিলনা। আমাদের কাছে ব্রিটিশ একটা এটলাস ছিলো। বাংলাদেশের একটা ডিটেইলড ম্যাপ পেলাম। আমরা দেখলাম যে আমরা যদি কুমিল্লা দিয়ে ভারতে যাই, তাহলে এটা সহজ হবে। এইভাবে প্ল্যান করে আমরা ৭ জন বন্ধু বাড়িতে কিছু না বলে বেরিয়ে পরলাম। আমি আমার বড় বোনকে বললাম যে, এক জায়গায় লুটের কিছু শাড়ী কাপড় বিক্রি করতেছে, তুমি কিনবে নাকি? তখন একটা শাড়ীর দাম ১০-১৫ টাকা। ওকে এগুলো বলে ওর কাছ থেকে ৫০ টাকা নিয়ে আমরা সবাই একসাথে বেরিয়ে পরলাম। প্রথমে আমরা সদরঘাট গেলাম। ওখান থেকে আমরা লঞ্চে করে রামচন্দ্রপুর গেলাম। এটা ছিলো মুরাদনগর বা হোমনাতে। রামচন্দ্রপুরে আমরা সন্ধ্যায় পৌছালাম। ওখানে পৌঁছে আমরা এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম ওপারে কিভাবে যাবো। ওখানে এলাকার লোকজন আমাদেরকে রাতের বেলায় যেতে নিষেধ করে রাতটা ওনাদের কাছে কাটিয়ে ভোরবেলা চলে যেতে বললেন।

তখনকার সময়ে গ্রামের কোন বাড়িতে একসাথে ৭ জনের খাবারের ব্যাবস্থা করা ছিলো খুবই কঠিন ব্যাপার। আমরা যে ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, উনি আমাদেরকে একটা গামলাতে করে প্রায় কেজি খানেকের বেশি মুড়ি আর এক টুকরো বড় খেজুরের গুড় দিলেন। আমরা ওটা খেয়েই রাতটা পার করে দিলাম। ভোরবেলা ওনারাই আমাদের জাগিয়ে দিলেন। আমাদেরকে চা আর মুড়ি খেতে দিলেন। এরপর একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন আর বললেন যে এই রাস্তা ধরে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে যেতে। আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। লোকেরা আমাদের বিভিন্নভাবে জায়গা দেখিয়ে দিতে লাগলো। হয়ত ওনারা যে পথটুকুকে ৩ মাইল বলল, প্র্যাক্টিকালি দেখাগেলো তা প্রায় ১৫ মাইল। এই করতে করতে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ ত্রিপুরার কোনাবনে গিয়ে পৌছালাম। ওখানে পৌঁছানোর পরে বিএসএফ আমাদেরকে এক জায়গায় জড় করে রাখলো। তার পরদিন বিএসএফ আমাদেরকে আমাদের কাগজপত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। আমাদের কাছে দেখানোর মত কোনো কাগজপত্র ছিলোনা। ওরা আমাদের কাছে অন্তত ছাত্রলীগের সদস্য পরিচয়পত্র দেখতে চাইলো। আমাদের কাছে তাও ছিলোনা। তখন ওরা আমাদেরকে বলল যে, তোমাদের আমরা এখানে ঢুকতে দিতে পারিনা। এভাবে আমরা ওখানে ২দিন থাকলাম। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারলামনা। আমাদের মন খারাপ হয়ে গেলো। সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা আবার দেশে ফিরে যাই। যে পথে আমরা ওখানে গিয়েছিলাম, সেই পথ ধরেই আমরা আবার ফিরে আসলাম। এবং দেশে ফিরে আসার পর আমাদের মাথা থেকে মুক্তিযুদ্ধের ভূত নেমে গেলো। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই তো করতে পারলাম না। এদিকে আস্তে আস্তে ঢাকা শহর স্বাভাবিক হতে শুরু করলো। এপ্রিলের ২৬ কি ২৭ তারিখের দিকে আমরা দেশে ফিরে এসে সেই মাছ ধরার কাজে লেগে গেলাম। আর রেডিওতে জয় বাংলা বেতার কেন্দ্রের কিছু খবর শুনে দিন পার করতে লাগলাম। এভাবে মে মাসের মাঝামাঝি সময় অতিক্রম হবার পর আমার কাছে কিছু ছেলেপেলে দেখা করতে আসলো। তাদের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করতে তারা বলল যে, আপনি তো ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন। এ কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম যে এরা কি করে জানলো যে আমি ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম? এখন যদি এরা আমাকে পাকিস্তান আর্মির কাছে ধরিয়ে দেয়? আমি উত্তর দিলাম, ভাই আমি তো ইন্ডিয়া যাইনি। আর আমার ইন্ডিয়া যাওয়ার

প্রশ্নই ওঠেনা। আমরা হলাম মুসলিম লীগ। আমাদের বাপ-দাদারা সবাই মুসলিম লীগ করত। আমরা হচ্ছি পাকিস্তানের পক্ষের লোক। এগুলো বলে ওদেরকে বিদায় করে দিলাম। ক'দিন পরে ঐ ছেলেগুলোর সাথে আমার এক বন্ধুও আমার সাথে দেখা করতে আসলো। আমার বন্ধু আমাকে বললো যে, দোস্ত, এরা সত্যি সত্যিই ইন্ডিয়া যেতে চায়। তখন আমি যেভাবে যেভাবে ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম, সেভাবে সেভাবে ওদেরকে একটা ধারণা দিতে লাগলাম। এভাবে ৩০মে ওরা এসে বলল যে, আগামীকাল ওরা ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করবে। ওদের সাথে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে আমারও ওদের সাথে যেতে ইচ্ছে জাগলো। এরপর আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওদের সাথে যাবো। আমাদের দলে মোট ১২ জন ছেলে ছিলাম। আমার এক বন্ধু ছিলো মিকি যার বড় ভাই, জিয়া ভাই, যিনি ক্র্যাকপ্লাটুনে ছিলেন। সেই মিকি আর আমি ২ জন আর ওদের থেকে ১০ জনের আসার কথা। তো আমরা সদরঘাটে গিয়ে দেখি ওদের থেকে মাত্র ২জন আসছে, বাকি ৮ জনই আসেনি। আমরা ২ জন, মোট ৪ জন। তো এই ৪ জনই আমরা লঞ্চে উঠলাম। মে মাসের ৩১তারিখে কিন্তু আর্মি অলমোস্ট সব জায়গাতেই ডেপলয় হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, আমরা যে লঞ্চটাতে চললাম, সেই লঞ্চটা মুন্সীগঞ্জের কাঠপট্টিতে থামল। সেখানে থামার পরে দেখলাম যে এফএফ রেজিমেন্ট, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স পাকিস্তানের দুই সদস্য লঞ্চটিতে উঠলো যাদেরকে আমরা পাঠান বলি। ওরা এসেই আমাদের এক এক জনকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল "তুমি কি করো? তুমি কি করো?" ততদিনে আমাদের প্রত্যেকের ঢাকা শহরের আইডেন্টিকার্ড তৈরি হয়ে গিয়েছে। যেমন আমার আইডি কার্ডে লেখা ছিল প্রুফ রিডার। এটা প্রত্যেকে যে যেভাবে পারছে তৈরি করে নিয়েছে। যেহেতু আমি পুরান ঢাকার ছেলে ছিলাম, আমাদের পুরান ঢাকার মানুষজন কিছুটা উর্দু ভাষায় কথা বলে। সেই সুবাদে আমি কিছু উর্দু বলতে পারতাম কিংবা বুঝতে পারতাম। তখন সেই দু'জন পাকিস্তানি সোলজার আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এ কোচে, তু কেয়া কারতা হায়?" তো আমি জবাবে বললাম "মে নক্রি করতাহুঁ।" জিজ্ঞেস করল, কিধার? আমি বললাম মৌলভীবাজার মে। আবার জিজ্ঞেস করল কেয়া নকড়ি? আমি বললাম প্রুফ রিডার। এটা বলার পরে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি মৌলভীবাজারের খান সাব কে চেনো নাকি? আমি বুঝতে পারছিলাম না যে সে কোন খান সাব সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছিলো। তবে আমার জানামতে

মৌলভীবাজারে ঢোকার মুখে দু'জন পাঠান ছিল যারা টোবাকো বিজনেস করত। তা ভাবলাম বলে দিই যা হবার হবে। বললাম হ্যাঁ চিনি। তখন জিজ্ঞেস করল ওলোগ কিয়া কারতে হে? আমি বললাম টোবাকো বিজনেস করে। শুনে ও খুশি হয়ে গেলো। অর্থাৎ ওর সাথে মিলে গেল। এরপর ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম আমি নানা বাড়ি যাচ্ছি। আমার মা ওখানে আছে। জবাবে জিজ্ঞেস করল কবে ফেরত যাবে? আমি বললাম সাতদিন পরে। এরপর ও বলল ঠিক আছে যাওয়ার সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ করো এবং সালাম দিও। এরপর ওরা আমার পাশের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল তুম কেয়া করতাহে? জবাবে আমার বন্ধুটা ভয় পেয়ে "আমি ছাত্র" বলে দিল। ওরা ছাত্র শব্দটা বুঝতে পারল না। তাই ওরা উপস্থিত শিক্ষক কে বলল এই ছেলে কি করে? তখন শিক্ষক, স্টুডেন্ট বলে দিল। ছাত্র শুনেই ওরা খেপে গেলো। ওরা তো তখন আমার ঐ বন্ধুটাকে ধরে নিয়ে গুলি মেরে দিবে, মেরে ফেলবে, এই সমস্ত বলতে শুরু করল। আমি তখন ওদের পা ধরে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে ও খুব ভালো ছেলে। যাই হোক ওরা কিছু করলো না। এর মধ্যে একটা কলাওয়ালা আসলো, ওরা কলাওয়ালার কাছ থেকে দুটো কলা ছিড়ে নিল, একটা আমাকে দিলো। আমি কলা খেলাম। ওরা আমাদের কিছু করলো না, খালি ছাত্র বলার কারণে ওই ছেলেটাকে একটা থাপ্পর দিল। যাহোক, আমরা লঞ্চ থেকে রামচন্দ্রপুর নামলাম। ওখানে নেমে একটা বাড়িতে থাকলাম। পরের দিন আমরা ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে দিয়ে একদম ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা মেইনরোড যেটা আছে, সেটাতে পাকিস্তানি আর্মিরা পেট্রোল দেয় ওখানে পৌছলাম। তাদের সাঁজোয়া গাড়িগুলোতে লং রেঞ্জ এর মেশিনগান লাগানো রয়েছে। তারা চাইলেই দূর থেকে ফায়ার করতে পারে। যেহেতু আমরা গ্রামের ছেলে না শহরের ছেলে, গ্রামের ছেলেদের মত আমরা লুঙ্গি পরি না, প্যান্ট-শার্ট পরি। তাই সেখানকার চেয়ারম্যান আমাদেরকে সেই রাস্তায় যেতে নিষেধ করল। বলল এখন যেওনা, এখন সেখানে বিপদ আছে। তখন দুপুর তিনটার মতো বাজে, আমরা চেয়ারম্যানের বাড়িতে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করলাম। সন্ধ্যার দিকে উনি আমাদেরকে একজন লোক সাথে দিলেন। তার সহযোগিতায় আমরা সেই রোড পার হয়ে গেলাম। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ঢাকা চিটাগাং রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। রেললাইন পার হয়ে এক কিলোমিটার পরে হচ্ছে

ইন্ডিয়া ত্রিপুরা। আমরা এবার সোনামুড়া দিয়ে ঢুকলাম। এবার ঢোকার সময় আমাদের তেমন কোন প্রবলেম হয়নি। ঢুকে গেলাম এবং সেখানে একটা ঘরে আমরা আশ্রয় নিলাম। সেখান থেকে আমরা পরের দিন সকালে চান্দের গাড়ি করে আগরতলা গেলাম। সেটা ছিল জুনের ১ তারিখ। আগরতলা যাওয়ার পরে আমরা কংগ্রেস ভবনে গেলাম। সেটা ছিল আগরতলা শহরে। ওখানে যাওয়ার পরে কয়েকজনের সাথে দেখা হল, ওরা আমাদেরকে একটা ইয়ুথ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিল। ইয়ুথ ক্যাম্প এ আমি সাত দিনের মত ছিলাম। ওখানে যাওয়ার পরে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখানে কোন অস্ত্রসস্ত্র ট্রেনিং নেই। ওখানে শুধু লেফট রাইট করায় আর জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি কাটতে হয় রান্না-বান্নার জন্য, যেটাকে ফেটিগ ডিউটি বলে। এভাবে সাতদিন করার পরে আমার কাছে মনে হল যে আমি এখানে আসছি কেন? তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাদের যিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তার নাতি ওখানে ছিলেন। উনি হয়তো আমার থেকে ৫-৬ বছরের বড় হবেন। উনি হয়তো কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন আমার ঠিক জানা ছিল না। উনি বললেন যে, উনি ক্যালকাটা যাবেন। আমি ওনার কাছে বললাম যে, আমাকে আপনি আপনার সাথে ক্যালকাটা নিয়ে যান। উনি রাজি হয়ে গেলেন। তখন আমি আমার বন্ধুকে বললাম যে আমি কলকাতা যাচ্ছি, তুই যাবি কিনা। ও বলল যে, না কলকাতা যাবো না। কলকাতা কিভাবে যাব এত দূরে? আমি উনার সাথে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ত্রিপুরা থেকে যে কলকাতা কতদূর, তা আপনারা ম্যাপ দেখলে বুঝতে পারবেন। ত্রিপুরার আগরতলা হলো আমাদের ম্যাপের পূর্বদিকে, আর কলকাতা হলো আমাদের ম্যাপের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে। তার মানে পুরো বাংলাদেশ ঘুরে সেখানে যেতে হয়। আমরা আগরতলা থেকে বাসে করে ধর্মনগর গেলাম। এটা ছিল খুবই পাহাড়ি রাস্তা। অনেক লোকজন বমি করতে লাগলো। ধর্মনগর থেকে আমরা ট্রেনে করে আসামের লামডিং গেলাম। লামডিং থেকে গুয়াহাটি গেলাম। গুয়াহাটি থেকে আমরা খেজুরিয়া মাঠ হয়ে ফারাক্কা ব্রিজ পার হয়ে চার দিন বসে কোলকাতা পৌছালাম। সেখানে পৌছে আমরা দুই বন্ধু গেলাম বাংলাদেশ মিশনে। ততদিনে বাংলাদেশ হাইকমিশন যেটা পাকিস্তান হাইকমিশন ছিল, সেটা বাংলাদেশের পক্ষে চলে এসেছে। ওখানে যাওয়ার পরে আমাদেরকে বলল, তোমরা ফর্টি ফাইভ প্রিন্সেপ স্ট্রীট ধর্মতলা তে ডঃ বিধান চন্দ্র সেন

(ওয়েস্টবেঙ্গলের একসময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন), উনার বাড়িতে যাও, ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সিলেকশন হয়। ওখানে গেলাম। এখানে তিন চার তলার একটা বাড়ি। সেই বাড়িতে জয় বাংলা অফিস করা হয়েছে। ওখানে যাওয়ার পরে ঢাকার একটা ছেলের সাথে পরিচয় হলো। সেই ছেলেটা আমাদেরকে বলল তুমি তাড়াতাড়ি একটা জায়গা দখল করে নাও, এখানেই আমাদেরকে থাকতে হবে। আমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে একটা ব্যাগ ছিল, সেই ব্যাগটা রাখলাম, ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে বিছিয়ে দিলাম। ওখানে দুদিন অতিবাহিত হল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এমপিএ (মেম্বার অফ দি প্রভিরিয়ান অ্যাসেম্বলী) জনাব নুর ইসলাম মঞ্জু, উনার সাথে দেখা। উনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা ৯ নম্বর সেক্টরের তোকিপুরে চলে যাও। ওখান থেকে আমরা ৭-৮ জন ট্রেনে করে ২৪ পরগনার তোকিপুর ক্যাম্পে চলে গেলাম। সেটা ছিল হাসনাবাদ থানার একটা ক্যাম্প। ওখানে যাওয়ার পরে আমরা দুই তিন দিন ছিলাম। তারপর সেখানে ভারতীয় আর্মিদের ট্রাক আসলো। তারপর সেই ট্রাকে উঠিয়ে আমাদেরকে একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ইন্ডিয়ান ট্রেনিং ক্যাম্প চাকুলিয়াতে। সেখানে একুশ দিন ট্রেনিং করে আমরা আবার তোকিপুর ক্যাম্পে ফেরত আসলাম। ক্যাম্পে আসার পরে আমাদের প্রথম একটা অপারেশনে পাঠানো হলো। আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হলো যে, তোমরা বাংলাদেশের ভিতরে গিয়ে ছোটখাটো অপারেশন পরিচালনা করবে। ছোটখাটো অপারেশন বলতে আর্মিদের কোন ছোটখাটো ট্রুপসের উপরে অতর্কিত আক্রমণ কিংবা মাইন বসিয়ে কোন ট্রাক ধ্বংস করা, বিভিন্ন জায়গার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। তো প্রথমবার আমরা সেরকম কোনো সুবিধা করতে পারলাম না। কারণ ওই এলাকাতে অনেক বাংলাদেশ বিরোধী লোকজন ছিল এবং আমাদের মুভমেন্ট অনেক রেস্ট্রিক্টেড ছিল। সেই অপারেশনে আমরা কিছু টেলিফোনের তার বিচ্ছিন্ন করেছিলাম এবং কিছু গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলাম, এগুলো করেই ফিরে এসেছিলাম। আমরা তেমন বেশি কোন ক্ষয়ক্ষতি করতে পারিনি, তখন মুক্তিযুদ্ধ কেবল ইনিশিয়াল স্টেজে ছিল। এই অপারেশনে আমাদের মেজর কোন সাকসেস আসেনি। যদিও আমরা যুদ্ধের মুডে ছিলাম কিন্তু কোন যুদ্ধ করতে পারিনি। অপারেশন শেষ করে এসে আমি তিন দিনের ছুটিতে কলকাতা গেলাম। এবং আমার চাচা তখন কলকাতায় থাকতেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। আমার

কাছে উনার ঠিকানা ভুল থাকার কারণে আমি ওনাকে প্রথমবার খুঁজে পাইনি। এইবার ছুটিতে গিয়ে আমি ভাবলাম যে আমি একটু আশেপাশে খুঁজি। খোঁজাখুঁজি করে আমি তার সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম। আমার চাচা আমাকে পেয়ে বললেন, "কিসের মুক্তিযুদ্ধ? তুমি আর যেতে পারবে না, আমার এখানে থাকো, আমি তোমাকে স্কুলে ক্লাস টেনে ভর্তি করিয়ে দিব, তুমি আর যেতে পারবেনা। আমি তোমার বাবাকে কি জবাব দেবো?" উনি তো আমাকে ছাড়ছেন না, তাই আমিও ভাবলাম ঠিক আছে থাকিনা দু'একদিন। এর পরের দিন আমি কলকাতা নিউমার্কেটে গেলাম। ভাবলাম যদি দু'একটা শাড়ি কাপড় কিনে নিয়ে যেতে পারি, যেহেতু আমি আমার বোনের কাছ থেকে মিথ্যে কথা বলে টাকা নিয়ে এসেছিলাম। শাড়ির দাম তখন খুব একটা বেশি না, ২০-২৫ টাকা। তো কলকাতা নিউমার্কেটে হঠাৎ করে দুজন লোককে ঘুরতে দেখলাম যাদের মধ্যে একজনকে আমার খুব পরিচিত মনে হল, আমি তাদের পিছনে প্রায় আধাঘণ্টা ঘুরলাম। ঘোরার পরে আমি তাদের সামনে গিয়ে বললাম এক্সকিউজ মি, আপনি কি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, তুমি কে? আমি বললাম আমি তোমার ছোট ভাই। তিনি বললেন তুমি এখানে কি করো? আমি বললাম, আমিতো মুক্তিযুদ্ধের জন্য এখানে আসছি। আমি এখন ছুটিতে চাচার বাসায় উঠেছি। আমার ভাই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমার সাথে আমার চাচার বাসায় গেলেন। তিনি আমার চাচার সাথে দেখা করলেন, আমার চাচা বললেন, "ওকে তো ছাড়া যাবে না। কোথায় গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিবে।" আমার ভাই বললেন, "ঠিক আছে, দেখা যাবে।" আমার ভাইয়ের সাথে ছিলেন ডঃ মুবিন। ত্রিপুরার বিশামগঞ্জে একটা হাসপাতাল হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। ওনারা দুজন মিলে ওই হাসপাতালটি তৈরি করেছিলেন। আমি আমার বড় ভাই এবং ডঃ মুবিন এর সাথে ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে গেলাম যেখানে বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার। উনারা আমাকে জেনারেল ওসমানী সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। উনি তখন কর্নেল ওসমানী। আমার ভাই আমাকে উনার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন যে, "Sir, he is my youngest brother. He is loitering in Calcutta City. You should send him to a camp." কর্নেল ওসমানী আমাকে বললেন যে, "তোমার বাসা কোথায়?" আমি বললাম, ঢাকাতে। উনি বললেন, "তাহলে তো তুমি এখানে কিছু করতে পারবে

না। তোমাকে আমরা সেক্টর টু তে মেলাঘরে পাঠিয়ে দিবো, ওরা ঢাকায় অপারেশন করে।” সেই কথা মোতাবেক আমার ভাই আমাকে এবং ডঃ মুবিন কে প্লেনের দুটো টিকিট কেটে দিলেন। প্লেনটি যাবে কলকাতা গুয়াহাটি হয়ে আগরতলা। বাংলাদেশের উপর দিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফটের জন্য তখন নো ফ্লাই জোন ডিক্লেয়ার করে দেয়ার কারণে প্লেন চলতে পারে না। আমি আর ডক্টর মুবিন আগরতলা এসে মেলাঘর ক্যাম্পে গেলাম যেটা সেক্টর টু হেডকোয়ার্টার, যেটা পরবর্তীতে K Force হেডকোয়ার্টার হয়েছিল। ওখানে যাওয়ার পরে আমাদের ক্যাপ্টেন হায়দারের সাথে দেখা হল। ক্যাপ্টেন হায়দার, মেজর মতিন এবং আরো ছিলেন লেফটেন্যান্ট মালেক তারপরে আরো অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। কর্নেল খালেদ মোশাররফের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের সেখানে। আমরা ঐদিন একটা অফিসার্স মেস রয়েছে যেটা বেড়ার একটা ঘর ভিতরে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চকি বানানো, ওটা ছিল অফিসার্স মেস, ওখানে আমাদের রাতে থাকতে দিলো। ওদের সাথে আমরা রাতে খেলাম। পরেরদিন আমাকে সুইমিং প্লাটুন ট্রান্সফার করে দিল। মেলাঘরের ওখানে ফরেস্টের একটা বাংলো ঘর ছিল, ওইখানে আমাদের সুইমিং প্লাটুনের লোকেশন ছিল, আর ঢাকা কোম্পানি, নোয়াখালী কোম্পানি, অন্যান্যরা ওরা তাঁবুতে থাকতো। আমি সুইমিং প্লাটুনে যোগ দেওয়ার পরে আমাদেরকে প্রচুর ট্রেনিং দিতে শুরু করলো। ওখানকার প্রথম ট্রেনিং ছিল, মেলাঘরের কাছে একটা লেক আছে, ওখানে একটা রাজার বাড়ি আছে, সেই লেকে প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ কিলো সুইমিং করতে হতো। এছাড়াও আমরা এক্সপ্লোসিভ এর উপরে ট্রেনিং করতাম যেমন বিভিন্ন এক্সপ্লোসিভ কিভাবে চার্জ করতে হয়, একটা ব্রিজ কিভাবে উড়িয়ে দিতে হবে, মাইন কিভাবে উড়িয়ে দিতে হবে। যেমন এন্টি ট্যাংক মাইন, এম সিক্সটিন মাইন, এম ফর্টিন মাইন, এন্টি পার্সোনাল, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, কর্ডেক্স, ডেটোনেটর সমস্ত ডিটেলস জিনিসের উপর ট্রেনিং হত। তারপরে স্মল আর্মসের উপরে। এসএলআর, স্টেনগান এগুলোর উপরে ট্রেনিং হলো। এবং আমি যখন মেলাঘরে আসলাম তখন জুলাই মাস। আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আমার ট্রেনিং হলো। এরপর আমাদেরকে অপারেশনে পাঠাবে। আমি আমার অথরিটিকে বললাম যে, অনেকদিন দেশে যাই না, একটু দেশে যেতে চাই। তখন সিদ্ধান্ত হল যে, দাউদকান্দিতে একটা অপারেশন করবো, অপারেশন শেষ করে আমরা ঢাকাতে

যাব। বিশে আগস্ট এর দিকে ক্যাপ্টেন হায়দার, বর্তমানে কর্নেল শহীদ হায়দার, উনি আমাদেরকে বললেন, “ঢাকা দাউদকান্দি রোড টাকে আমরা অকেজো করে দিতে চাই।” কারণ হিসেবে তিনি আমাদেরকে বললেন দাউদকান্দি থেকে ঢাকায় আসার পথে তখন কোন ব্রীজ ছিল না। দাউদকান্দিতেও কোন ব্রীজ ছিল না, বর্তমান মেঘনাতেও কোনো ব্রীজ ছিল না। এই দুটো জায়গাতে পাকিস্তান আর্মি ফেরি ব্যবহার করত। আমাদেরকে বলা হলো যে এই রাস্তাটা যদি আমরা অকেজো করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের লাভ যেটা হবে, এদেরকে নারায়ণগঞ্জ হয়ে শীপে মুভমেন্ট করতে হবে। তাহলে সেটা ওদের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের টার্গেট দেয়া হলো যে ভাটিয়ারচর ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে হবে এবং তার পরে কয়েকটা কালভার্ট উড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে তাদের জন্য এই রাস্তাটা মোটামুটি অকেজো হয়ে যাবে। যাহোক, পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা প্রথমে ভাটিয়ারচর ব্রীজটি উড়িয়ে দিতে যাই। আমরা ভাটিয়ারচর ব্রীজের চারটা পিলারে কাটিং চার্জ লাগাই এবং বিষ কেজি করে এক্সপ্লোসিভ লাগাই এবং কর্ডেট দিয়ে দূরে ডেটনেটর দিয়ে ইলেকট্রিক ব্যাটারির মাধ্যমে এই ব্রীজটাকে উড়িয়ে দেই। সেই অপারেশন শেষ করে আমরা চলে আসি। এরপর আমরা সেকেন্ড যে অপারেশনে যাচ্ছি, সেখানে ফোকাস করব আমি। আমাদেরকে বলা হল যে ভাটিয়ারচর ব্রীজটা উড়িয়ে দেয়ার পর ওরা ফেরী চালু করে দিয়েছে। পারপজটা আমাদের কিন্তু পুরোপুরি সার্ভ হয়নি। এবার আমাদেরকে একটা ডিটেইল প্ল্যান করে যেতে বলা হলো। বেশকিছুদিন থাকার প্ল্যান করে যেতে হবে। তখন আমাদের কমান্ডার ছিলেন রফিক ভাই। উনি গজারিয়ার। পরবর্তীতে উনি এই অপারেশনের কারণে বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছিলেন। আমরা প্রায় বিষ জনের মত গেলাম। আমার সাথে জাকির ভাই, চাঁদপুরের কালাম, আরও অনেকে ছিল যাদের নাম এখন স্মরণ নেই। এই অপারেশনটার জন্য আমাদের টার্গেট ছিলো আমরা ফেরীটা উড়াবো, তারপর ভবেরচর, বাউষ্যার ঐ সাইডের মোট ৪ টা কালভার্ট উড়াবো। যাতে করে আর্মি যেন কোনো অবস্থাতেই এই রাস্তাটা আর ব্যাবহার করতে না পারে। ২৭ তারিখের দিকে ভারত থেকে আমাদের টীম নিয়ে আমরা চলে যাই। টীম নিয়ে আমরা একটা হাইড আউটে থাকি। হাইড আউট থেকে আমরা একটা নৌকা নিয়ে ফেরীটাকে উড়ানোর প্ল্যান করি। এর আগে আমাদের একটা রেকি টীম গিয়ে

দেখে আসে যে ফেরীটা ঐ পারে থাকে অর্থাৎ ঢাকার সাইডে। ওখানে বাঁধা থাকে এবং কিছু আনসার রাজাকার ফেরীগুলোকে পাহারা দেয়। আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম যে সেই আনসার রাজাকাররা অতটা প্রশিক্ষিত নয়। তাদেরকে রাইফেল ধরিয়ে দিয়ে ডিউটিতে রেখেছে মাত্র। প্ল্যান হলো, আমাদের একটা টীম আগে নামিয়ে দিবো যারা আগে গিয়ে আনসার রাজাকারদের নিউট্রালাইজ করবে। এবং ফেরীর দুটো ইঞ্জিনে এস্কপ্লোসিভ লাগিয়ে অকেজো করে দিতে পারলেই পুরো ফেরীই অকেজো হয়ে যাবে। সেই প্ল্যান মোতাবেক আমরা রাত ৩টার দিকে ফেরীটাকে উড়িয়ে দেই। আমরা ফেরীটাতে এস্কপ্লোসিভ লাগিয়ে নদীর এইপারে চলে আসি। আমাদের তো পালিয়ে যেতে হবে। ইলেকট্রিক ডেটনেটরের মাধ্যমে আমরা ফেরীটাকে উড়াই। আমরা দেখলাম যেন একটা আগুনের পিণ্ড আকাশে উড়ে গেছে, উড়ে এসে নদীর এইপারে পরেছে। এরপর ওখানথেকে আমরা হাইড আউটে আসি। তার পরেরদিন আবার আমরা রেকী পেট্রল করি দেখার জন্য। দেখি,না, ঐ এলাকায় আর রাজাকার বা অন্যকেউ নেই। তার পরেরদিন এসে আমরা ভবেরচর এবং বাউষ্যার মোট চারটা কালভার্টে কাটিং চার্জ দিয়ে চারটা কালভার্ট উড়িয়ে দেই। ঐদিন রাতের বেলা আমরা আর হাইড আউটে যাইনি। কারন আমরা ভেবে নিয়েছিলাম যে, ফেরী উড়ে গিয়েছে, কালভার্ট নেই, আমাদের মনে হচ্ছিল যে এদিকে আর কেউ আসবেনা। আমরা অনেক কনফিডেন্ট ছিলাম। ঐ রাতে আমরা রাস্তার পাশে একটা বাড়িতে ছিলাম। সকাল ৮টার দিকে নাস্তা খেয়ে আমাদের মাঝে ঐ অপারেশন নিয়ে ব্রিফিং হচ্ছিল। আমাদের মাঝে কেউ একজন বলল যে, আমরা যেখানে অপারেশনে গিয়েছিলাম, সেখানে তো আমরা এন্টি পার্সোনাল মাইন লাগিয়ে আসছি। এন্টি পার্সোনাল মাইন হলো দুইপাশে দুইটা মাইন মাঝে একটা ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করা। তারটা ছদ্মবেশী, তাই দেখা যায়না। তারের সাথে লাগলেই মাইনটা এক্সপ্লোজড করবে। তো আমাদের মাঝে আলোচনা হলো যে এ মাইনগুলোতে আর্মিও মারা যাবেনা, রাজাকারও মারা যাবেনা। মারা যাবে আমাদের গ্রামের সাধারন মানুষ। তাই আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হলো যে এই মাইনগুলোকে আমরা ডিজার্মড করবো। আমরা ওখানে ৮ জনকে পাঠালাম। সেই ৮ জনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও ৫-৬ জনকে পাঠানো হলো গ্রামের মধ্যে পেট্রলিং করতে, যাতে গ্রামে আর্মি বা রাজাকার থাকলে সতর্ক করতে পারে। আর আমরা ৪ জন রাস্তার

পাশে পাহারা দিচ্ছি। আমি আর কালাম রাস্তার এই পাশে একটা খড়ের গাদার আড়ালে বশে আছি। আমাদের কখনই মনে হয়নি যে আর্মি বা মিলিশিয়া আসতে পারে। একদম নির্ভয়ে ছিলাম আমরা। প্রায় বারোটার দিকে হঠাৎ করে আমরা রাস্তা দিয়ে বুটের আওয়াজ পেলাম। আমরা খুব ঘাবড়ে গেলাম যে কি হচ্ছে এটা! আমরা আড়াল থেকে দেখলাম যে ১৫-২০ জন লোক খাকি পোশাক পড়া অস্ত্র হাতে এদিকে আসতেছে। আমি কালামের দিকে তাকিয়ে আছি। কি করা উচিৎ এখন? আমি যেন এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ওদেরকে দেখে মনে হলো যেন আমার আত্মাটা উড়ে গেলো। হতবিহ্বল হয়ে গেলাম আমরা। আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আজ আমার জীবনের শেষ দিন। একটুপরেই আওয়াজ পেলাম, "বাড়ীওয়ালা, এ বাড়ীওয়ালা। বাড়ীওয়ালা, এ বাড়ীওয়ালা। তখন কিন্তু আমি ভয়ে প্রায় প্রস্রাব করে দেয়ার মত অবস্থা। তারা হয়ত আমাদের থেকে খুব বেশি হলে ১০-১৫ গজ দূরে ছিলো। কালাম আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "গুলি চালা। আমি চোখ বন্ধ করেই মোটামুটি আমার স্টেনগান থেকে এলোপাতারি গুলি ছুঁড়তে শুরু করলাম। কাকে মারলাম, কোথায় মারলাম, আমার কোনো কিছু খেয়াল নেই, শুধু মাত্র ফায়ার করে আমার ম্যাগাজিন খালি করে দিলাম। এরপরই শুনতে পেলাম আশেপাশের জায়গা থেকে "জয় বাংলা শ্লোগান আসছে। লোকজনের আওয়াজ। আমি তখনও বুঝতে পারছিলামনা যে কি হইছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছিলাম কিছু কিছু বুটের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আমরা দাড়িয়ে দেখলাম যে ওখানে প্রায় ৮-১০ জন পাকিস্তানি আর্মি পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে তারা পাকিস্তানি আর্মি না, তারা হলো মিলিশিয়া। ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস। ওদের জামার কলারে লিখা রয়েছে। ওদের সাথে আবার কয়েকজন বাঙ্গালিও ছিল। এরমধ্যে আমার কমান্ডার চলে আসলো। গ্রামবাসী তো ওদের পিটিয়ে মেরে ফেলতে চাইলো কিন্তু আমার কমান্ডার বলল যে, খবরদার! কারও গায়ে হাত দেয়া যাবেনা। কারণ আমাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, প্রীজনার্স অফ ওয়ার বা যুদ্ধবন্দী আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান। আপনি দেখবেন যে, ইসরাইলী ১ জন সেনার বদলে ওরা ১১০০ ফিলিস্তিনিকে ছেড়ে দেয়। তো ওখানে আমরা ৬ জনকে ইঞ্জিউরড পেলাম। আর বাকি ৫-৬ জন মারা গিয়েছে। তো আমরা তাড়াতাড়ি গ্রামের লোকজনকে নিয়ে ঐ মৃতদের কবর দিয়ে দিলাম। আর বাকি আহতদের নিয়ে আমরা ইন্ডিয়া চলে

আসলাম। এখানে বেশি সময় নষ্ট করা যাবেনা কারন পাকিস্তান আর্মি স্পীডবোট বা হেলিকপ্টারে করে চলে আসতে পারে। ওদের মাঝে লোকালি একজন ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিলো, তার মাধ্যমে ফাষ্টএইড দিয়ে ব্যান্ডেজ কমপ্লিট করে তাড়াতাড়ি আমরা ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাই। আর আমি ওখান থেকে, যেহেতু আমার ছুটি, আমি লঞ্চে করে সদরঘাট চলে আসলাম। খুব সম্ভবত সেটা ২রা সেপ্টেম্বর ছিলো। সদরঘাটে পৌঁছাবার পর আমার মনে হচ্ছিলো যেন সবাই আমাকে ফলো করছে। এই বোধহয় আমাকে ধরে ফেলবে। একটা রিক্স নিলাম। সদরঘাট থেকে রিক্সায় করে চকবাজার হয়ে বকশীবাজার আমার বাসায় গেলাম। তখন আমার মনে হলো, আমরা কিসের জন্য যুদ্ধ করতেছি? সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ আমার কাছে ঢাকা শহর মনে হয়েছে সম্পূর্ন স্বাভাবিক। দোকানপাট খোলা, বাজার খোলা, সবকিছু খোলা। আমার বন্ধুরা এসএসসি পরীক্ষার্থী। সবাই পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টও পেয়ে গেছে। কিন্তু আমিতো পরীক্ষা দেইনি। আমাদের কি হবে? আমাদের ভবিষ্যৎ কি? খুবই হতাশ হয়ে গেলাম। বাসায় আসলাম। আসার পর, আমার কাজের ছেলে আমাকে চিনতে পারেনা, আমার চুল বড় হয়ে গিয়েছিলো। চেহারার পরিবর্তন হয়েগেছে, কালো হয়ে গেছি। ঘরের বাইরে কোথাও যাইনা। এরমধ্যে আমার বড়ভাই একরামুল্লাহ চৌধুরীও চাচাতো ভাই শওকত আলী চৌধুরী কাঞ্চন, যার বাবা কলকাতাতে থাকতেন, ওনারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কবে যাবে?" আমি বললাম যে, আমাকে তো ৭ দিনের ছুটি দিছে। ওনারা বললেন, "আমরাও তোমার সাথে যাবো।" পরিকল্পনা হলো। আমি আর এবার ঘর থেকেই বের হইনি। কারন কোথায় ওদের গুপ্তচর আছে, কে জানে? তো ওনারা আমার সাথে রওয়ানা দিলেন। এবার আমরা নরসিংদী দিয়ে ত্রিপুরার সোনামুড়া এলাকা দিয়ে ভারতে যাই। এবং ওখানথেকে আমি ওনাদের নিয়ে মেলাঘর ক্যাম্পে আসি। এসে আমার ক্যাম্পের যিনি ইনচার্জ, ওনাদের সাথে কথা বললেন। আমার ভাইয়েরা বললেন যে, আমরা মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাই, কিন্তু এখুনই নয়। আগে আমরা একটু কলকাতা থেকে ঘুরে আসি। আমার ভাই আর ওরা চলে গেলো কলকাতায়। ওনারা অক্টোবরের দিকে আমার ক্যাম্পে আসলেন। এসেই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংএ অংশগ্রহণ করলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ওনাদের ট্রেনিং শেষ। এরমধ্যে মোটামুটি যুদ্ধের ইন্টেন্সিটি বাড়তেছে। আমার খবর পেলাম যে, ইন্ডিয়ানরাও এটাকে দ্রুত শেষ করতে চাচ্ছে। এবং

আমাদের রেগুলার যে বাহিনী ছিলো, তারাও অনেক ইকুয়িপড হয়েছেন। আমরা একটা গ্রুপ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা দেশের ভিতরে চলে গেছে। অল্পকিছু লোক যারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলেন, তাদের নিয়ে একটা গ্রুপ করা হলো। আমাদের গ্রুপে প্রায় ১৪-১৫ জন পাওয়া গেলো যারা ঢাকা শহরের। এবং আমার কাঞ্চন ভাই যেহেতু উনি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলেন, ওনাকে লিডার বানানো হলো। কাঞ্চন গ্রুপ নাম দিয়ে আমাদের গ্রুপ হলো। আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হলো যে আমরা ঢাকা শহরে ঢুকবনা। শহরের বাইরে থেকে পাকিস্তান আর্মি যাতে শহরের ভেতরে ঢুকতে না পারে, সেদিকে বাঁধা সৃষ্টি করবো। এভাবে প্ল্যান করে নভেম্বরের সেকেন্ড উইকের মধ্যেই আমরা বাংলাদেশে পৌঁছে গেলাম। নবাবগঞ্জের পাড়া গ্রামে আমরা মুক্তিযোদ্ধা টিম নিয়ে আসলাম। ওইখানে আরেকটা গ্রুপ ছিল, মোশাররফ গ্রুপ। উনারা প্রায় ৩০ জনের অধিক সদস্য নিয়ে অনেক বড় একটা গ্রুপ। ওই গ্রুপের কমান্ডার মোশাররফ ভাই, উনি বুয়েটের মেকানিক্যালের থার্ড কিংবা ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট ছিলেন। উনার সাথে উনার আরো দুই ভাই ছিল। এক ভাই ছিল মোয়াজ্জেম, সে ঢাকা কলেজে পড়তো। আর তার ছোট ভাই ছিল মনির সে আমার সাথে এসএসসি পরীক্ষার্থী, ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়তো। তাদের বাবা ছিল পুলিশের এসপি। তখন ওইখানে পাড়া গ্রামে থাকা অবস্থায় মোশাররফ ভাই আমাদের গ্রুপ লিডার কাঞ্চন ভাই কে বললেন, "কাঞ্চন ভাই, যেহেতু আপনারা গ্রুপ ছোট, ছোট ছোট গ্রুপের উপরে হামলা হয়। আপনাদের উপরে যদি হামলা হয়, তাহলে আপনারা কি করবেন? ভালো হয় যদি আপনারা আমাদের গ্রুপে যোগ দেন। তাহলে আমরা একটা বড় গ্রুপ হয়ে যাব, আমাদের শক্তিও বেড়ে যাবে।" কথামত আমরা মোশারফ গ্রুপে যোগ দিলাম। এবং ডিসেম্বরের ফাস্ট উইক পর্যন্ত আমরা পাড়া গ্রামে ছিলাম। ওখানেই আমরা পেট্রোলিং করেছি। ওখানে তেমন আর্মি ছিল না। এরপর ইন্ডিয়ান আর্মি যখন যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করে, তখন আমরা ওখান থেকে মোহাম্মদপুরের উল্টো দিকে বসিলা, ওখানে আমরা এসে ক্যাম্প করি। এখন আমরা সম্মুখ যুদ্ধের যে টেকনিক, সেটা অনেকটা রপ্ত করে নিয়েছি এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে যে গেরিলা আক্রমণ থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। এজন্যে আমরা ওই এলাকাতে ফিজিক্যাল বাঙ্কার করি। আমাদের হাতে যে এসএমজি বা এলএমজি ছিল,

সেগুলো দিয়ে আমরা এলাকায় পাহারা বসিয়েছি। এবং আমরা কিছু জায়গায় এন্টি পার্সোনাল মাইন বসিয়েছি যাতে করে আমাদের কাছে কেউ না আসতে পারে। পিছনের দিকে আমরা দুইটা পোস্ট করি যাতে পিছন দিক থেকে কোন আর্মি পালিয়ে এসে আমাদেরকে আক্রমণ করে, তাহলে তো আমরা ধরা পড়ে যাব। সে ভাবে আমরা একটা বস্ক করে যেটাকে একটা বস্ক ডিফেন্স সিস্টেম বলা যায়, এরকম করে আমরা আছি। ডিসেম্বরের ১৩ থেকে ১৪ তারিখের দিকে আমরা পাকিস্তানি একজন লেফটেনেন্ট সহ দশজনকে অ্যারেস্ট করি। সেই লেফটেন্যান্ট এর নাম ছিল আফতাব বালুচ, আমার যতটুকু মনে পড়ে। যেহেতু আমাদের কাছে যুদ্ধবন্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাদেরকে অ্যারেস্ট করে আমরা রেখে দিলাম। এরপর ১৬ তারিখ বিকেল বেলা ঢাকা রেসকোর্স যেটা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তখন আমাদের কাছে দিকনির্দেশনা আসলো আমরা যেন আজকে ঢাকা শহর ক্রস না করি। ১৬ তারিখ রাত ১২ টার আগে কোনো অবস্থাতেই যেন ঢাকা শহর ক্রস না করি। ১৬ তারিখ রাত দেড়টা থেকে দুইটার দিকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা ঢাকা শহরে ঢুকে যাব। সেখানে আমরা বড় বড় দুইটা নৌকা জোগাড় করলাম। একটা নৌকাই সেই দশজন যুদ্ধবন্দী সাথে চার পাঁচজন পাহারাদার রাখলাম, আরেকটা নৌকাতে আমরা সবাই উঠে গেছি এবং আমি যেহেতু সুইমিং প্লাটুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলাম, আমিতো জানি যে পানির সাথে ব্যবহার কিভাবে করতে হয়। আমি আমার পিঠের হেভারসেকের ভিতরে আমার এ্যামোনিশন বেল্টটা রাখলাম। এবং আমার অস্ত্রটা একটা চাদর দিয়ে ভালো করে গিট দিয়ে রেখেদিলাম। তো আমরা নদী পার হচ্ছি, মাঝ নদীতে আমাদের নৌকাটা হঠাৎ করে ডুবে গেল। কি কারণে ডুবে গেল বুঝতে পারলাম না, ওভারলোড এর কারণে হতে পারে। যাহোক আমি আমার অস্ত্রসস্ত্র নৌকাতে রেখে লাফ দিয়ে নেমে গেলাম। পানিতে নামার পরে আমি দেখতে পেলাম কেউ কেউ আমার পা ধরে টানাটানি করছে, আমি লাথি মেরে ছাড়িয়ে কোনরকমে এপারে আসলাম। তখন তো প্রচুর ঠান্ডা, শীতে জমে যাওয়ার মত অবস্থা। ভোরের দিকে যখন আলো ফুটলো তখন খুজতেছি কে আসলো কে আসতে পারল না। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা। খানিক পরে আমি আমার ভাইকে দেখতে পেলাম। এবং এর খানিক পরে আমরা দেখতে পেলাম যে

আমাদের মাঝে ১১ জনের কোন খোঁজ নেই। কিন্তু কোন ১১ জন সেটা বলা যাচ্ছে না। তো যাহোক, এর ভিতরে কারা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়েছে আমি জানিনা। ফায়ার সার্ভিস আসলো। আমি তাদেরকে স্যালুট করি যে ওই সময়টাতেও তারা অ্যাক্টিভ ছিলো। এরপর আশেপাশের লোকজন এসে প্রথমে ডুবে যাওয়া নৌকাটাকে উঠালো। নৌকাতে আমার চাচাতো ভাই শওকত আলী চৌধুরী কাঞ্চনের বডি পাওয়া গেছে। ওই নৌকাতে আমার অস্ত্র, আমার ব্যাগ সব কিছু পাওয়া গেছে। যেহেতু আমি আমার অস্ত্র ফিরে পেয়েছি, সেহেতু আমি আবার কনফিডেন্স ফিরে পেলাম। তারপর দুপুর বারোটা নাগাদ অন্য সকল ডেডবডি গুলোকে উদ্ধার করা হলো। বাইরে ১০টা ডেডবডি পাওয়া গেছে, টোটাল ১১ জন। সেদিন আমাদের ১১ জন সহযোদ্ধা শহীদ হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের যে কমান্ডার মোশাররফ ভাই তার যে ছোট দুই ভাই, তারা কিন্তু ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র এবং সাব জুনিয়র সুইমিং চ্যাম্পিয়ন ছিল। কষ্ট লাগে যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়ন, তারাও কিন্তু মারা গেলো। আপনারা যদি ঢাকার নতুন আজিমপুর কবরস্থানে যান, সেখানে গেট দিয়ে ঢোকার প্রথম হাতের ডানে তাদের ৯ টা কবর আছে। শান্ত মরিয়ম ফাউন্ডেশনের শান্ত, সুন্দরবন কুরিয়ার এর মালিক, সে ঐ কবরগুলোকে বাঁধাই করে পাকা করে দিয়েছে। আর একটা কবর হচ্ছে মুনীরের, তাকে পলাশীতে কবর দেয়া হয়েছিল। আর বাকি একটা লাশকে মৌচাকের মোড়ে কবর দেয়া হয়েছে। এই হল ১১ জন। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে যখন সবাই আনন্দ করছিল, তখন আমরা আনন্দ করতে পারিনি। আরেকটা কথা আমি বলি, তা হল এখানে আমি অনেক কিছু বলতে পারিনি অনেক কিছু মিস করে গিয়েছি মনে না থাকার কারণে, আমরা যারা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম, আমরা কিন্তু কোন কিছু পাওয়ার আশা করে যুদ্ধ করতে যাইনি। কোন স্বার্থের জন্য যাইনি। যেহেতু আমরা চোখের সামনে দেখেছি আমাদের মা বোনদেরকে হত্যা করা হয়েছে, আমাদের ভোটের অধিকার, আমাদের শাসন করার অধিকার সবকিছু নিয়ে নিয়েছে। আমরা তাদের গোলাম হয়ে গিয়েছিলাম। এগুলোর বিরুদ্ধে যে একটা বিদ্রোহ, সেই ক্ষোভ থেকে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাই দুই লক্ষ দশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়, যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে তাদের সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ হাজারের বেশি হওয়ার কথা নয়। আর যারা সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা, যারা ডাক্তার ছিলেন,

যারা গায়ক ছিলেন, যারা ফুটবলার ছিলেন, যারা অফিস চালিয়েছেন তাদের সংখ্যা হয়তো আরো ২০-৩০ হাজার হতে পারে, কিন্তু আমাদের অনেকেরই ভুলে, অনেকেরই লোভের কারণে আজকে এত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গিয়েছে। তবে আমি এখনো মনে করি যে এই সংখ্যাটা যাচাই করা প্রয়োজন। সত্যি কথা। আমি যেমন কি একটা জিনিস বলতে চাই যে ১৯৭১ সালে দুইটা পরীক্ষা হয়েছিল, এসএসসি এবং এইচএসসি এবং আমার হিসাব মতে শতকরা ৮৫ ভাগ ছাত্র সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা তো মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধাদের নাম তাদের বাবার নামের সাথে মিলিয়ে নিন। এখনতো কম্পিউটার সিস্টেম রয়েছে। ওগুলো ম্যাচ করা যায়। দেখেননা, একই নামে ১০-২০ টা পাওয়া যেতে পারে। তাহলে তো বুঝা যাবে, যারা ৭১ সালে পরীক্ষা দিয়েছে, তারা কেন মুক্তিযোদ্ধা হবে? আমি একটা জিনিস বলতে চাই, এই দেশটা কিন্তু যদি কেউ বলে মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন করেছে, এটা ঠিক না। আমরা সবাই মিলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিরা স্বাধীন করেছি। কারণ কিছু পাকিস্তানি লোক ছাড়া আর সবাই বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। যেমন এখন একটা কথা খুব চালু রয়েছে, "রাজাকার, রাজাকার।" আমি কিন্তু রাজাকার শব্দটা শুনলে খুব কষ্ট পাই না, কারণ এই রাজাকার কারা ছিল? এই রাজাকার আমার ভাইয়েরাই ছিলো। কারণ পাকিস্তানি আর্মি লোকাল চেয়ারম্যান কে বলতো, তোমার দশটা ছেলে দিতে হবে। তাদেরকে দিয়েছেন, তারা অস্ত্র-রাইফেল দিয়ে সাতদিনের ট্রেনিং করেছে, মাসে ২০ থেকে ২৫ টাকা বেতন পেতো। তারা কি সবাই মানুষ মেরেছে? এই রাজাকাররাই তো আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছে। রাজাকাররাই তো আমাদেরকে হেল্প করেছে। এই রাজাকাররাই তো আমাদেরকে কুমিল্লা ব্রক্ষানবারিয়া রোড পার করিয়ে দিয়েছে। এরাতো মুক্তিযুদ্ধের জন্যই কাজ করেছে। সব রাজাকারেরা কি খারাপ নাকি? আমরা সবকিছু ঢালাও ভাবে বলি। এটা ঠিক না। কারণ আমরা যদি বলি মুক্তিযোদ্ধা আর যারা ইন্ডিয়াতে গিয়েছে তারা এদেশ স্বাধীন করে ফেলেছে, এটা মিথ্যে কথা। এই যে আমার দেশের লোকজন যারা আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, খাবার দিয়েছে, যারা আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছে, তারা যদি এটা না করতো, আমরা জীবনে সাকসেসফুল হতে পারতাম না। আর আমি যেটা মনে করি, আমাদের মেজরিটি মুক্তিযোদ্ধা হলো গ্রামের কৃষক শ্রমিক ছিল, গ্রামের ছাত্ররা ছিল, এদের

অনেকেরই বর্তমানে অবস্থা খারাপ। তাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। ঠিক আছে তাদেরকে ভাতা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু কথা হলো সবারতো এটার প্রয়োজন নেই। যেমন আমার ব্যক্তিগতভাবে ভাতার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ভালো আছি। আমি যে কাজটা করি, আমার ঐ ভাতার টাকা দিয়ে আমি অন্য লোকদের সাহায্য করার চেষ্টা করি আর আমি যেটা মনে করি, এই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে। আপনি আমাদেরকে এমআইএস-এ নাম দিয়ে দিয়েছেন, সার্টিফিকেট দিয়েছেন, ডিজিটাল সনদ দিবেন, অনেক কিছু করবেন কিন্তু আমি একজন ফ্রিডম ফাইটার, আমি যদি একটা কার্ড দেই, সেই নেমকার্ড দেখে আপনি কি বুঝতে পারবেন যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা? আমি যদি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিখি, এটা নিয়ে আপনার মনে সন্দেহ হতে পারে, এতো বীরমুক্তিযোদ্ধা নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যদি একটা পদক দেওয়া হয়, যেমন শান্তিকালীন পদক পুলিশে রয়েছে, বিপিএম, পিপিএম, বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল, প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল, সেনাবাহিনীতে রয়েছে অনেক রকম শান্তিকালীন পদক রয়েছে। অপারেশনাল পদক রয়েছে, বীর প্রতীক, বীর বিক্রম, বীর উত্তম, বীর শ্রেষ্ঠ। যেহেতু আমরা অপারেশন করেছি, আমাদেরকে যদি একটা পদক দেয়া হয়, একটা পদক তৈরি করতে কত টাকা খরচ? ১০০০ টাকাই লাগুক। এবং আপনি যদি পদকটার নাম মুক্তিযোদ্ধা গৌরব পদক, বিজয় গৌরব পদক, এরকম বিভিন্ন নাম হতে পারে। একটা পদক দেন যেই পদকের এব্রিভিয়েশন আমি নামের শেষে ব্যবহার করতে পারব। তাহলে আমার কার্ডে যদি সেটা লেখা থাকে বা আমার নেমপ্লেটে যদি এটা লেখা থাকে, তাহলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, ইনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। এটা সরকার চাইলে করতে পারে, এটার জন্য সরকারের খুব বেশি টাকার প্রয়োজন নাই। বিশ-ত্রিশ কোটি টাকা হলেই হবে। আমি বলি না যে, আমাদেরকে সেই পদকের জন্য কোনো এক্সট্রা টাকা দেন। আপনি ভাতা তো দিচ্ছেন। সুতরাং কোনো এক্সট্রা টাকার দরকার নেই। আপনি আমাদের একটা পদক দেন এবং যদি আপনি মনে করেন এই পদকটা দুই রকমের করতে পারেন, যারা সসস্ত্র সংগ্রাম করেছে তাদেরকে একরকমের দিতে পারেন, আর যারা সহযোগী ছিল তাদেরকে আর একরকম পদক দিতে পারেন কিন্তু আমি জানি না এই সিস্টেমে আমরা এই দুই লক্ষ দশ হাজারের ভিতর সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা বা

অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধা, নন অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে কোনো ভাগ করা হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। সেটা করা উচিত। আর আমি নতুন প্রজন্মকে বলবো যে, তোমাদের বাবা, চাচা, দাদা, নানা, মামা, ফুফু যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, সেটা তোমাদের জন্য একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, একটা নতুন ভবিষ্যতের জন্য, একটা নতুন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে শ্রদ্ধা কর, তাদের কথা স্মরণ কর, কারণ আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক চমৎকৃত ঘটনা রয়েছে, অনেক সুন্দর ঘটনা রয়েছে, অনেক দুঃসাহসিক ঘটনা রয়েছে, সেগুলো যদি তারা পড়ে জানে, তাদেরকে সম্মান করে, তাহলে দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।



যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা লেঃ এম.এ. ওয়াদুদ (অবঃ)

আমি ১৯৬৬ সালে তুলারাম কলেজের ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি এবং তুলারাম কলেজ সংসদের বাবু সারোয়ার প্যানেলের এজিএস নির্বাচিত হই। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার পর ৭ই জুন আমরা যখন মিছিল বের করি সেই মিছিলে পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত হয়। এরপরে বাবু, সরোয়ার এবং আমি সহ প্রায় তিন হাজার ছাত্র ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়। শুরু হয় পুলিশের বিভিন্ন হয়রানি এর পূর্বে সাবেক গভর্নর মুনা ভাইয়ের গাড়িতে ইট মারার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা হয়। এই সমস্ত হয়রানির হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি তখন আমার এক নিকট আত্মীয়র বাড়িতে থাকতাম, তিনি তৎকালীন সরকারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে ছিলেন। একসময় তার সাথে আমার বিভিন্ন মতের অনৈক্যের কারণে আমি তৎকালীন ছাত্র নেতাদের নির্দেশক্রমে প্রথমে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে ১৯৬৭ সালে যোগদান করি, সেখান থেকে আমি করাচি বোর্ডের অধীনে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করি। পরবর্তীতে আমি ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হই। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেখানে আমি প্রশিক্ষণ লাভ করি এবং মিলিটারি সাইন্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করি। সৌরভ অনারে আমি ভূষিত হই। এরপরে আমি লেফটেন্যান্ট পদে সিন্দু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ ডিভিশনের আলিয়া ক্যান্টনমেন্টে যোগদান করি। সেখানে থাকা অবস্থায় দেখলাম ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়েছে এবং সেখানকার বিভিন্ন খবরে বুঝতে পারলাম জনগণের প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান

ক্ষমতা দিতে বিভিন্ন পায়তারা করছে। তখন আমি, লেঃ দিদার আলম, লেঃ মাহবুবুর রহমান এবং কৃত্তি রঞ্জন চাকমা আমরা চার জন প্যারা ট্রুপিং কোর্সে প্রশিক্ষণ করিতেছিলাম। সে সময় আমরা চারজন পরামর্শ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে চলে আসি।

৩রা মার্চ বাংলাদেশে তখন উত্তাল আন্দোলন ঐদিন সংসদ বসার কথা ছিল, সংসদ না বসার কারণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, সেই অসহযোগ আন্দোলন থেকেই ৭ই মার্চের ভাষণ হলো। ৭ই মার্চের ভাষণই বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে সকল প্রকার দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। যেমন বলেছিলেন আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা যার কাছে যা আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করবে। যে পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাবানার বাহিনী হাত থেকে বাংলাদেশ মুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আমার বাড়ি চাঁদপুর জেলার বর্তমান মতলব উত্তর থানায়। আমি আমার এলাকায় চলে আসি, আমার কোর্সমেডরাও যার যার এলাকায় চলে যায়, আমি এলাকায় এসে আমাদের বিভিন্ন বাহিনীর তে চাকরি করা লোকদেরকে নিয়ে একটি ট্রুপস গঠন করি এবং তখনকার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বিভিন্ন স্কুল ও বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। প্রথমে মতলব উত্তরের দুর্গাপুর ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে তত্কালীন ভিক্টোরিয়া কলেজের জিএস সাবেক প্রতিমন্ত্রী নূরুল হুদা সাহেবের সহযোগিতায় আমি এক মতবিনিময় সভা করি। সেখানে ছাত্র ছাত্রীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করি, যার ফলশ্রুতিতে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে মতলব উত্তর থেকে প্রায় দুইশত যুবককে প্রথম আগরতলা তে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাতে সক্ষম হই। তারা প্রথম ওমপি নগর থেকে ট্রেনিং করে এফ এফ বাহিনীর হিসেবে মতলবে প্রবেশ করে। এর পূর্বে ২৭শে মার্চ তত্কালীন সংগ্রাম কমিটির ফ্লাইট লেঃ এ বি সিদ্দিকী সাহেব যিনি ৭১ এ এমপিএ ছিলেন, তার নেতৃত্বে চাঁদপুর মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তিনি আমাদের সকলকে চিঠি দিয়ে বললেন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ইপিআরের এর যে যেখানে আছে সে যেন চাঁদপুরের মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। আমরা ২৮ শে মার্চ চাঁদপুর গিয়ে রিপোর্ট করি চাঁদপুর মহিলা কলেজে তার নেতৃত্বে আমরা তিনজন আর্মি অফিসার আমি, লেঃ দিদারুল আলম ও লেঃ মাহবুবুর রহমান এবং আরো অনেক এনসিও এবং অন্যান্য জনবল মিলে তিন

শতাধিক লোক নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন হয়। ১৯৭১ এর ৭ই এপ্রিল সকাল ১০ টার দিকে পাকিস্তান বিমান চাঁদপুরে আক্রমণ চালায়। পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় একটা পেট্রোল পাম্পে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় তখন একজন বৃদ্ধ মহিলা মারা যায়। ঐদিনই বিকালে দিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে সাঁজোয়া বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং অন্যান্য সুসজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চাঁদপুর দখলের উদ্দেশ্যে চাঁদপুরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। পথিমধ্যে তাদেরকে সংগ্রামী জনতা বাধা দেয় সংগ্রামী জনতার বাধা অতিক্রম করে তারা চাঁদপুরের অদূরে টেকনিক্যাল হাইস্কুলে এসে ক্যাম্প স্থাপন করে। ঐদিন সারারাত তারা তাদের আধুনিক অস্ত্র থেকে গোলাবর্ষণ করতে থাকে চাঁদপুর শহরের উপর। তাদের টার্গেট এবং আমাদের অবস্থান সঠিক না হওয়ার কারণে তাদের সমস্ত গোলা মেঘনা নদীর উপরে পড়ে যার ফলে আমরা বেঁচে যাই। এরপরে আমরা তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য তিন দিক থেকে আক্রমণ করি। সেদিনের সেই যুদ্ধ সারারাত্র চলে তারপর সকাল ৯ টা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাই এক পর্যায়ে আমারা গোলাবারুদের অভাবে চাঁদপুর ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

৮ ই এপ্রিল পাকিস্তান বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় চাঁদপুরে ঢুকে পড়ে, আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল চাঁদপুর পতন হলে ফরিদগঞ্জ উপজেলার পাইকপাড়া হাই স্কুলে আমরা সকল মুক্তিযোদ্ধারা আবার একত্রিত হবো এবং সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ সেখানে থাকবেন। তৎকালীন চারজন এমএনএ ছিলেন সংগ্রাম কমিটির উল্লেখযোগ্য মিজানুর রহমান চৌধুরী, ওয়ালীউল্লাহ নওজোয়ান, এডভোকেট আব্দুল আউয়াল ও হাবিবুর রহমান। এমপিএ ছিলেন মতলবের গোলাম হোসেন ফারুক এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবি সিদ্দিকী সাহেব। চাঁদপুর সদরে আব্দুল করিম পাটোয়ারী, হাজীগঞ্জ এর ডাঃ আব্দুল ছাত্তার, ফরিদগঞ্জ এর জনাব রাজা মিয়া এনাদের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটির পরিচালিত হতো। ১০ ই এপ্রিল আমারা সেই পাইকপাড়া হাই স্কুলের প্রশাসনিক ভবনে একটা মিটিং এ সমাবেত হই।

ঠিক সেই সময়ই সকাল ১০ ঘটিকায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছে। এই সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং উপ রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন জনাব তাইজুদ্দিন আহমেদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্দী থাকার কারণে উপরাষ্ট্রপতি ই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত

হন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সমাজসেবা মন্ত্রী ছিলেন এ এস এম কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন কুখ্যাত খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, তার পরবর্তীতে সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন জেনারেল এম এ জি ওসমান সাহেব। তাদের শপথ অনুষ্ঠান হয় বৈদ্যনাথ তলায় আম্র কাননে ১৭ এপ্রিল।

এবার মুক্তিযুদ্ধের যাত্রা সারা দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় প্রবাসী সরকারের অধীনে।

সেপ্টেম্বর এর ২৬ তারিখে আমরা বাগানবাড়ি ইউনিয়নে একটি জাহাজ আক্রমণ করি, সেই জাহাজটিতে দাউদকান্দি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাচ্ছিল। সেই জাহাজটি আমরা দখল করতে সক্ষম হই এবং সেই জাহাজ থেকে যে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাই তা দিয়ে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাই। এবং এই অস্ত্র দিয়েই আমরা পরবর্তীতে বেশকিছু সম্মুখ যুদ্ধে জয় লাভ করি। আমাদের এই অঞ্চলে এফএফ , বিএলএফ এবং সকল মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিত ভাবে কাজ করেছি। যেহেতু আমি সেনা অফিসার ছিলাম অনেকের থেকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমার বেশি ছিল। আমরা দখল করেছিলাম ওই জাহাজটা নিয়েই আমি মেঘনা নদীতে পেট্রোল করতাম এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। এরপরে আমরা আরেকটি জাহাজ দখল করেছিলাম যেটা দিয়ে আমরা খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাই। উনিশে নভেম্বর রাতে আমি যখন পেট্রলিং করে এসে সুজাতপুর ক্যাম্পে ভোর চারটার দিকে বসলাম, আমার ওয়ারলেস সেটে একটা কল আসলো। কথাটা ছিল এরকম যে, যদি কোন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে শুনতে পান, আমাকে অ্যাটেন্ড করেন। যেহেতু সারারাত পেট্রলিং করেছি একটু অলস অবস্থায় ওয়ারলেস ধরলাম, আমি বললাম আমি মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্ট অমুক বলছি আপনি বলেন। তিনি বললেন ছয়টা পাকবাহিনীর লড়ি দাউদকান্দি হয়ে গোয়ালমারীর দিকে যাচ্ছে। আমরা টাওয়ার থেকে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা যে যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা আছেন এবং আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন তারা তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করুন। মেসেজ পাবার পরে আমি আমার ট্রুপস নিয়ে আমার দখল করা জাহাজে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রওনা দিলাম গোয়ালমারির দিকে। আমি তখন ম্যাপে দেখলাম তাদের আসার পথে একটা ব্রীজ আছে জামালকান্দি ব্রীজ, সেটা পার হয়ে তাদের আসতে হবে। যেহেতু সামরিক বিজ্ঞানে আমি লেখাপড়া করেছি তাই আমি সেই মোতাবেক গোয়ালমারী বাজারের পশ্চিম দিকে একটি পয়েন্টে পজিশন নিলাম।

আমার বাহিনীকে আমি তিন ভাগে বিভক্ত করলাম। একটা বাহিনীকে আমি জামালকান্দি বাজারের দিকে দিলাম, আরেকটা বাহিনীকে আমি গোয়ালমারী বাজারের দিকে দিলাম, আর একটা বাহিনীকে ব্রীজটার মধ্যে পজিশন নেয়ালাম। আমি আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীকে খবর দিয়ে আমাদের সাথে সংযুক্ত করলাম। যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে কে আসলো কে না আসলো এত কিছু দেখার সময় নেই কিন্তু একটা সময় দেখতে পেলাম চতুর্দিক থেকে আমার খবর পেয়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধারাই অংশগ্রহণ করেছে এই আক্রমনে। তুমুল যুদ্ধ চলছে। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল অনেকে অংশগ্রহণ করায় কিন্তু তাদের শক্তি ছিল সীমিত তারা যা আসছিল তাই ছিল। এই যুদ্ধটা ছিল এই এলাকার সবথেকে বড় ঐতিহাসিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ৬ জন শাহাদাত বরণ করেন, তার মধ্যে আমার পরিচিত দাউদকান্দি বাড়ি সে আমার কাছে থেকেই শাহাদাত বরণ করেন। আমার পাশ থেকে সে যখন পড়ে যায় গুলি খেয়ে তখন তার লাশটা আমরা পিছনের দিকে সরিয়ে দিলাম। সেখানে যে পোস্টটাতে আমি ছিলাম সেটাকে খন্দকার বাড়ি বলে গোয়ালমারী বাজারের পশ্চিম দক্ষিণ কোনায় বাড়িটা। সেখানে বড় একটা আম গাছের নিচে পোষ্টটা করেছিলাম। আমি আমার অন্যান্যদের যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছি তারা সেভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। একটা সময় আমরা খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। সকালে আমরা কেউই খাই নাই দুপুর গড়িয়ে গেছে তাই অনেক ক্ষুধার্ত। যেহেতু দিনটা ছিল ঈদের দিন সেই ঈদের দিনের সেমাই রুটি ওই এলাকার জনগণ আমাদের মুখে ধরছিল আমরা খাচ্ছিলাম আর হাত দিয়ে অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করছিলাম। এই যুদ্ধের মধ্যে আমাদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের এইভাবে খাওয়াতে লাগলো। সেদিনের জনগণের সেই খাবার খাওয়ানোই প্রমাণ করে এটা জন যুদ্ধই। আমরা ট্রেনিং প্রাপ্তরাই শুধু যুদ্ধ করি নাই জনগণও আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে কিন্তু তাদের প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন। দীর্ঘ সময় যুদ্ধ চলার পরে এক পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দিল। সেটা ছিল ৫৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। যেহেতু যুদ্ধটা ছিল সম্মুখ যুদ্ধ তাই তারা জানতে চাইল এখানে সেনাবাহিনীর কেউ আছেন কিনা। তখন আমি আমার পূর্বের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিচয় দিলাম। পাকিস্তানিদের নেতৃত্বে ওখানে ছিল মেজর আল-আমিন। সে বলল ঠিক আছে আমরা স্যারেন্ডার করব। আমাদের মধ্যে সফল কথা বার্তা ইংরেজিতে হচ্ছিল। যেহেতু পাকিস্তানিদের আমরা চতুর দিক দিয়ে ঘিরে ফেলছিলাম তাই তাদের আর

কোনো উপায়ও ছিল না। আর আমি তাদের খুব ভিতরেই ছিলাম আমার বাহিনী নিয়ে। যখন পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আমাদের আলোচনা চলছে, প্রায় সাড়ে চারটা বাজে তখন, তখন একটা পাঞ্জাবি আমাকে টার্গেট করে গুলি করে তার একটা গুলি আমার ডান কাঁধে সামনে দিয়ে ঢুকে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। আর একটা গুলি করে আমার চোয়াল দিয়ে ঢুকে দাঁত নিয়ে বের হয়ে যায়। আরেকটা গুলি আমার হাতে লাগে। এবং তিনটা গুলি পায়ে লাগে। তখন আমি বুঝতেও পারি নাই যে আমার গায়ে গুলি লাগছে। আমার দিকে যখন গুলি করছে তখন আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে আমি তখন এলএমজি দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করেছি। তখন তারা ফ্লাগ উড়িয়ে দিল সারেন্ডার করার জন্য। ফ্লাগ দেখে যখন আমার উত্তেজনা কমছে তখন অনুভব করলাম আমার শরীরে চিন চিন ব্যাথা করছে। ইতিমধ্যে আমাদের ১৭ জনমত লোক আহত হয়েছে, ৬ জন শহীদ হয়েছেন, আমরা সৌভাগ্যবান যে আমাদের বাহিনীর মধ্যেই মেডিকেল টিম ছিল। যেটা পরবর্তীতে নিশ্চিন্তপুরের জমিদার বাড়িরতে হাসপাতালে রুপান্তরিত করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আমি যখন আহত হয়ে গেলাম আমার সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন পুলিশের এএসপি আজিজুর রহমান। তাকে আমি অর্ডার দিলাম লাস্ট বুলেট এন্ড লাস্ট এনিমি নো সারেন্ডার, ফাইট উইল গো। আমি তাকে এই কমেন্ট দিয়ে তাকে বুঝতে দিলাম না আমার গুলি লাগছে। কারণ আমি তখন বুঝতে পারলাম আমার গায়ে গুলি লাগছে এবং আমি আর যুদ্ধ করতে পারবোনা, প্রথমে মনে করেছিলাম আমার পাশ থেকে যিনি শহীদ হয়েছেন রুহুল আমিনের রক্ত আমার গায়ে লাগছে কিন্তু পরে আমার নিজের শরীরে অনুভূতি আসলো। সেখান থেকে আমার সহযোদ্ধারা আমাকে বাগান বাড়ির কালিবাজারে একটা বটগাছ ছিল সে বটগাছের নিচে হোগলা বিছিয়ে সেখানে গ্রাম্য চিকিৎসক হরলাল মাহাবুব আরো একজন মিলে প্রাথমিকভাবে আমাকে কাথা সেলাই করার সুই দিয়ে বিভিন্ন ক্ষতে প্রাথমিক সেলাই দিল, আমার তখনও জ্ঞান আছে, জ্ঞান হারায়নি, আমার রক্তক্ষরণ কিছুটা বন্ধ হল, তখন আমাকে লঞ্চে করে নিশ্চিন্তপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পথিমধ্যে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং নভেম্বরের ২৩ তারিখে আমার জ্ঞান ফেরে। এর মধ্যে আমার মনে আছে একটা বিশেষ ঘটনা আমি যখন আহত হই এবং নিরাপদ স্থানে আমাকে আনা হলো তখন গ্রাম্য চিকিৎসকদের কাছে ব্যান্ডেজ করার মত কোন সরঞ্জাম ছিল না, তখন আমাকে যে বাড়ি রাখা হয়েছিল সেই বাড়ির এক মেয়ে আমার রক্তক্ষরণ দেখে

নিজের শাড়িটা টান মেরে ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ করার জন্য দিল। আমার ডাক্তাররা তখন ইতস্তত বোধ করলো সেটা জীবাণুমুক্ত কিনা, তখন সেই মেয়ে বললো আমি মেডিকেলের ছাত্রী এই মাত্রই আমি এটা আয়রন করেছি সমস্যা নেই আপনারা ব্যান্ডেজ করতে পারেন, ডাক্তাররা সেটা দিয়েই ব্যান্ডেজ করলো। আমার স্মৃতিতে আজও ঘুওে, ওই মেয়ে আমার যে বোন উৎসবের দিনে তার প্রিয়জনের দেওয়া উপহারটাকে ছিড়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছে, কি জন্য করেছিল কি তার উদ্দেশ্য ছিল কি লক্ষ্য ছিল? তার লক্ষ্য ছিল একটাই একটা সোনার বাংলা গড়ার, একটি স্বাধীন সার্বভৌম শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ হবে। আজকের যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের জন্য আমরা যুদ্ধ করি নাই এবং নিশ্চয়ই সেই বোনও এই বাংলাদেশের জন্য তার নিজের কাপড় ছেড়ে আমার ব্যান্ডেজ করেন নাই। এই জ্বালা নিয়ে আজ ৫২ বছর হলো ঘুরছি।

৯ ডিসেম্বর আমি কিছুটা সুস্থ মিত্র বাহিনী দাউদকান্দিতে আসলো আমাদের কাছে যে পাকবাহিনী বন্দী ছিল তাদেরকে মিত্রবাহিনীর কাছে সমর্পণ করলাম। এবং ৯ ডিসেম্বর দাউদকান্দি পুরাপুরি শত্রুমুক্ত হলো।



বীর মুক্তিযোদ্ধা নৌবাহিনীর কমান্ডার এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সি, পিএসসি, এমবিএ, এমডিএস, বিএন, (অবঃ)

আমার বয়স তখন ১৩ বৎসর ৫ মাস ২৬ দিন। কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী (নানারবাড়ী) হাইস্কুলে লেখাপড়া করতাম। ভুরুঙ্গামারীতে যখন খান সেনারা হানা দিল তখন আমার মামা মামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেই মামাদের গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশে ছিট মহল ছাটতিলাই (বালাত) এ আশ্রয় নিল। ছাটতিলাই এর চারিদিকে ভারত শুধুমাত্র একদিকে বাংলাদেশ এর করিডোর সেটাও আবার নদীতে পড়েছে। স্বভাবতই নৌকাই একমাত্র বাহন। মামার বাড়িটি ঐ এলাকায় বেশ বড়। অনেক লোক নদী পথে এসে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করল। পরবর্তীতে তাদেরকে বিভিন্ন শরনার্থী শিবিরে স্থানান্তর করা হয়। ভূরুঙ্গামারীর মামার বাড়ি থেকে আমিই শেষ ব্যক্তি যে ঐ বাড়ী ত্যাগ করি। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। সন্ধ্যা তখন সাতটা কি আটটা হবে। খান সেনারা ঐ বাড়িতে আক্রমন চালাল। আমি বাড়ির পিছনে বাঁশ বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। একটু পরে বাড়িতে আগুন লাগানোর দৃশ্য দেখতে পেলাম। বড় সুন্দর টিনের বাড়ি প্রায় ছয়টি, প্রত্যেকটিতে আগুন জ্বলছিল। আর আমি তের বছরের একটি বালক নিজ চোখে এত কাছে বসে এ দৃশ্য অত্যন্ত কষ্টের সহিত দেখছি। আর তখনই মনে হয়েছিল "এই অত্যাচার ও নির্যাতন চলতে থাকলে আমরা অবশ্যই একদিন স্বাধীনতা লাভ করব। ঐ সময় আমার হাতে যদি অস্ত্র থাকতো তাহলে আমি তখনই তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতাম"। এদিকে আমার বাবা ও বড় বোন মামা বাড়ীতে বেড়াতে

এসেছিল। আমাদের নিজস্ব বাড়ি গঙ্গাচড়া থানার বেতগাড়ীতে। রংপুর শহর থেকে মাত্র আট মাইল দূরে আমাদের বাড়ি। বাবা এবং বড় বোনের আমাদের নিজস্ব বাড়ীতে ফিরে যাওয়া হয়নি। পুরো যুদ্ধকালীন সময়টা তাদের কেটেছে বালাছতে। এদিকে আমার মা, বড় ভাই ও ছোট দুটি ভাই বোন। কোথাও পালাতে না পেরে বাড়িতেই রয়ে গিয়েছিল অনেক কষ্ট অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিপীড়ন সহ্য করে। আমার বড় ভাই প্রায়ই লুকিয়ে থাকত যেন পাকিস্তানিদের হাতে ধরা না পরে।

মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অংশগ্রহণ:

আগুনের লীলা শেষ, আমি ও ফিরে যাই মামাদের ছিটমহলের বাড়ীতে ভোরের দিকে প্রায় ৬ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এবং তিন মাইলের পথ নদী পথে। প্রায় তিন চারশ পরিবারকে আমি দেখতে পাই সেই বাড়ীতে। একটি বাড়ীতে এত লোক দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছিল। কোন পরিবারের নিকট কোন খাবার নেই। আমার মামা ও নানাদেরকে দেখলাম খুব কাছে থেকে, অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তারা এ অবস্থার মোকাবেলা করছে। আমি বাংলাদেশের তখনকার অস্থায়ী সরকারের সকল মন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এম এ জি ওসমানিকে দেখতে পেলাম সে বাড়ীতে। পরে তাদের নির্দেশে ভারতের কুচবিহার জেলা তুফানগঞ্জ মহকুমার ঝাউকুঠিতে একটি শরনার্থী শিবির ও একটি মুক্তিযোদ্ধা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। যা নিম্নের ছবিতে দেখা যাচ্ছে। তখন শুধু ডান পার্শ্বেও টিনের ঘরটি ছিল আর মাঠটি যেখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। তিন তলা বিল্ডিংটি স্বাধীনতার অনেক পরে ভারত সরকার তৈরি করে। এটি একটি হাইস্কুল।

ঝাউকুঠি যুব শিবির:

ঝাউকুঠির মুক্তিযোদ্ধা যুব শিবিরের উদ্বোধনীতে আমি উপস্থিত ছিলাম। কলকাতায় মুজিব নগর সরকারের অস্থায়ী সদর দপ্তর ১৫-১৬ মে ১৯৭১ উদ্ধোধনের পরপরই বাংলাদেশের অস্থায়ী মন্ত্রী পরিষদ বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। আগষ্ট ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় এক কোটি শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নেয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো ঝাউকুঠি শরণার্থী শিবির, কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্চ মহাকুমার বালাভূতে অবস্থিত। এটি হলো আমার নানার বাড়ী।

এখানে প্রায় পনের হাজার শরনার্থী আশ্রয় নেয়। আমি ও বাবা সহ আমাদের সকলেই এ শিবিরে খাওয়া দাওয়া করতাম। এটির বর্ননা দিয়েছেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি শরনার্থী শিবিরে জনগণের দূদর্শা দেখে বলেছিলেন "ওঃ রং ঃযব মৎবধঃবংঃ যঁসধহ ঃৎধমবফু ড়ভ ড়ঁৎ ঃরসব" এখান থেকে অনেক ছাত্র যুবক ও কৃষক ঝাউকুঠি মুক্তিযোদ্ধা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদান করেন। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের অস্থায়ী মন্ত্রী পরিষদের সকলেই। তার মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এম এ জি ওসমানীসহ মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও ভারতের বিভিন্ন উচু পর্যায়ের প্রতিনিধিগন। ঐ দিন আমার বাবার হাতে উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চাবি হস্তান্তর করেন। কারন তিনি ছিলেন ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের ভেটেরান স্বেচ্ছাসেবক। আমার মামা ও নানাদেরকে উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পন করেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই আমি ১নং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখায়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। উদ্বোধনের দিনেই আমার সম বয়সী ছেলেরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঐ যুব শিবিরে যোগদান করল। আমি ও জেদ ধরলাম যে, মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করব। কিন্তু বাঁধ সাধলো আমার বাবা, কেননা আমার বয়স খুবই কম ছিল। কিন্তু বাবা পারেনি আমাকে থামাতে। আমার স্কুলের অনেক ছাত্র, আমার সম বয়সী মামারা সবাই যোগদান করলো এবং বলতে লাগলো আমি যদি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করি তাহলে তারাও মুক্তিযুদ্ধে যাবে না। ইতি মধ্যে প্রথম ব্যাচ প্রশিক্ষণের জন্য দার্জিলিং/জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি চলে যায়। পরিশেষে ২য় ব্যাচের দুইশো জনের একটি দলে আমাদেরকে কুচবিহার এর তাপুরহাট ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠায়। সেখানে আরও বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে প্রায় ৫/৬শ জন যোগ দেয়। দু সপ্তাহ পর আমরা একত্রে মুজিব ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং এর জন্য গমন করি। কুচবিহার থেকে প্রথমে আমরা ট্রেনে আলীপুর দুয়ারে যাই, সেখানে ট্রেন পরিবর্তন করে নিউমাল জংশনে নামি প্রায় দুদিন পর। পরবর্তীতে ট্রেনে করে আমরা গন্তব্য স্থলে পৌছি। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্পটি ভারতের দার্জিলিং এর মূর্তি টি এষ্টেটে। ক্যাম্পে যেতে ভ্রমনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও নয়নাভিরাম। ট্রেনটি মনে হচ্ছিল যেন কখন ও পাহাড় ঘেষে কখন ও বা গুহা দিয়ে অনেক উপরে উঠছিল। ট্রেনটি যখন মেঘের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল মেঘ এসে

আমাদের সবাইকে দোলা দিচ্ছে আর আমরা যাচ্ছি। অবশেষে আমরা ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌছিলাম তখন দুপুর একটা হবে। সূর্য্যের ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকে পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত এই ট্রেনিং ক্যাম্পটিকে আমার বেশ ভাল লাগছিল। ট্রেনিং ক্যাম্পের চারিদিকের পাহাড়গুলোতে বড় বড় চা বাগান। পাশেই একটি ঝর্ণা, পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে এসেছে। দশ বারো মাইল দূরে কোথাও যেন একটি জল প্রপাত ছিল আমি দেখিনি তবে তার গর্জন আমি প্রতিদিনই শুনেছি। চা বাগানের মনোরম দৃশ্য সত্যি আজও মনের মধ্যে স্মৃতি হয়ে আছে। ট্রেনিং কমান্ডার ও ট্রেনিং অফিসারকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনও দেখেনি। আমি যখন যাই তখন চারটি কোম্পানিকে ট্রেনিং গ্রহণ করতে দেখি। আমরা মুজিব উইং এর ডেল্টা কোম্পানীতে ট্রেনিং গ্রহণ করি। আমি ডেল্টা কোম্পানীতে যোগদান করি। সঙ্গে আমার দুই মামা মোঃ শাহজাহান ও মোঃ শাহজামান। আমাকে একটি প্লাটুনের লিডার বানানো হল, কেননা ঐ প্লাটুনে আমিই মোটামোটি উঁচু ক্লাসের ছাত্র এবং ইংরেজীতে মোটামোটি এবং হিন্দিতে আধো আধো কথা বলতে পারতাম। যথারীতি ট্রেনিং শুরু হল, ছাত্র অবস্থায় আমি কখন ও ভাবিনি যে সেনা বাহিনীর ট্রেনিং এত কষ্টকর হবে। কিন্তু যখন মনে হয় আমি আমার মাকে খান সেনাদের মাঝে রেখে এসেছি, শেষ দেখাটিও করতে পারিনি এবং আগুনের সেই লেলিহান দৃশ্য মানসপটে ভেসে উঠে তখনই আমি ট্রেনিং এর সব কষ্ট ভুলে যাই। মনোযোগের সহিত স্বল্প সময়ের ট্রেনিং গ্রহণ করতে থাকি।

আমাদের নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়:

ক। এসএমজি, এসএলআর, (ভারতীয় ও রাশিয়ান) ও এলএমজি ফায়ারিং সহ বেয়নেট চার্জ ।

খ। গ্রেনেড হাত ও গান দিয়ে ছোঁড়া ।

গ। ২ ইঞ্চি মর্টার ।

ঘ। মাইন (পার্সোনাল ও ট্যাংক) পোতা ও উঠানো।

ঙ। ডিনামাইট দিয়ে ব্রীজ ভাঙ্গা।

চ। বিভিন্ন ডেটোনেটর ও ডেমুলেশন।

ছ। রেকি ও রেইড।

জ। এ্যামবুশ।

ঝ। বাংকার তৈরি ও বিভিন্ন অবস্থাতে আশ্রয় গ্রহণ, ইত্যাদি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জৈ্যষ্ঠপুত্র জেন্টলম্যান ক্যাডেট শেখ কামালের সহিত ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ মুজিব ক্যাম্পেঃ ভারতীয় সেনা বাহিনী ভারতের শিলিগুড়ি জেলার মুর্তি চা বাগানে অফিসার ট্রেনিং স্কুল (ওটিএস) অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য অনেক আগে থেকেই চালু করেন । সেটি ছিল শিলিগুড়ি ইকো সেক্টর, ৩৩ করস। বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ছিল দুইটি উইং একটি মুজিব উইং যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। আরেকটি ছিল ভাষানি উইং যেখানে মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্য হতে নির্বাচিত তরুন, অভিজ্ঞ, সু শিক্ষিত ও যোগ্যতা সম্পন্ন (উচ্চ মাধ্যমিক ও তদুর্দ্ধ) ছাত্রদের কে নির্বাচিত করে এ উইং এ অফিসার পদের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। কেননা রনক্ষেত্রে অফিসার সংকট ছিল তা দূর করার জন্য প্রায় ৬১ জনকে প্রথম ওয়ার কোর্স নামকরন করে অফিসার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই ৬১ জনের মধ্যে একজন ছিল প্রয়াতঃ লেঃ শেখ কামাল যিনি এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে কমিশন লাভ করে জেনারেল এম এ জি ওসমানির এডিসি হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে আরও ৭৫ জনের ২য় এয়ার কোর্সের একটি দল সেখানে অফিসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমার সঙ্গে জেন্টলম্যান ক্যাডেট (জিসি) শেখ কামালের সাথে একদিন বিকালে ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠে দেখা ও কথাবার্তা হয়। তারপর তিনি প্রায়ই আমাদের তাবুতে লুডু ও গল্প করতে আসতো। কেন জানি উনি আমাকে খুব ভালোবাসত কারন হিসাবে আমার বয়স কম ও লেখা পড়ায় আমি খুব ভাল ছিলাম। অত্যন্ত হাসিখুশি ও মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন করতো জাতির পিতার জৈ্যষ্ট পুত্র প্রয়াতঃ লেঃ শেখ কামাল। তার সঙ্গে ঐতিহাসিক এ মিলিত, সুখ দুঃখের ভাগাভাগি ও খেলাধূলা করতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করছি। এটি একটি বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা এজন্য যে, ১৯৬৯ ভাষানী উইং ও মুজিব উইং এর স্থানীয় ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন ভারতীয় সেনা বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার টিসি জোসি, যিনি কিনা আমাদের কমান্ডার ছিলেন। কর্ণেল দাশগুপ্তা ছিলেন চীফ ইন্সট্রাক্টর। ইন্সট্রাক্টদের মধ্যে ছিলেন, মেজর আসমান শিং থাপা, ক্যাপ্টেন ষ্টেহানাপতি, ক্যাপ্টেন যাদব, ক্যাপ্টেন চন্দন, ক্যাপ্টেন আরপি শিং,

ক্যাপ্টেন সজ্জন শিং সহ আরও অনেকেই আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। আমি তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ট্রেনিং ক্যাম্পের অনেক উল্লেখযোগ্য স্মৃতিই আমার মনে পড়ে। তার মধ্যে এ্যামবুশে বন্য হাতির কবলে পড়ে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসা। এসএলআর ফায়ারিং এর সময় টার্গেটে একটি গুলি ও না লাগা। ইত্যাদি। দুটোতেই আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি টার্গেটে গুলি না লাগার দরুন আমাকে অনেক শাস্তি পেতে হয়েছে। সেনাবাহিনীর সে সব শাস্তির নাম আগে কখনও শুনিনি, যদিও আমি ছাত্র অবস্থায় মুকুল ফৌজ এ ছিলাম। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনাটি দূরে নদীর রুপ ধারণ করেছিল। আর সেখানেই গ্রেনেড থ্রো করে অনেক মাছ ধরেছি। ট্রেনিং ক্যাম্পের স্মরণীয় ঘটনা হলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এর জৈ্যষ্ঠ ছেলে ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাই শেখ কামালের সঙ্গে মুজিব ক্যাম্পে একসাথে ডেমুলেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

ইহা ছাড়া ও আমি তার সঙ্গে ক্যারাম বোর্ড, ব্যাডমিন্টন লুডু খেলেছি। তার ব্যবহার এত ভাল যা অবর্ণনীয়। তিনি আমাকে প্রায়ই ডাকতেন এবং জিজ্ঞাসা করতো আমি এত অল্প বয়সে কেন যুদ্ধে এসেছি। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো একত্রে হাতির কবলে পড়া। হাঁড়ি দিয়ে শব্দ করে হাতি তাড়ানো ইত্যাদি। আমাদের পাসিং আউট প্যারেড ছিল অত্যন্ত স্বরনীয়। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এম এ জি ওসমানী যাকে আমি প্রথমে দেখেছি, তিনিই আমাদের শপথ করান। অনেক জাকজমকপূর্ণ ছিল আমাদের এ অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রথম ওয়ার কোর্সের ৬১ জন সকলেই উপস্থিত ছিল উক্ত পাসিং আউট প্যারেডে। প্রশিক্ষণ শেষে শপথ গ্রহণ করে মৃত্যুকে বেঁচে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ৬নং সেক্টরে। প্রথমে রংপুর জেলার ভারতের বর্ডারের নিকট অবস্থিত বুড়িমাড়ীতে রিজার্ভ ক্যাম্পে। দশ পনের দিন পর আমাদেরকে বদলি করা হল দিনাজপুর জেলার তেঁতুলিয়ায়।

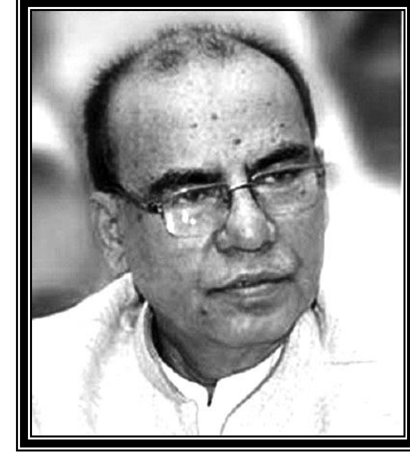
রনাঙ্গনের স্মৃতি:

জুলাই -৭১ এর শেষের দিকে তেঁতুলিয়ায় আসার পর আমি ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ছাত্র ও সর্বস্তরের জনতাকে একত্রিত হতে দেখি।

সেখানে তিনটি কোম্পানী 'এ' 'বি' ও 'সি' নামে রনাঙ্গনে নিয়োজিত ছিল। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় 'ডি' নামে আরো একটি কোম্পানী গঠন করা হয়। ২ আগষ্ট ৭১ ভজনপুরে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় এবং ৪ আগষ্ট ৭১ ভজনপুর থেকে দেবনগরে ডিফেন্স নেওয়া হয়। মাঝে আমাদের কোম্পানীগুলি ছত্রভঙ্গ হয় এবং ভারতীয় আর্টিলারী রেজিমেন্ট পাকবাহিনীর উপর সেলিং করতে থাকলে আমরা আবার একত্রিত হই। সেপ্টেম্বর মাসে চুই নদীর তীরে অবস্থিত চকমারী, ফকিরপাড়া, খইপাড়া, ডাংগারপাড়া পাখিলাগাও, জুতরারপাড়া, খাসপাড়া, বালিয়াপাড়া, ও প্রধানপাড়া, দখল করে নেওয়া হয়। এই সব এলাকা দখল করতে খান সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। চুই নদীর পশ্চিমপাড়ে পাকসেনাদের মুখোমুখি ডিফেন্স নেওয়া হয়। এ সময় ভারতীয় বাহিনীর ৭৩ ব্যাটালিয়ন ও আর্টিলারী রেজিমেন্ট পিছন দিক থেকে কভারিং ফায়ার দিয়ে সাহায্য করতো। সেপ্টেম্বর এর ৩য় সপ্তাহের দিকে পাক বাহিনীর ঘাটি অমর থানায় আক্রমন করা হয়। উল্লেখ্য যে, পাক সেনাদের সহিত টিকে থাকতে না পারায় আমরা আবার ও চুই নদীর পশ্চিম পারে ডিফেন্স নেই। এরপর জগদল হাটে পাক বাহিনীর ঘাঁটির উপর আক্রমন করা হয় সেখানেও টিকে থাকতে না পারায় আবারও পিছু হটে চুই নদীর পশ্চিম পার্শ্বে ডিফেন্স নেওয়া হয়। অক্টোবর মাসেও আক্রমন চালানো হয়। কিন্তু কোন সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের বেতন, খাওয়া, কাপড় ও গোলাবারুদ সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় মনোবল অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। আমার যতদুর মনে পড়ে আমি ৭৫ রুপি বেতন পেতাম। খরচ করার কোন জায়গা না থাকায় পুরো টাকাটাই রেহাই পেত খরচের হাত থেকে। রমজান মাস ও পেয়েছি অস্ত্র, গোলাবারুদ, হ্যান্ড গ্রেনেড ও মর্টারের সংখ্যা বাড়াতে এ্যামবুশ রেইড ও রেখির সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এভাবেই চুই নদীর পারে নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতেই অবস্থান করি। নভেম্বর এর শেষের দিকে পুনরায় অমর খানায় আক্রমন করা হয়। ভারতীয় আর্টিলারী পাক বাহিনীর ঘাটির উপর খুবই সেলিং করে। তীব্র আক্রমন সহ্য করতে না পেরে পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং আমরা অমর থানা দখল করি। অমর থানা দখলের পরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ভারতীয় রাজপুতনা রাইফেল রেজিমেন্ট অমর খানার সম্মুকে এবং আমাদের ডিফেন্সের পিছনে চুই নদীর পশ্চিম পার্শে ভারতীয় মারাঠা অবস্থান নেয়। অবশেষে নভেম্বর আমরা

জগদল হাট আক্রমণ করি এবং দখল করতে সক্ষম হই। এই দুটি জায়গা দখল করতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়। পাক সেনারা তাদের প্রতিরক্ষা পঁচাগরে স্থানান্তর করে। একই দিন আমরা পঁচাগড় অভিমুখে রওয়ানা হই। পঁচাগরের অনতিদূরে থাকতেই আমরা পাক সেনাদের উপর আক্রমণ করি এবং ভারতীয় বাহিনী কভারিং ফায়ার দিয়ে সাহায্য করে। পঁচাগরে পাকিস্তানিদের ঘাঁটিটি অত্যন্ত মজবুত ছিল। সিমেন্ট করা বাংকার ও ট্রেন্স সমস্ত পঁচাগড়কে ঘিরে ফেলেছিল। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে পঁচাগড়বাসীসহ সম্মিলিত বাহিনী ও পাক সেনারা যারা বেঁচে আছে তারা আজও হয়তো মনে রেখেছে যে, সেখানে কি ধরনের আক্রমণ হয়েছে। ভারতীয় সেনা বাহিনী অনেক ব্যাটালিয়ন, মুক্তিবাহিনীর সকল ব্যাটালিয়ন পঁচাগড়ে ডিফেন্স নেয়। পরবর্তীতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বেশ কয়েকটি জঙ্গি বিমান পাক সেনাদের অবস্থানের উপর উপর্যুপুরি আক্রমন চালায়। ইহা ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েছিল। আর ভারতীয় আর্টিলারী রেজিমেন্টের প্রায় ৬০ টি গান থেকে পাক সেনাদের বুকের উপর অনবরতঃ সেলিং করা হয়। ঐ সপ্তাহে অসংখ্য গোলা, বোমা, সেল বিভিন্ন প্লাটফরম থেকে পাক সেনাদের ঘাটির উপর নিক্ষেপ করা হয়। ঐ আক্রমন সহ্য করতে না পেরে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পঁচাগড় ছেড়ে ময়দান দিঘীতে আশ্রয় নেয়। এই যুদ্ধে অনেক পাক সেনাকে জীবন্ত ধরা হয়। জনতা এ ব্যাপারে বেশ সাহায্য করেছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর সৈন্য এই পঁচাগড়ের যুদ্ধে মারা যায়। আমি অনেককে নিজের কাধে করে পিছনে পৌঁছে দিয়ে আসি। সেখানে বেশ কয়েকটি বাংকার ঘুরে দেখি। পাকসেনাদের সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে যায়। বেশ অনেকগুলি বাংকারেই আমাদের মা বোনের কাপড়, অত্যাচার ধর্ষন ও খুনের আলামত পাওয়া যায়। পঁচাগড় নদীর পার্শ্বে আমি অনেক মানুষের কংকাল দেখেছি যা অবর্ণনীয়। কাউকে অর্ধেক পুতে রাখা হয়েছে। অনেক নাম না জানা দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা লাশ আমি দেখেছি নদীর ধারে। অনেক গোলাবারুদ, ভারী অস্ত্র ও ব্যবহৃত গাড়ী উদ্ধার করা হয়। ৩০ নভেম্বর বোদা থানার উদ্দেশ্য রওয়ানা দেই। পরের দিন আমরা বোদা থানা দখল করি। বোদা থানায় ও খুব যুদ্ধ হয় আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। বোদা দখলের পর আমরা ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্ধেশ্য রওয়ানা দেই এবং ৩রা ডিসেম্বর সম্মিলিত বাহিনী সহ ঠাকুরগাঁও আক্রমন করি এবং পাক সেনারা অতি অল্প গোলা

ব্যয়ে পিছু হটে। এতবড় মহকুমা শহর অথচ এখানে তেমন একটা যুদ্ধ হয়নি। এর পরদিন বীরগঞ্জ দখর করে ভাতগাঁও ব্রীজের দিকে রওয়ানা দেই। পাক সেনারা ভাতগাঁও ব্রীজ ভেঙ্গে ফেলে যাহা পরবর্তীতে ভারতীয় বাহিনী মেরামত করে এবং ট্যাংক ও ভারী অস্ত্র পারাপার করে। ভাতগাঁও ব্রীজ মেরামতের পরপর আমরা আরও সামনের দিকে অগ্রসর হই এবং ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহে দিনাজপুরের কাছাকাছি দশমাইল জংশন হইতে ঠাকুরগাঁওয়ে ফেরৎ আসি। যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা যারা একত্রে কাজ করেছি তাদের মধ্যে বেশী মনে পড়ে 'সি' কোম্পানীর সুবেদার মেজর হাজী মুরাদ আলী, সুবেদার মেজর কাজীমউদ্দীন। আর সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার এবং স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিনের কথা। এদেরকে আমি দেখেছি সদা সর্বদাই সামনে থাকতে, সামনে গিয়ে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সামনে অগ্রসর হওয়ার কমান্ড করতেন আর আমরা চারটি কোম্পানী অগ্রসর হতাম। আমি তখন সেকশন লিডারের দায়িত্ব পালন করতাম। যুদ্ধ শেষ হল অস্ত্র জমা হলো। আমরা বাড়ীতে আসার জন্য ছাড় পত্র পেলাম। মজার ব্যাপার হল,দেশ স্বাধীন হলেও ঠাকুরগাঁও থেকে রংপুর পর্যন্ত কোন গাড়ী নেই। দুদিন এভাবেই চলে গেল। পড়ে রংপুরের সবাই মিলে একটি জীপ ভাড়া করে রওয়ানা হলাম। তারিখটি খেয়াল নেই। তবে সময়টা হবে ১৯৭১ এর শেষ অথবা জানুয়ারী ১৯৭১ এর প্রথম সপ্তাহে। বাড়ীতে পৌছার সাথে সাথে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হয়। কে যেন আমার মাকে খবর দিয়েছিল আমি যুদ্ধে গিয়ে এ্যামবুশে পড়ে মারা গিয়েছি। আমাকে জীবন্ত ও শশরীরে দেখতে পেয়ে আমার মায়ের সেকি খুশীর কান্না। এলাকা বাসী সকলেই আমাকে ঘিরে দেখেছিল এবং জানতে চায় কিভাবে যুদ্ধ করেছি, কিভাবে স্বাধীন করা হলো ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। বাড়ীতে কিছু দিন থাকার পর আমি ভুরুঙ্গামারীতে যাই। সেখানে গিয়ে এক করুন চিত্র দেখতে পাই। যে বাড়ীটি ছিল উক্ত এলাকার একটি মডেল,সুন্দর টিনের ঘর, সেগুলি পুড়ে মাটির সঙ্গে ছাই হয়ে শুয়ে আছে। আর তার উপর জন্ম নিয়েছে অনেক গাছপালা। এত কিছুর বিনিময়ে আমরা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি স্বাধীনতা, হাসি ফুটিয়েছি হারিয়ে যাওয়া মা বোনদের মুখে। চির স্মরণীয় হয়ে আছে আজও আমাদের মাঝে। এখানে আমি আবার ও লেখাপড়া শুরু করি নবম শ্রেণী থেকে। আমার বয়স এখন ২৮ অক্টোবরে ৬৪ তে পড়েছে।



বীর মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক আলহাজ্ব মোঃ আবদুল হাই

আমি মো: আব্দুল হাই, বর্তমান সভাপতি নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ। আমার রাজনীতিতে আগমন আমি যখন তুলারাম কলেজের ২য় বর্ষে পড়ি, তখন আমি নারায়নগঞ্জ শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। এরপর ১৯৬৭ সালে আমি বৃহত্তর ঢাকা(মোট ৬টি জেলা নিয়ে গঠিত) ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হই। সেই ১৯৬৪ সাল থেকেই পদ আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে আমি রাজনীতি করে আসছি। ১৯৬৩ সালে ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন লেবাননের বৈরুতে মারা গেলেন তখন তৎকালীন পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে ছিলো উনাকে পাকিস্তানের করাচি অথবা লাহোরে দাফন করা। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রচন্ডভাবে দাবি আসলো যে না তিনি আমাদের নেতা, তিনি আমাদের স্বার্থের কথা বলে গেছেন, তাকে ঢাকায় ফেরত পাঠানো হোক, ঢাকাতেই তাকে দাফন করা হবে। এরপর এই দাবীর কাছে তারা মাথানত করে এবং ৮ তারিখে সম্ভবত উনার লাশটি বৈরুত থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী লাশটি যখন আনতে যাই তখন যেই ট্রাকে তার লাশটি তোলা হয়েছিলো আমরাও কয়েকজন ওই ট্রাকে উঠে পরেছিলাম। তখন তো এতো লোক ছিলোনা, এতো নেতৃত্ব নিয়ে কাড়াকাড়িও ছিলো না। তো আমরা

সবাই একসাথে ট্রাকে উঠি, কফিনটার একপাশে ছিলেন জহুরুদ্দিন সাহেব যিনি অল পাকিস্তান আওয়ামীলীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন, বঙ্গবন্ধু এক পাশে বসে আছেন, আরো অন্যান্য নেতারা সবাই কান্নাকাটি করছেন, খুব বিমর্ষ সবাই। তিনি ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে মারা যান এবং হোটেলে একা নির্জন অবস্থায় মারা যান। সেখানে তিনি চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন এবং আকশ্মিক ভাবে পরলোক গমন করেন। আমরা রেডিও এর মাধ্যমে জানতে পারি সেই খবরটা। তো যাইহোক, ঐদিনই (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩) বঙ্গবন্ধুকে আমি প্রথম দেখি। কিন্তু আমাদের মধ্যে তখন কোনো কথা হয়নি কেননা তখন আমি সবেমাত্র কলেজের ছাত্র।

আমার আগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মনির ভাই, তার নেতৃত্বে এবং খাজা মহিউদ্দিন ভাই প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাদের নেতৃত্বে আমরা ছাত্রলীগ করি। এই মনির ভাইকে বিএনপির ঘাতক বাহিনী আমাদের জেলা আওয়ামীলীগের পার্টি অফিসে নির্মমভাবে হত্যা করে ১৯৮১ সালের ৩রা নভেম্বর।

এরপর আমাদের কর্মকাণ্ড চলতে লাগলো। এর মধ্যে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ হলো। ওই যুদ্ধে ইস্ট/ওয়েস্ট পাকিস্তান ভারত চাইলে একদিনে নিয়ে নিতে পারত। জানিনা কি কারণে, স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণেই হোক অথবা অন্যকোনো কারণে, তারা এদিকে এতটা খুব একটা এটাক করেনি, যুদ্ধটা হয়েছে ওইদিকে, প্রচন্ড যুদ্ধ হয়েছে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে। তখন ঐ যুদ্ধের সময় আমরা একদম আইসোলেটেড হয়ে গিয়েছিলাম। এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু ৬ দফার প্রনয়ণ হয়। এই যুদ্ধ ১৭-১৮ দিন চলার পর সিজ ফায়ার হয়ে গেলো। তখন আইয়ুব খান ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি তখন সবাইকে নিয়ে লাহোরে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের আহবান করলেন। সেখানে সকল বিরোধী দলের আমন্ত্রণ ছিলো, তখন পার্টির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু সেখানে গেলেন। সেসময় পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই, তার সাথে জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেব। সেখানে বঙ্গবন্ধু এই ৬ দফা দাবি উৎক্ষেপণ করলেন। পাকিস্তানকে বললেন "তোমরা তো আমাকে শোষণ করছো, এখানে ৪টা প্রদেশ, আমিসহ ৫টা প্রদেশ। আমি চাইনা আমার জন্যে এরাও শোষিত হোক (তখন সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তানরাও শোষিত হচ্ছিলো)।

আমি চাই সবাই একসাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাক, একসাথে শক্তিশালী হোক| এজন্য আমি অটোনমির একটা প্রস্তাব পেশ করতে চাই। সেটাই ৬ দফা, তিনি সেটা পেশ করলেন লাহোরে। সঙ্গত কারণেই তাদের আঁতে ঘা লাগলো। সেখানে তিনি বললেন যে ডিফেন্স এবং ফরেন পলিসি ছাড়া বাকি সবকিছু প্রদেশের হাতে থাকবে। আর প্রয়োজন হলে মুদ্রাটাও দুইরকম হবে দুই দেশে। এটাই তাদের(পশ্চিম পাকিস্তানের) খুব হিট করেছিলো। বঙ্গবন্ধু এরপরে ১১ অথবা ১২ তারিখে দেশে এসে তেজগাও এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের এটা ব্যাখ্যা করলেন, ব্যাখ্যা করার পর তিনি সারাদেশে এটা প্রচার করার জন্যে নেমে গেলেন। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ সবজায়গায় যেয়ে তিনি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে প্রচার করা শুরু করলেন। এরপর রাস্তায় উনি পথসভা করলেন, সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করলেন কেনো ৬ দফা যৌক্তিক দাবি, সেটার যৌক্তিকতা তুলে ধরলেন। তিনি মাঝেমধ্যেই সকালে এরেস্ট হতেন বিকালে জামিন পেতেন।

আবার বিকালে এরেস্ট হলে পরেরদিন জামিন পেতেন, এরকম অবস্থা চললো পরের চার মাস। সারাদেশ ঘুরে সর্বশেষ তিনি সভাটা করতে আসলেন নারায়নগঞ্জে। আমাদের এখানে একটা হল আছে, জিয়াউর হল নাম দিয়েছিলো বিএনপি সরকার, এটা একসময় একটা পুকুর ছিলো। সেই পুকুরটা ভরাট করে এটাকে টাউন হল নাম দেওয়া হয় কেননা মিটিং কনফারেন্স করার জন্যে নারায়নগঞ্জে সেরকম কোনো জায়গা ছিলোনা। সেই টাউনহল মাঠে তিনি(বঙ্গবন্ধু) সভা করতে আসেন ৮ই মে, ১৯৬৬ সালে। সেই মিটিংয়েই উনাকে ভালো করে দেখা। যদিও এর আগে তিনি তামাকপট্টিতে মিটিং করতে এসেছিলেন (৬ দফা দেওয়ার পূর্বে)। তবে শেষবাবারের টাউনহল মাঠের মিটিংয়েই খাজামুদ্দিন ভাইয়ের পরিচালনায় তিনি মিটিং করেন। মিটিং শেষে মনির ভাই আমাদের সবাইকে উনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাকে এবং তৎকালীন ছাত্রনেতা মোবারক হোসেন (যিনি পরবর্তীতে সোনারগাঁওয়ের ১৯৭৩ সালের এমপি ছিলেন, তিনি মারা গেছেন), কমান্ডার সিরাজ (যিনি পরে বিএনপি থেকে এমপি হয়েছিলেন), নাজিমুদ্দিন মাহমুদ (পরবর্তীতে পৌরসভা চেয়ারম্যান), তোফাজ্জল হোসেন খান (আমার পরে ঢাকা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন,

বর্তমানে মৃত) এসকলকে মনির ভাই বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি আমাদের সবার মাথায় হাত দিয়ে বললেন "তোরা সবাই ৬ দফার পক্ষে কাজ করিস, এটা জনগণেরই দাবি।" তবে দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো ঐদিন সন্ধ্যায়ই মোস্তফা স্যারের বাড়িতে চা খেয়ে বের হওয়ার পরেই পুলিশের গাড়ি উনাকে এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের এরেস্ট করে নিয়ে যায়।

ঐদিনই ছিলো তার ৬ দফার পক্ষে শেষ সভা। এরপরে **১৯৬৯** এর গণঅভ্যুত্থানের আগে তিনি জেল থেকে বের হতে পারেন নাই আর। বঙ্গবন্ধুসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের সবাই এরেস্ট হলো, পরেরদিন ফলাও করে পত্রিকাতে আসলো আইয়ুব খানের সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই **১৯৬৬** আর **১৯৬৯** এর মাঝখানেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তৈরি করা হলো। জেলে নেওয়ার পরেই খবর বের হলো উনাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোথায় সেটা কেও বলেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ছাত্রলীগ এবং আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিভাবে রাখা হয়েছে এটা জানা আমাদের অধিকার আছে। পরবর্তীতে আমরা জানলাম যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে, ৩৫ জন আসামি, তিনি এক নম্বর আসামি। মামলা চলতে লাগলো, জাস্টিস আব্দুর রহমান এটার বিচারক, ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বিচার কাজ চলতো (যার বাড়িটা বাংলা একাডেমির পাশে ছিলো, আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম **১৯৬৯** এর মুভমেন্টের সময়)। আমার একটা ইচ্ছা হলো আমি নেতাকে দেখবো, পারমিশন নিয়ে দেখতে গেলাম। আমি দূর থেকে দেখলাম, সাথে বঙ্গমাতা গিয়েছিলেন উনি কাছে গিয়ে কথা বললেন। উনি শুধু প্লেইন একটা পাজামা পাঞ্জাবি আর গলায় মাফলার পরে ছিলেন। তখন শীতকাল ছিলো। আর সেদিন আমার তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখা স্বচোক্ষে।

এরপরে সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হলো, তারপর ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান শুরু হলো। এটা কিন্তু কোনোরকম প্ল্যান করে করা হয়নাই। এটা হটাৎ করেই শুরু, তখন কিন্তু এত দল ছিলোনা, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ আর ছাত্র ফেডারেশন ছিলো আইয়ুব খানের, সেটার একটা অংশ আমাদের সাথে চলে আসলো। ডাকসুর ভিপি ছিলো তোফায়েল আহমেদ আর জেনারেল সেক্রেটারি

ছিলেন সিলেটের নাজিম কামরান চৌধুরী, উনারা চলে আসলেন আমাদের সাথে। আর ছাত্র ইউনিয়নের দুই ভাগ ছিলো মতিয়া মেনন আর ছাত্রলীগ তো আছিই। এভাবে **১১** দফা মনোনয়ন করা হলো, এইজন্যে আমরা ৬দফা সম্বলিত **১১** দফা বলি। **১১** দফার মধ্যেই ৬দফা আছে। এবং এইটাই কিন্তু ৭০ এর নির্বাচনের মেনিফেস্টো ছিলো। নির্বাচনে জিতলে আমি এই **১১** দফাই বাস্তবায়ন করবো বঙ্গবন্ধু সবসময় এটাই বলতেন। উনি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবর পেলাম **১** টার দিকে , রেডিওতে বলা হলো যে উনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু এইটুকুই বলা হয়েছিলো, আর মামলার ব্যাপারে আর কিছু বলেনাই। ওইসময় ইত্তেফাকের আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাহেব এবং আ স ম আব্দুর রউফ এবং আরো কয়েকজন মিলে আমরা রওনা দিলাম এবং ৫-৭ মিনিটের মধ্যে পোঁছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম কিছু লোক আসছে মাত্র, আমরা যেয়ে পা ছুয়ে সালাম করলাম এবং উনি এক পর্যায়ে সিরাজ ভাইকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন "বাঙ্গালি এতো রক্ত দিতে জানে রে?"

এরপর উনার একটা ফোন আসলো খুলনার এক বন্ধু থেকে। আমি তখন ল্যান্ডলাইনের ফোনটা রিসিভ করে জিজ্ঞেস করলাম কে? ফোনের অপরপাশ থেকে জানতে চাইলো মুজিবুর আছে? আমি বললাম, জি উনি মঞ্চে আছেন বক্তব্য দিচ্ছেন। অপরপাশ থেকে বলা হলো, উনাকে আমার কথা বলো উনি আসবেন। আমি বঙ্গবন্ধুকে যেয়ে বলার পরে উনি এসে ফোন রিসিভ করলেন, কথা বললেন এরপর আবার বক্তব্য দিতে ফিরে গেলেন। বক্তব্য শুনতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো জায়গা।

উনাকে মুক্তি দেওয়ার আগেও আরেকটা অফার এসেছিলো যে উনাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হবে তবে বাকিরা মুক্তি পাবেনা। তখন উনি বলেছিলেন, কেন? সবার চার্জ তো একি, আমি মুক্তি পাবো বাকিরা থেকে যাবে এটা কেমন কথা হলো। আমি কেন প্যারোলে মুক্তি নিবো? অনেকে আবার বঙ্গমাতা কে পরামর্শ দিয়েছিলো যে আপনি বললেই উনি রাজি হয়ে যাবে, উনাকে নাহয় একটু কম সাজা দেওয়া হবে, উনি চলে আসুক। বঙ্গমাতা তখন বলেছিলেন যে "না এটা তো আমি বলতে পারিনা আর এটাতো উনার ডিসিশন" এরপর আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সার্জেন্ট জহুরুল হক কে হত্যা করা হলো, খুব সম্ভবত **১৫**ই

ফেব্রুয়ারী। এরপর রাজশাহীর একজন প্রফেসরকে হত্যা করা হলো। আন্দোলনের সময় আসাদ মারা গেলো। সেই আসাদের গুলির সময় আমরা কাছাকাছিই ছিলাম, তোফায়েল ভাই, খালেদ ভাই, আব্দুর রউফ আমাদের ছাত্রলীগের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উনারা ছিলেন। এরপর ২৪ শে জানুয়ারি মতিউর নিহত হলেন। এইদিনকেই আমরা গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। এই আন্দোলন দানা বাধার এক পর্যায়ে ২২ শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু কে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর ২৩ তারিখে ছাত্রসংঘ পরিষদ থেকে উনাকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো রেসকোর্স ময়দানে। সেদিন ১০ লক্ষাধিক লোকের জমায়েত হয়েছিলো। অনেকেই তাকে সাড়ে তিন বছর পরে দেখতে এসেছিলো। সেসময় সভাপতির বক্তব্য সবার শেষে দেওয়ার কথা থাকলেও তোফায়েল ভাই বঙ্গবন্ধুর অনুমতি নিয়ে আগে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন কারণ বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের পরে সেখানে আর কেও থাকবেনা তিনি জানতেন। বঙ্গবন্ধু অনুমতি দিলে তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি শেখ মুজিবকে তুমি বলে সম্বোধন করে বললেন "নেতা তুমি জীবনে যৌবনের ১২টি বছর জেলখানায় কাটিয়েছো, আজ তুমি ফাসির মঞ্চ থেকে মুক্ত হয়ে এসেছো। আমরা তোমাকে মুক্ত করেছি, ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে তুমি মুক্ত হয়ে এসেছো। তোমাকে কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে আজ আমি একটা উপাধি দিতে চাই। তোমাকে আজ বঙ্গবন্ধু উপাধিতে আমরা ভূষিত করতে চাই।" আমরা ২০ লক্ষ হাত করতালি দিয়ে এটাকে স্বাগত জানালাম এবং সেই থেকেই তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু। এরপর ২৫শে মার্চ রাতে, ২৬মার্চের প্রথম প্রহর থেকে তিনি আমাদের জাতির পিতা।
সেদিন ২৩ তারিখে তিনি ভাষণে বললেন "তোমরা যে আন্দোলন করে আমাকে বের করেছো, এতে অনেক রক্তক্ষয় হয়ে, আমি এই রক্তের সঙ্গে বেইমানি করবোনা। তোমাদের দাবি নিয়েই আগামি দিনে আমি পথ চলবো "
১লা জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হয়েছিলো। এরপর নির্বাচনের জন্যে তিনি সারাদেশ ঘুরেছিলেন। এবং অনেকেই জানেননা যে তখন মার্শাল-ল থাকা অবস্থাতেই নির্বাচন হয়েছিল। তখন বেশকিছু উগ্রপন্থী সংগঠনও সক্রিয় হয়ে উঠছিলো। সেরকম কিছু সংগঠনের স্লোগান ছিলো "ভোটের বাক্সে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো", "ভোট চাইনা, ভাত চাই" ইত্যাদি। নির্বাচনের সময়

ক্যাম্পেইনের জন্যে বঙ্গবন্ধুর পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রায় আমি উনার সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। তৎকালীন এয়ারলাইনসের ভাড়া ছিলো ৫০০ টাকা, মাঝখানে ১২০০ মাইলের দূরত্ব। উনার সাথে পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার জন্যে আমি অনুমতি চেয়েছিলাম উনার কাছে। উনি পাইপে টান দিয়ে বললেন আচ্ছা যেতে চাও, যাবা, কয়েকদিন পরে পাসপোর্ট ভিসা লাগতে পারে তবে টিকেটটা তোমার কাটতে হবে। আমার হোটেলে থাকবা। সেই প্রথম ছিলো আমার জীবনের প্রথম প্লেনে চড়া এবং তাও বঙ্গবন্ধুর সাথে। বোয়িং বিমানে করে গেলাম পশ্চিম পাকিস্তান, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা উনাকে রিসিভ করলেন। প্লেনে আমার সাথে ছিলেন শফিউদ্দিন সারোয়ার, উনার কাছে চিঠি এসেছিলো যে বঙ্গবন্ধুকে এখানে আসতে মানা করো কারণ এখানে উনার উপর আক্রমণ হতে পারে। এটা বঙ্গবন্ধুকে প্লেনে থাকা অবস্থায় জানানো হলে তিনি উত্তর দিলেন "আই ডোন্ট কেয়ার"। প্লেন থেকে নামার পর তিরমিজি, হামিদ সারফারাজ এরা উনাকে সংবর্ধনা দিতে আসলেন করাচি এয়ারপোর্টে। এরপর আমরা বিচ লাক্সরি হোটেলে আমরা অবস্থান করলাম যেখানে সন্ধ্যায় তিনি লাইব্রেরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট ছিলেন। সেখানে তিনি সন্ধ্যায় ইংরেজিতে ২৫ মিনিটের বক্তব্য রাখলেন। সেখানেই প্রথম তার ইংরেজির প্রতি সুনিপুণ দক্ষতা দেখলাম আমি। এরপরদিন জনসভায় তিনি উর্দুতে বক্তব্য রাখলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি ৫৬%, তুমি ৪৪%, আমি মেজরিটি আমি কেনো ভাগ হবো, তোমরা ভাগ হয়ে যাও।" কতটা বুকের পাটা এবং দেশপ্রেম থাকলে পশ্চিম পাকিস্তানে দাঁড়িয়ে এ কথা বক্তব্যে বলা যায়।
এরপর ক্যাম্পেইন চলাকালীন ট্রেন রিজারভেশনে সমস্যা হওয়ায় আমাদের সরাসরি লাহোরে চলে যেতে বলে। আর উনি বাই ট্রেনে পেশোয়ার ঘুরে লাহোর মিটিংয়ে এটেন্ড করবে জানান। আমরা লাহোরে গিয়ে লাহোর হোটেল থেকে এডভোকেট বিএ সেলিমের ঠিকানা নিয়ে উনার বাসায় উঠি। এরপরে সেখানে পরেরদিন আরেকটি মিটিং হয়। এরপর আমরা দেশে ফেরত আসি।
দেশে আসার পর আমি এবং একেএম শামসু জোহা ভাই নির্বাচনের ক্যাম্পেইনের প্রথম মিটিং যাতে নারায়ণগঞ্জ হয় এই আবদার নিয়ে গেলাম তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায়। উনি বললেন একটু অপেক্ষা করতে সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আসবেন। একটু পরে

বঙ্গবন্ধু আসলেন। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন নারায়নগঞ্জের নেতারা এখানে কেন? জোহা ভাই বললেন মুজিব ভাই ক্যাম্পেইনের প্রথম মিটিংটা যাতে নারায়ণগঞ্জ হয়। তখন বঙ্গবন্ধু বললেন আদমজীর শ্রমিকরা হেটে এসে পল্টনে জনসভা করছে, তারা রক্ত দিছে। তাদের প্রতি আমার ঋণ বেশি। আমি ওইখানে আগে মিটিং করবো। নারায়নগঞ্জেও যাবো, কিন্তু শুরু করবো আদমজীতে। এ কথায় আমি রাজি হইলাম। তখনকার ছাত্রলীগের বিরাট অবদান ছিল, এখনকার ছাত্রলীগ আর ওই ছাত্রলীগের কোনো মিল খুজে পাবে না। যাইহোক, আদমজীর মিটিংয়ে তিনি প্রিন্সকোট পরে গিয়েছিলেন। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি হওয়ায় উনাকে মানিয়েছিলো ভালো। মিটিংয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আদমজীর ভাইদের উনার উপর বিশ্বাস আছে কিনা। সবাই হাত তুললেন। প্রায় দুই লক্ষের উপর মানুষ হয়েছিলো সেই মিটিংয়ে। তারপর তিনি বললেন যে তোমরা শুনে রাখো, আমার মাথা কিনতে পারে দুনিয়ায় এমন কেও নাই। তিনি পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন, এশিয়া কে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন কিন্তু সারা বিশ্বকে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন।

তিনি ৭ই মার্চের অধিবেশনেও বলেছিলেন "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমি দেশবাসীর অধিকার চাই।" নির্বাচনে ১৬৯ টা সিটের মধ্যে ১৬৭ টা সিট আওয়ামীলীগ জয় লাভ করে। নুরুল আমিন এবং আরেকজন বাদে সমস্ত সিট আওয়ামীলীগ লাভ করে। এটা কেও কখনো ভাবিনাই যে এরকম ঘটতে পারে। এজন্যে পশ্চিম পাকিস্তান এখানে ৫৬% সিট দিতে বাধ্য হয়েছিলো। যার কারনে আওয়ামীলীগের বিজয়ে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পান বঙ্গবন্ধু। কথা ছিলো ৩রা মার্চ অধিবেশন হবে এবং ৩৫ জন সদস্য আসবেন সেখানে। আমরা ১লা মার্চ ১ টার দিকে ডাকসুতে বসা, তখন রেডিওতে শুনতে পেলাম ইয়াহিয়া খান ভাষণ দিবে। এটা শোনার পর আমরা জহরুল হক হলের কমন রুমে রেডিও নিয়ে বসলাম সবাই। তখন ইয়াহিয়া কোনো বক্তৃতা দিলেন না তবে তার পক্ষ থেকে একটা বক্তৃতা পাঠ করা হলো ৫মিনিটের। সেখানে ইংরেজিতে বলা হলো যে অনিবার্য কারণবশত ৩ তারিখের অধিবেশন স্থগিত করা হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য। এই ঘোষণার ১০ মিনিটের মধ্যে সারা ঢাকা শহর থেকে মিছিল আসতে শুরু করলো কারণ ঐটা ছিলো আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। তখন সারা বাংলাদেশের কমন স্লোগান ছিলো "তুমি কে? আমি কে? বাঙ্গালী, বাঙ্গালী",

"তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা", "পাকিস্তানকে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো", "তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব"। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আব্দুর রউফ, যিনি মারা গেছেন, নোয়াখালীর খালেদ মাহমুদ, যিনি নোয়াখালী কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, এছাড়াও অন্যান্য পার্টির ১১ জন নেতাদের কেউ কেউ ছিলেন, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হলো সবাই আজকে থেকে আন্দোলনে যাবে এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী দিনগুলোর কর্মসূচি সবাইকে জানানো হবে। এরপর নেতারা সবাই মিলে পূর্বাণী হোটেলে গেলেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে নির্দেশনা নিলেন। এরপর ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট তোফায়েল ভাই (৬৯এর মুভমেন্টের পর ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন) সবাইকে নিয়ে ডিসিশন নিলেন যে ২ তারিখে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হবে। তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী লাল সবুজ পতাকার মাঝে তৎকালীন ইষ্ট পাকিস্তানের ম্যাপ আকা হলো যেটা পরবর্তীতে মন্ত্রীসভায় আলোচনা করে বাদ দেওয়া হয়। এরপর ২ তারিখে ডাকসু ভবনে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। উত্তোলনের পর সেখানে টিয়ার গ্যাস এবং লাঠি চার্জ করা হলো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৩ তারিখ পল্টনে জনসভার আয়োজন করা হলো সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে। উক্ত জনসভার শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু এসে হাজির হন সেখানে। সেই মিটিংয়ের বক্তব্যেই বঙ্গবন্ধু জানালেন যে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেনা, সেখানেই তিনি মার্চের ৭তারিখ রেসকোর্স ময়দানের কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। আর বললেন আজ থেকেই খাজনা ট্যাক্স সব বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেও কোনো প্রকার ট্যাক্স দিবেন না। তারপর তিনি ৭ তারিখ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখলেন। সেখানে বললেন ১০ তারিখের শহীদের রক্তের উপর দিয়ে হেটে যেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান দিতে পারে না। সেখানে ২৫ তারিখের পশ্চিম পাকিস্তানের দেওয়া সেমিনারে যোগদান সম্পর্কে বলেন, আগে দাবি মানতে হবে প্রথমে, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, মার্শাল-ল উইথড্র করতে হবে, সামরিক বাহিনীদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। তিনি জানতেন ৭ই মার্চের জনসভায় কামান ফিট করে রাখা হয়েছে। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা আসলে সেখানে বোমাবর্ষণ করা হবে। তাই তিনি বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের

মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি আরো বললেন পার্লামেন্টে কেও যৌক্তিক কথা বললে তিনি মেনে নিবেন।

৭ই মার্চের ভাষণের পর ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর ঢাকায় এসে আলোচনার বাহানা করলেন, যার আড়ালে ২৫ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে অস্ত্র আসতে থাকলো। ২৫ তারিখে আলোচনা ফেইল হলো, বিকেল বেলা হলে খবর আসলো যাতে আমরা হলে কেও না থাকি কারণ রাতে এটাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি হলে হলে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বলে আসি, সবাইকে জানিয়ে দিতে আজ রাতে হলে না থাকার জন্যে। আমরা রাত ১০ টার দিকে হল ত্যাগ করি, আর হলে এটাক হয় রাত ১২ টার পরে। তখন হলে আনফরচুনেটলি যারা ছিলেন তারা সবাই নিহত হন। আমি এক পরিচিত জনের বাড়িতে ছিলাম, এরপর ২৭ তারিখে কারফিউ উইথড্র হওয়ার পর আমি বের হয়ে হেটে হেটে হলে আসি, তখন রাজারবাগ পুলিশ লাইন, গুলিস্তান স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকা আর হলসমূহে অনেক লাশ রাস্তায় পরে ছিলো।

বঙ্গবন্ধুকে আগেই এডভাইজ করা হয়েছিলো উনার বাড়ি ত্যাগ করতে। কিন্তু তিনি বাড়ি ত্যাগ করেনি, বলেছিলেন আমাকে না পেলে পুরো ঢাকাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে ওরা। তারপর ২৫ তারিখ রাতে, ২৬ তারিখের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করলেন। এরপর নিজ বাসা থেকে তিনি ঐদিন রাতেই এরেস্ট হন। এরপর তাকে দুইরাত ক্যান্টনমেন্টে রাখা হয়েছিলো। তারপর তাকে লাহোরের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

যাইহোক, এরপর আমরা যারা পেরেছি ঢাকা থেকে বের হয়ে খোজ নেওয়া শুরু করেছি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে, কিভাবে কি শুরু করা যায়। তখন আগরতলা থেকে নির্দেশ আসলো, জয় বাংলা অফিস খোলা হয়েছে। সেটা এপ্রিল মাসে কথা বলছি আমি। আমার দুলাভাই এমএনএ ছিলেন, জাতীয় পরিষদের সদস্য, যাদের স্বাক্ষর আছে আমাদের সংবিধানে। আমরা সবাই সংগঠক ছিলাম, বিভিন্ন ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলাম অনেকেই।

কলেজটিলায় মাখন ভাইকে এবং এম এ রশিদ (স্বাধীনতার পর যিনি শেখ শহীদের সঙ্গে সেক্রেটারি হয়ে ছিলেন)। তখনও বাকশাল হয়নি। তো কলেজটিলায় গিয়ে ওদেরকে পেলাম। আমাকে দেখে উনারা খুব খুশি হলেন।

আমাকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুদিন পরে সেখানে একটা গøাস ফ্যাক্টরি আছে যেখানে মুজিব বাহিনীর একটা ক্যাম্প করতে দিলেন। যেটা একটা ট্রানজিট ক্যাম্প, শর্ত বলতে শুধুমাত্র ছাত্রলীগের সদস্য হতে হবে। সেখানে মনি ভাই আমাকে এবং মফিজ নামে একজনে দায়িত্ব দিলেন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে নরসিংদী এবং নারায়নগঞ্জ) জনবল রিক্রুটমেন্টের জন্যে। মনি ভাই চেয়েছিলেন যে যারা সত্যিকারের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত তারাই যাতে নারায়ণগঞ্জের এই ক্যাম্পে আসুক। তাদেরকেই ট্রেইন করে মুজিববাহিনীতে পাঠানো হবে। এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল রহমান খান, তোফায়েল আহমেদ এবং মনি ভাই। মনি ভাই সবার সিনিয়র ছিলেন সেখানে। তারা ৪টা জোনে ভাগ করে তাদের লোকজনকে সেখানে পাঠাতেন। ওদের ট্রেনিং হতো দেরাদুনের টান্ডুয়া ক্যাম্প। এটা ইন্ডিয়ায় অবস্থিত একটা মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্প। ওইখানে আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হলো, তবে তার আগে একটু দ্বিমত হলো ভারতের মন্ত্রীসভায় যে একটা দেশে দুইটি মুক্তিবাহিনী হয় কিভাবে। এই বিষয় নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের বৈঠক হয়। সেখানে মনির ভাই উনাকে ব্যাপারটা ভেঙ্গে বুঝান ইংরেজিতে যেহেতু মনির ভাইয়ের ইংরেজিতে দক্ষতা খুব ভালো ছিলো। তিনি বললেন একটা গ্রুপ জান বাচানোর জন্যে আসছে, আরেকটা গ্রুপ আছে যারা মুজিবের আদর্শ ধারণ করে। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠক হওয়ার পর উনি বুঝলেন ব্যাপারটা। দেহরাদুনের ক্যাম্পের দায়িত্বে বোধহয় জেনারেল ওমান ছিলেন ইনচার্জ হিসেবে। আমাদের মহকুমা থেকেই অনেকেই সেখানে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছেন। এরকম চলতে থাকলো।

এক পর্যায়ে দেখলাম ইন্দিরা গান্ধী ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বের হয়েছেন। তিনি এক জায়গায় এক ইন্টারভিউতে বললেন "আমি চিরদিন এদের কে এখানে রাখতেও পারিনা, আবার মানবিক কারণে আমি এদের বিদায়ও করে দিতে পারিনা।" সেই মুহূর্তে আমরা আচ করলাম হয়তো যুদ্ধ লাগতে পারে ভারতের পক্ষ থেকে কারণ আমাদের পক্ষ থেকে অলরেডি যুদ্ধ চলতেছে বিভিন্ন জায়গায়। কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী এবং ওখানকার ট্রেনিংপ্রাপ্ত সবাই একসাথে বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন করছেন, মারাও যাচ্ছেন অনেকে। এই যুদ্ধের মধ্যে আমার পিতাকে

আমি হারাই, যদিও আমি উনার মৃত্যুখবর অনেক পরে পাই। আমি উনার দাফনকার্য করতে পারলাম না।

মুক্তিযুদ্ধ যে হলো এটা একটা বিরল ঘটনা যে মাত্র নয় মাসে একটা দেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং একজন লোকের আহবানে হয়েছে। একক নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার গঠন হলো ১০ই এপ্রিল এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করলেন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়। যেটা আম্রকানন নামেও পরিচিত। এর আগেরদিনই ইন্ডিয়ান গভার্নমেন্ট উনাদের মেসেজ দিয়েছিলো যে পরেরদিন আপনাদের একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। পরেরদিন গাড়িতে উনাদের শপথ গ্রহণের কথা জানানো হয়। সেখানে শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি করা হয়, কারণ হিসেবে দেখানো হয় যে উনি কারাগারে আছেন, বেচে ফিরতে পারবেন কিনা ঠিক নেই। যাইহোক, তারপর সেই সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। সেই যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডারদের সাথে মুজিববাহিনীও একইরকম অপারেশন পরিচালনা করে, তখন মনির ভাই আমাদের বললেন তোমরা এখানে থাকো, আমি নির্দেশনা দিবো তোমাদের কি করতে হবে। এরপর ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো এবং আমরা সবাই বুঝতে পারলাম যে তারা এগিয়ে আসছে, আমাদের দেশ অচিরেই মুক্ত হবে। এরপর ১৩ দিনের যুদ্ধেই পাকিস্তানিরা সারেন্ডার করতে বাধ্য হলো। ৬ই ডিসেম্বর ভারত আমাদের নতুন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। তখন আমি ছিলাম জিরানিয়া বিএলএফ ক্যাম্প নামে একটা জায়গায়। তখন আমাদের কে জানানো হলো আর সৈন্য পাঠানোর দরকার নেই, যা আছে তাই দিয়ে যুদ্ধ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এর পরপরই সিজ-ফায়ার এর জন্যে জাতিসংঘে গেলেন ভুট্টো। সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩বার তারা আমাদের পক্ষে ভেটো প্রদান করেছিলো। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা যুদ্ধবিরতির বিপক্ষে ভেটো প্রদানের জন্যে। কারণ যুদ্ধ না হলে দেশ স্বাধীন হবে কিভাবে? এরপর জেনারেল নিয়াজী যৌথ বাহিনীর কাছে সারেন্ডার করলেন। মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী দের কাছে। তখন এদের ছিলেন জেনারেল অরোরা, মেজর হায়দার সহ আরো অনেকেই। ওসমানী সাহেব কোনো একটা কারণে সেদিন আসতে পারেন নি। জেনারেল নিয়াজী সেই রেসকোর্স

ময়দানেই আত্মসমর্পণ করলেন। এরপর আমাদের জানানো হলো তোমরা দেশে যাও। আমরা কুমিল্লা হয়ে দাউদকান্দির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সবার সাথে দেখা হলো সেখানে। অনেকেই আনন্দ মিছিল আর বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে মিছিল করা শুরু করলো। এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে ১০ই জানুয়ারির আগ পর্যন্ত শুধুমাত্র ভারত আর ভুটান ছাড়া অন্য কোনো দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নাই। কারণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইন্ডিয়ান সৈন্যদের অবস্থা ছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ৩৫০০এর মতো ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছিলো। ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। আমরা রেডিওতে শুনতে পাই যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি বিমান অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এরপর শেখ মুজিবকে নিয়ে বিমান অবতরণ করে লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে। সেখানে তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দিয়ে হোটেলে রাখা হয়। সেখানে এক দিন থেকে ৯তারিখে রওনা দিয়ে ১০ তারিখ বাংলাদেশে আসেন। আসার সময় দিল্লির এক বিমানবন্দরে তিনি যাত্রাবিরতি করলেন কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে। সেখানে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাকে সেখানে রিসিভ করেন। সেখানে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কয়েক মিনিট কথা বিনিময় করেন। তিনি ভারতে তার দেশে যুবকদের আশ্রয়, খাদ্য, অস্ত্র এবং ট্রেনিং দিয়ে সাহায্য করেছে যার জন্যে তিনি কৃতজ্ঞ তবে ভারতীয় সৈন্য কবে বাংলার মাটি ছাড়বে সেটা আপনি বলে দিন।

ইন্দিরা গান্ধী একটু চুপ থেকে জবাবে বলেছিলেন, আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই সকল সৈন্য আপনাকে স্যালুট দিয়ে বাংলার মাটি ছাড়বে। আপনার জন্মদিন ১৭ই মার্চ, আমি সেদিন যাবো, তার আগেই সকল সৈন্য ভারতে ফিরে আসবে। এবং ঠিক তাই ঘটেছিলো। অতঃপর তিনি বাংলাদেশে আসলেন ১০ তারিখ, এসে আগে জনতার কাছে গেলেন। সবার সাথে দেখা করলেন, তারপর গেলেন নিজের পরিবারের কাছে।

উনার ওজন কমে গিয়েছিলো ২০ পাউন্ডের মতো, উনাকে ফাসি দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে বলেছিলো, কবর খোড়া ছিলো। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আই এম রেডি টু ডাই কিন্তু তোমাদের কাছে একটা দাবি থাকবে আমার লাশটা যেনো বাংলার মাটিতে দেওয়া হয়, বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।



বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম খান

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবোনা।" -সেই স্মৃতি! সেই অবদান! সেই বাংলাদেশ! আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমার অনুরোধ, আমরা যে আদর্শ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, আমাদের সাথে যে মুক্তিযোদ্ধারা অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে জানাই সহস্র সালাম ও শ্রদ্ধা। লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আমরা কোনদিন ভুলবো না। তাই আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটাই অনুরোধ, এই ইতিহাস যেন কখনো ম্লান না হয়। এই স্মৃতিকথা তোমাদের হৃদয়ে চিরদিন লেখা থাকুক। তোমাদেরকে আদর্শের জন্য লড়াই করতে হবে। তোমাদের চলার পথে জীবন এবং জীবিকা যাই হোক না কেন, কখনো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হইও না। আমরা বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহবানে সারা দিয়েছিলাম। আমরা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এখনো ঘরে ফিরে আসিনি। এখনো সেই স্বাধীনতাকে নিয়ে, এই বাংলাদেশকে নিয়ে অনেক চক্রান্ত, অনেক ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে যেমন এই স্বাধীনতা অর্জিত হতো না, ঠিক তেমনি চিরকাল ওরা ষড়যন্ত্র করেই যাবে, আর আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। ওদের ষড়যন্ত্র

প্রতিহত করতে হবে। আমাদেরকে আমাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। বর্তমান প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আজকে আমি নিজের পরিচয় দিয়ে শুরু করতে চাই। আমি প্রফেসর ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম খান। বর্তমানে বারডেমে কর্মরত রয়েছি। আর আমি সাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান। আমার বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া ইউনিয়নে। সেখান থেকেই আমার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু। ১৯৭১ সালে আমি যখন মেডিকেলের ছাত্র, তখন মার্চ মাসের অনেক আগে থেকেই বিপ্লবের দানা বাঁধে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরেও পাকিস্তানি সরকার নানা রকম ছলচাতুরি, বাহানা করে তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইল না। তা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। সেই ষড়যন্ত্রে ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান জড়িত ছিল। শেষ পর্যন্ত জুলফিকার আলী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিরঙ্কুশ বিজয়ের অধিকারী। মার্চ মাসে যখন আন্দোলন দানা বাঁধে, তখন আমি সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে ঢাকায় চলে আসি। ঢাকায় এসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার সৌভাগ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ, সেই বক্তব্য আজ সারা পৃথিবীব্যাপী দ্য হেরিটেজ। এখন ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত, পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত, সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাষণ। আর আমি সেই ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিকেল তিনটার দিকে সেই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধুর যে আহ্বান, অভিব্যক্তি, যে দৃঢ় প্রত্যয়, যে কণ্ঠে উনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম্. জয়বাংলা।" এই কথা বলে উনি শেষ করেছিলেন। তার আগে উনি একটু ইতিহাস এবং পটভূমি তৈরি করেছিলেন। তেইশ বছরের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, নির্মম হত্যার ইতিহাস। আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, আমার ভাইয়ের বুকের রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস। মাত্র উনিশ কি

একুশ মিনিটের সাজানো-গোছানো বক্তৃতায় উনি পুরো সংগ্রাম এবং তখনকার পাকিস্তানি জান্তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি পরিপুর্ন ধারণা দিয়েছিলেন। আমাদেরকে কি কি করতে হবে, সেই দিকনির্দেশনাও দিয়েছিলেন। আমরা ওনার ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এদিকে ২৫শে মার্চ কালো রাত, অপারেশন সার্চলাইট, ঘুমন্ত ঢাকাবাসীর উপরে ট্যাংক, অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাপিয়ে পরল। শত শত লোককে ওরা মেরে ফেলল। সেদিন রামপুরা টেলিভিশন স্টেশন ওরা দখল করল। রাজার বাগ পুলিশ লাইনে ওরা আক্রমণ চালালো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতেও ওরা হত্যাযজ্ঞ চালালো। আরো বহু জায়গা, বহু স্থাপনায় ওরা আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হত্যাযজ্ঞ চালালো। ঢাকা নগরীকে অন্ধকার এবং বিভীষিকাময় করে তুলল। সেই ইতিহাস আপনারা জানেন। বিভিন্ন জায়গায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সেই যে আক্রমণের পটভূমি দেখলাম, সেই সময়ে আমরা ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম। অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধের যে আহ্বান দিয়েছিলেন। উনি একটা জাতিকে সুসংগঠিত করে যেভাবে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" আবার উনি এখানে এভাবে বলেছিলেন যে, "আমি যদি তোমাদের হুকুম দিতে নাও পারি। তোমাদের কাছে আমার হুকুম রইল। তোমাদের হাতে যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।" এই কথা গুলোর মাধ্যমে একটা জাতিকে যে দিকনির্দেশনা বা যে আহ্বান করা হয়, তা একজন অবিসংবাদিত নেতা ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব না। আমি মনে করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে এই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হতো না, এই দেশ স্বাধীন হতো না। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম যেখানে যত বড় ষড়যন্ত্রই থাকুক না কেন, যত বড় আক্রমণই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে। আমি তখন আমার নিজ এলাকায় ফিরে যাই। সেখানে ফিরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনা মোতাবেক আমার এলাকা মোরেলগঞ্জের খাউলিয়া ইউনিয়নের সন্নাসী স্কুলের মাঠে আমার বড় ভাই জনাব মোঃ আব্দুর রহিম খান, আমার ছোট ভাই আব্দুল হাই খান, লিয়াকত আলি কমান্ডার, আব্দুল ওয়াদুদ ফরাজী, আরও অনেককে নিয়ে আমরা স্বেচ্ছাসেবক

বাহিনী গঠন করি। সেখানে মোরেলগঞ্জ থানা থেকে বাচ্চু ডাক্তার সাহেব, স ম কবির আহমেদ মধু এবং লিয়াকত আলি খান, ওনারা অস্ত্র নিয়ে এসে আমাদেরকে দিলেন এবং আমরা সেখান থেকে ট্রেনিং শুরু করলাম। দু-চার দিন যেতে না যেতেই আমরা বুঝে ফেললাম যে, দেশে বিশৃঙ্খলা বা গন্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। চুরি-ডাকাতি, লুটপাট শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি, আমার মামাতো ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াদুদ ফরাজী, তেলিখালীর ফজলু কমান্ডার তিনজনে মিলে বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে, পিতা মাতার স্নেহ, আদর, মায়া, মমতা ত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম। ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা করার আগের দিনও আমি আমার পিতার সাথে আলাপ করছিলাম। আমার পিতা আমাদেরকে বলতেন যে, তোমরা যুবক, ছাত্র। তোমাদের উপরে এখনো কোনো দায় বদ্ধতা আসেনি। তোমরা দেশ স্বাধীন করতে চাইলে বিদেশে যাও, প্রশিক্ষণ নাও, যুদ্ধ কর। হয় শহীদ হও, না হলে গাজী। কিন্তু তোমাদের আত্মত্যাগ ছাড়া এদেশ স্বাধীন হবে না। আমি সেই বাবার সন্তান। বাড়িতে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি লিখেছিলাম যে, "আমার শ্রদ্ধেয় মা-বাবা, আমি ভারতে যাচ্ছি। প্রশিক্ষণ নিব। তারপর দেশে ফিরব। মুক্তিযুদ্ধ করব। ইনশাআল্লাহ এই দেশ স্বাধীন হবেই হবে। ইতি, আপনাদের স্নেহের সালাম।" এই চিরকুট লিখে রেখে আমি রওনা করেছিলাম। বাড়ি থেকে ভোররাতে পালালাম। চলে গেলাম মোরেলগঞ্জে। আমি, ওয়াদুদ ভাই আর ফজলু কমান্ডার। আমরা তিনজন গিয়ে উঠি তখনকার নুর চেয়ারম্যান, আমার চাচাতো বোনের জামাই ওয়াজেদ ভাই, উনাদের কাছে। ওয়াজেদ ভাইকে বললাম যে, "ভাই, আমার আব্বা-মাকে বলবেন আমি ইন্ডিয়া যাচ্ছি।" চেয়ারম্যান নুর দা বললেন, "ডাক্তার, তুমি যেওনা। এখানে থাকো।" আমি বললাম, না, আমাকে ওখানে যেতেই হবে। বাধা দিয়েন না। উনারা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি খাবে?" তখন মোরেলগঞ্জের শফি ময়রার ছানার জিলাপিটা আমার খুব পছন্দের ছিল। উনারা সেই ভোর রাতে শফি ময়রাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আমার জন্য সেই জিলাপি আনলেন। তাই খেয়ে আমরা রওনা করলাম। মোরেলগঞ্জের কামার হাটখোলা, তারপরে জিউধরা হয়ে আস্তে আস্তে রামপালের দিকে এগোতে থাকি। এখান থেকে বেলা এগারোটা কি সাড়ে এগারোটার দিকে আমরা মংলা পোর্টে

উঠি। মংলা পোর্টে উঠে দেখি পাকিস্তানি আর্মি রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে আর সেখানে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। আমাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কিধার সে আতা হ্যাঁয়, কেয়া কারতা হ্যাঁয়, কিধার জাওগে।" তখন আমরা এতো ভালো উর্দু জানতামনা। ইশারা-ইঙ্গিতে আমরা বোঝালাম যে আমরা গ্রামের লোক। গরু ব্যবসায়ী। নৌকায় করে ওপারে বানিশান্তা যাব। গরুর ব্যবসায়ী বলি আর যাই বলি, বাড়ি থেকে মাত্র একশ বিশ টাকা নিয়ে, একটা লুঙ্গি আর একটা হাফ শার্ট পড়ে রওনা করেছিলাম। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা বানিশান্তা পৌছালাম। এখান থেকে আমরা পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে থাকি। কখনো খাল আসে, খাল সাঁতরে পার হই। আর যে শরণার্থী দেখতে শুরু করলাম, সেই সাথে কুকুরের ডাক, সে যে কি করুণ দৃশ্য। কত হৃদয়বিদারক। আজও ভুলতে পারি না। তারপর আমরা সেই শরণার্থীদের দলের পিছনে যোগদান করি। একটা শরণার্থী পরিবারের সাথে এক হয়ে প্রায় চার-পাঁচ রাত বসে কপোতাক্ষ, ইছামতি নদী পার হয়ে ওপারে ইন্ডিয়ান বর্ডারে রানাপিন্ডে গিয়ে নামি। সেখানে গিয়ে প্রথম দিনই পি.সি. কলেজের গণিতের প্রফেসর সুধাংশু দাকে পেলাম। উনি আমার বড় ভাইয়ের সহকর্মী ছিলেন। উনি আমাকে দেখেই চিনলেন। উনি ওনার ফ্যামিলি নিয়ে সেখানে বটগাছের নিচে জোড়ামন্দিরে আমাদেরকে কিছু খাবার দিলেন, যেহেতু আমি ওনার বন্ধুর ছোট ভাই ছিলাম। কিন্তু বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমার উতলা মন অস্থির ছিল, কত তাড়াতাড়ি আমি কলকাতায় পৌঁছাব। কলকাতা যাওয়ার জন্য সেখানে ট্রেন ছিল। তখন টিকিটের কোন বালাই ছিলনা। শুধু জয়বাংলা হলেই হল। এই ট্রেনে চড়ে বিনা টিকিটে আমি বারাসাত নামলাম। সেখান থেকে আরেকটা ট্রেনে চড়ে আমি কলকাতায় চলে গেলাম। ওয়াদুদ ভাই আর ফজলু, তারা শরনার্থীদের সাথে সেখানে থেকে গেল। তাদেরকে অনেকটা জোর করেই আমি ছেড়ে আসলাম। বুঝতে পারছিলাম যে তারা মন্থর গতিতে আগাতে চাচ্ছে। আমি যখন পার্ক সার্কাস রোডে বাংলাদেশ হাই কমিশনার টি হোসেন সাহেবের সাথে দেখা করলাম, তখন আমার সাথে মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টের একটা আইডি কার্ড ছিল। এটা খুব সম্ভবত ২১ এপ্রিল ছিল। আর ততক্ষণে মুজিবনগর সরকার গঠন হয়ে গিয়েছিল। উনি আমার আইডি কার্ড দেখেই আমাকে মুজিবনগর সরকারের অধীনে হেলথ এসিস্ট্যান্ট পদে একটা

চাকরি দিয়ে দিলেন। আমাকে পোস্টিং দেয়া হলো বারাসাতে। আমার কাজ হলো সাহারা মরুভূমির উত্তরদিকে ছিচল্লিশ হাজার শরণার্থীকে টিকা দেওয়া এবং রেশন বন্টন করা। কাজে যোগ দিলাম। কলকাতা থেকে বারাসাতে গিয়ে রিপোর্ট করি আবার কলকাতাতে ফিরে আসি। আমাদের তখনকার এমপি ছিলেন শেখ আব্দুল আজিজ, যিনি বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী। উনি থাকতেন হোটেল ইন্ডিয়াতে ১০৪ নম্বর রুমে। আমি ওনার সাথে দেখা করি। উনি আমার মুখে সবকিছু বিস্তারিত শুনে হাতে চারটা টাকা দিলেন। বললেন, "ডাক্তার আসছো, এটা নাও, কিছু খাওয়া-দাওয়া করো।" আমি এর পরে চলে আসি হোটেল শ্রীনিকেতনে, ১২১ নম্বর রুমে। সেখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভাষণ লেখা হচ্ছিল। রাতে আমি এখানেই ফিরে আসতাম। এখানে মঠবাড়িয়ার ক্যাপ্টেন আলতাফ, উনাকে আমি ছাত্রজীবন থেকেই চিনতাম। এখানে এসে আমি ওনাদের সাথে গল্প-গুজোব করতাম এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভাষণ লেখার কাজে সহযোগিতা করতাম। ওখানে নূরে আলম সিদ্দিকী, উনিও ছিলেন এবং তখন থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে আমাদের ভালো যোগাযোগ ছিল। দিনের বেলা কোলকাতা থেকে বারাসাতে এসে কাজ করতে করতে বারাসাতের একজন সিভিল সার্জন, ডক্টর রায়, উনি আমাকে বললেন যে, "সালাম, তুমি এখানে কাজ করে কলকাতায় ফিরে না গিয়ে এখানেই থাকো। আমার বাসায় খাওয়া-দাওয়া করবে এবং আমার ক্যাম্পাসে তুমি থাকবে। সকাল হলেই তুমি তোমার কাজ শুরু করতে পারবে।" তখন ওরা আমাকে যে কাজ দেয়, আমি সেই কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে থাকি। হঠাৎ করে একদিন দেখি আমার সাথে ইন্ডিয়াতে আশা ওয়াদুদ ভাই, ফজলু, তারাও লাইনে দাঁড়িয়েছে এবং আমার এলাকার আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা। বাদল, ডক্টর অমূল্য রতন আর তার দুটো বোন, মোবারক উল্লাহ ভাই। বিকেল হলেই ওনাদের সাথে দেখা হতো আর ওনাদের সাথে সেখানে গল্প-গুজোব করতাম। চাকরি জীবনে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমার প্রথম মাসের বেতন পাই তিনশত ষাট টাকা। এটা ছিল আমার জন্য একটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ব্যাপার, কিন্তু এই চাকরিটা আমি একমাসের বেশি করতে পারিনি। কারন আমার মন পড়েছিল কখন আমি প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকব, মুক্তিযুদ্ধ করব। আমি আবার পার্কসার্কাস রোডে

বাংলাদেশ হাইকমিশনের টি হোসেন সাহেবের সাথে আবার যোগাযোগ করি। এবার উনি আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যাবার জন্য অনুমতি দেন এবং আমাকে একটি ছাড়পত্র দেন। সেই ছাড়পত্র নিয়ে আমি চলে যাই হাসনাবাদ, টাকি জোড়া মন্দির, যেটা ছিল ৯ নাম্বার সেক্টরের হেডকোয়ার্টার। এখানে আসার পরে অনেকের সাথে পরিচয় হয়। উনারাই আমাকে সবরকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন। আমাকে পাঠিয়ে দেন বিহারের চাকুলিয়াতে। চাকুলিয়া ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বড় গেরিলা যুদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানে আমরা প্রশিক্ষণ নিতে যাই। আর আমাদের যে ব্যাচটা সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলাম, সেই ব্যাচে আমার সাথে ছিল শরণখোলার আফজাল, শরণখোলার কিরণ, শরণখোলার মোস্তফা পল্টু, সিলেটের মহাসিন, তিনি সাবেক মন্ত্রী ছিলেন আমার বন্ধু মানুষ। ইকবাল হোসেন চৌধুরী মেডিকেল কলেজে আমার ক্লাসমেট ছিল। সেও ছিল এই ব্যাচে। সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আমারই একজন সহযোদ্ধাকে হঠাৎ করে সাপে কামড়ায়। সাপে কামড়ালে কি করতে হয়, একজন মেডিকেলের ছাত্র হিসেবে সেটা আমার জানা ছিল। তখন আমি আমার সেই সহযোদ্ধাকে একজন মেডিকেলের ছাত্র হিসেবে আমার যতটুকু সেবা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল, আমি তা দিয়েছিলাম। আমাদের উইংয়ের দায়িত্বে ছিলেন সুবেদার মেজর জগদিশ। বাংলাদেশি কাউন্টার পার্ট থেকে দায়িত্বে ছিলেন মেজর শামসুদ্দীন। ওনারা আমাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য মাঠে নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে শরীর ওয়ার্মআপ করাতেন এবং স্ট্যামিনা বাড়ানোর জন্য দূরে একটা গাছ দেখিয়ে বলতেন, "ঐ গাছের ডানদিক থেকে গিয়ে বাঁ দিক থেকে ঘুরে আসবে। দলের মধ্যে থেকে মাত্র পাঁচজন একবার করে ঘুরে এসে দাঁড়াবে। বাকি সবাই দুবার ঘুরবে।" আমি তখন একবার ঘুরে আসা পাঁচজনের মধ্যে থাকতে পারতাম না। আমাকে দু'বার ঘুরতে হতো। কিন্তু যেদিন আমার সহযোদ্ধাকে সাপে কামড়ানোর পরে সেবা দিলাম, সেদিন থেকে আমাদের সুবেদার মেজর সাহেবের আমার প্রতি মন-মানসিকতা কিছুটা নমনীয় হয়ে গেল এবং তিনি আমাকে একটা দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। আমাদের এক মাসের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এক মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আমার ব্যাচের সহযোদ্ধাদেরকে অপারেশনের জন্য

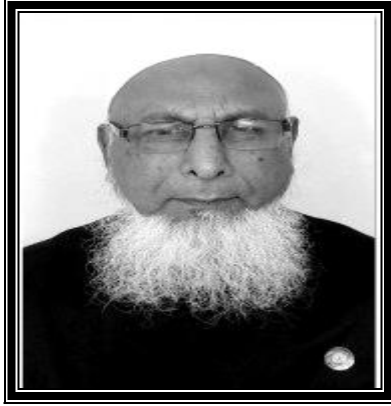
বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিল কিন্তু আমাকে যেতে দিল না। আমাকে আরও অতিরিক্ত এক মাসের জন্য রেখে দিল। এই ঘটনাতে আমি মানসিকভাবে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লাম। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে আমাদেরকে শেখানো হলো প্রায় সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর কৌশল। যেমন এসএলআর, এলএমজি, ডেটোনেটর, সেফটি ফিউজ, এন্টি ট্যাংক, হ্যান্ড গ্রেনেড, থার্টিসিঙ গ্রেনেড, লিভার, ইত্যাদি সমস্তকিছু প্রশিক্ষণ শেষ করে কোর্সের শেষের দিকে আমাদেরকে একটা জয়বাংলা প্যারেড করাতো। এই জয়বাংলা প্যারেড ছিল আড়াই দিনের। এখানে আমাদের দলের মধ্যেই দুটো দলে ভাগ হয়ে একপক্ষ মুক্তিযোদ্ধা, আরেকপক্ষ পাকিস্তান আর্মি। এভাবে একটা প্র্যাকটিক্যাল যুদ্ধ ময়দানের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। যেকোনো ট্রেনিং এর শুরুতে আমরা জয়বাংলা এবং আমাদের জাতীয় সংগীত, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি," এই দিয়ে শুরু করতাম। যাহোক এভাবে আমাকে আরও অতিরিক্ত একমাস রেখে দিল। অতিরিক্ত এক মাসের মধ্যে আমার থাকার জায়গাটা নির্ধারণ করা হলো মেজর শামসুদ্দিন যিনি চাকুলিয়াতে বাংলাদেশ কাউন্টার পার্টের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, উনার তাঁবুতে। তখন আমাদের ঐ কেন্দ্রে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। ইন্ডিয়ান শিল্পীরা আসতেন। আমরা ওগুলো দেখতাম, খুব ভালো লাগতো। সিএসডি তে যেতাম, কোন কিছু কেনাকাটার থাকলে তা করতাম। এগুলো আমাদের সেই প্রশিক্ষণেরই অংশ ছিল। আমার জন্য অতিরিক্ত এই একমাস অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল। আমি সবসময় ভাবতাম কিভাবে এখান থেকে বের হব, যেতে দিবে, না পালিয়ে যাবো। একদিন হঠাৎ আসম আব্দুর রব সেখানে গেলেন প্রণোদনা মূলক বক্তব্য দিতে। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, "নেতা, আমি এখানে আসছি প্রশিক্ষণ নিতে। প্রশিক্ষণ শেষ করেছি। সবকিছুই আমি ভালোভাবে রপ্ত করেছি, কিন্তু এখন এরা আমাকে ছাড়তে চাচ্ছেনা।" ইন্ডিয়ান আর্মিরা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতো। যখন থেকে আমি আমার সাপে কামড়ানো সহযোদ্ধাদের সেবা দিতে থাকি, তখন থেকেই তারা আমার কাজে-কর্মে আমার ভিতর প্রতিভা, দক্ষতা বুঝতে পেরেছিল। যাহোক এভাবে আমি আসম আব্দুর রব, উনাকে বুঝাতে সক্ষম হই এবং উনার জিপ গাড়িতে করেই কলকাতায় ফিরে আসি। কলকাতায় ফিরে এসে আমি আমার

অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে আবার জোড়া মন্দির ৯ নাম্বার সেক্টর অফিসে চলে যাই। সেখানে গিয়ে যখন আমি উৎসাহ উদ্দিপনামূলক বক্তব্য দেই, তখন আমার সেই বক্তব্য শুনে সেক্টর ৯ কমান্ডার মেজর জলিল, ডক্টর শাহজাহান, কর্নেল হুদা, ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ, সুন্দরবনের মেজর জিয়াউদ্দিন, উনারা আমাকে ডাকলেন। আমি ওনাদের সামনে গিয়ে একজন অত্যন্ত চৌকশ সেনা সদস্যের মত একটা স্যালুট দিয়ে কথা বলা শুরু করলাম। ওনারা বললেন, "ইউ আর ভেরি স্মার্ট গাই। তুমি কোথায় জয়েন করতে চাও।" আমি তখন জেনে নিলাম কে কোথায় দায়িত্বে রয়েছেন। যখন জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন বেগ আমার বিএম কলেজের প্রফেসরের ছেলে এবং তার পোস্টিং ছিল সাতক্ষীরার বর্ডার এলাকায়, সেখানেই তিনি তার টিম নিয়ে থাকেন, অপারেশন পরিচালনা করেন। তখন আমি তাঁর দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললাম যে, "আমি ওনার সঙ্গে যেতে চাই।" আর আমি যে ওনার সঙ্গে যেতে চাই বা ওনাকে পছন্দ করেছি, এটার জন্য উনি খুব খুশি হলেন। তখন থেকে আমি তার সঙ্গে থাকতে লাগলাম। ওনার সঙ্গে যাওয়ার পরে সেখানে গিয়ে দেখলাম, ওনার দলে আমার মত বেশকিছু শিক্ষিত ছেলেপেলে রয়েছে যাদেরকে উনি আলাদাভাবে থাকার জন্য তাবু দিয়েছিলেন। সেক্টর ৯ থেকে বের হওয়ার পর হাসনাবাদ থেকে আরও নিচের দিকে কৈখালী, শ্যামনগর এলাকাতে ইন্ডিয়ান আর্মির নির্ধারিত অঞ্চলে আমরা দিনের বেলা ক্যাম্প করে থাকতে লাগলাম। সূর্য ডোবার পরে রাতেরবেলা আমরা অপারেশন পরিচালনা করতাম। আবার ভোর হওয়ার আগেই "জয় বাংলা" বলে ফিরে আসতাম। ক্যাপ্টেন বেগ এবং ক্যাপ্টেন মাইনুল, ওনারা দু'জন অপারেশন পরিচালনার নেতৃত্ব দিতেন। ক্যাপ্টেন বেগ এবং ক্যাপ্টেন মাইনুলের ওয়াকিটকি ছিল। উনারা ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ করতেন। উনাদের দু'জনের সাংকেতিক নাম ছিল। ক্যাপ্টেন বেগের টাইটেল ছিল 'তাজ' আর ক্যাপ্টেন মাইনুলের টাইটেল ছিল 'ফন্ড'। মাইনুল মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ আর্মির প্রথম ব্যাচ। উনাদের মধ্যে ওয়াকিটকিতে কথোপকথন হতো। বিভিন্ন অপারেশনের তথ্যগুলো দেয়ানেয়া হতো। কখনো কখনো পাকিস্তান আর্মির সাথে আমাদের তথ্যগুলো একটার ভিতরে আরেকটা ঢুকে যেত। এভাবেই আমাদের কাজ চলতে থাকে। বিওপি, কৈখালী, শমশেরনগর, ভেটখালী, এই

অঞ্চলগুলোর মধ্যে আমাদের বিচরণ ছিল। একদিন হঠাৎ সকালবেলা পাকিস্তান আর্মির গানবোট এসে অতর্কিত ব্রাশফায়ার করতে শুরু করল। আমরা তখন দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ছোটাছুটি শুরু করি। তখন ইন্ডিয়ান নৌবাহিনী এসে আমাদেরকে উদ্ধার করে এবং পাকিস্তানি গানবোট দু'টিকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়। প্রথমদিকে আমরা রাতে অপারেশন করে সকালে ফিরে আসতাম। আস্তে আস্তে যতই সময় অতিবাহিত হতে লাগল, আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। এবং একপর্যায়ে অপারেশন করে আমরা সেদিকেই থেকে যেতাম। আর ফিরে আসতে হতো না। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানা, গাবুরা ইউনিয়নের তখনকার চেয়ারম্যান, সেক্টর ৯ এর মেজর জলিল যখন একটা লঞ্চ নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই লঞ্চটিকে সেই চেয়ারম্যান তার লোকজন নিয়ে তার ঘাটে আটক করেছিল। তারপর সেই লঞ্চে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তারা নানা রকম ভাবে নির্যাতন করে। এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। সেই লঞ্চটির নাম ছিল "দ্যা বিউটি অফ খুলনা।" সেই লঞ্চে আমাদের অনেক রেশন ছিল, অস্ত্র ছিল। সেই লঞ্চে আমাদের সাবেক চিফ হুইপ আসম ফিরোজ ছিলেন। আমরা এই অঞ্চল গুলোতে এসে যখন অপারেশন পরিচালনা করি, তখন প্রায় সময়ই আমরা ওদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হই। আস্তে আস্তে আমরা গ্রাম, ইউনিয়নগুলো দখলে নিয়ে নিয়ে ভিতরের দিকে যেতে থাকি। ঐ সময়গুলোতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি আমাদের হয়নি। যেদিন আমরা শ্যামনগর থানা দখলে যাই, সেদিন ছিল ঈদের দিন। আগের রাতে বসন্তপুর থানার পশ্চিম পাশে আমরা যখন আক্রমণে যাই, সেটা ছিল ত্রিমুখী আক্রমণ। কালিগঞ্জ থেকে একটা দল। এদিকে ক্যাপ্টেন বেগের আরেকটা দল, আর মেজর আরেফিনের আরেকটা দল। তিনটি দলের সম্মিলিত আক্রমণ, এবং সেই যুদ্ধে আমাদের চার জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। আমার সাথের একজন সহযোদ্ধা যখন আমরা ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রলিং করে এগোচ্ছিলাম, তখন একটা গুলি এসে তার মাথায় লাগে এবং তার মাথা দিয়ে ঘিলু বেরিয়ে আসে। সেই বীভৎস দৃশ্য সত্যিই ভুলার মত নয়। সেখানে আমাদের সেই চার জন মুক্তিযোদ্ধার কবর রয়েছে। ঈদের দিন সকালে আমরা সেই থানা জয় করি। সকালে সেখানে আমরা বিজয় উল্লাস করি। সেখানে আড়ৎদাররা আমাদের কাছে কিছু রেশন, কাপড়-চোপড় দিয়ে যায়।

সেগুলো আমরা আবার স্থানীয় গরিব-দুঃখীদের মাঝে বন্টন করি। গ্রামে যারা রাজাকার-আলবদর ছিল, তারা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমাদের যখন ওদের সাথে যুদ্ধ করতে হতো, তখন আমাদের মনে খুব কষ্ট লাগতো যে আমরা বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীদের সাথে যুদ্ধ করছি। তারা কেউ কেউ ধরা পড়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে। কাউকে কাউকে ধরে আমরা ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাউকে কাউকে যখন যে ব্যবস্থার প্রয়োজন, তা করেছি। আমাদের হাতে মাইন, ডিনামাইট ও বিবিধ অস্ত্র ছিল। অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে যখন মুক্তিযুদ্ধ প্রায় শেষের পথে, তখনকার একটা দৃশ্য আমার চোখে ভেসে ওঠে। কপোতাক্ষ নদীর মধ্যে যখন আমরা আক্রান্ত হই, তখন আমাদের নৌকা থেকে দু'টো মেয়েকে পাকিস্তান আর্মি টেনে-হিঁচড়ে তাদের গানবোটে তুলে নিল। তখন তাদের মা-বাবার সে কি চিৎকার! তখন পাকিস্তান আর্মি তাদেরকে গুলি করে পানিতে ফেলে দিলো আর নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে গেল। আমি তখন নিজেকে আড়াল করে ফেললাম। হয়ত সামনে গেলে আমাকেও গুলি করে ফেলে দিত। সেই স্মৃতিগুলো আমি ভুলিনি আর ভুলবোও না। সেই মুক্তিযুদ্ধের আমি যতগুলো আক্রমণ দেখেছি, তার মধ্যে সবথেকে কষ্টের স্মৃতি ছিল শ্যামনগর দখল। মুন্সীগঞ্জে আরেকটা অপারেশনে আফজাল ভাই, তারেক খন্দকার, ক্যাপ্টেন বেগ, ইনাদের সাথে অপারেশনে যাই। সেই অপারেশনে এগারোজন রাজাকার-আল বদর পরাস্ত করি। তাদেরকে আমাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসি। পাঁচজন আত্মসমর্পণ করে। বাকীদেরকে আমরা ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে হস্তান্তর করে দেই। ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলমে বেগের নেতৃত্বে আমরা জমায়েত হই। সেখানে বরিশালের নুরুল ইসলাম মঞ্জু সাহেব ছিলেন, আসম ফিরোজ ছিলেন। আমরা বিশ-বাইষটা বাওয়ালিদের নৌকা এক একটা লঞ্চের পিছনে বেঁধে নৌবহর করে শ্যামনগর থেকে যাত্রা শুরু করি। আস্তে আস্তে সুন্দরবন হয়ে বোগিতে আসি। সেখানে এসে আমি মেজর জিয়াউদ্দিনকে পাই। শামসুল আলম তালুকদার, উনাকে আমি দাদা ডাকতাম। ওনার বাড়ি রায়েন্দা শরণখোলা। উনার কাছে আমার আব্বা-আম্মার জন্য একটা চিঠি লিখে দিলাম। জানিয়ে দিলাম যে, "আমি জীবিত আছি, ভালো আছি। ক্যাপ্টেন বেগের সাথে বরিশালে যাচ্ছি।" তিনি এত দয়ালু ছিলেন, সেই চিঠিটা তিনি যেকোন ভাবেই আমার আব্বা-আম্মার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তারা

আমার হাতের লেখা দেখে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে আমি জীবিত আছি। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলের স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসা দূরে ঠেলে আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমার জন্য দু'টো পথ খোলা ছিল। হয় স্বাধীন দেশ, না হয় মৃত্যু। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে বিধায় আমরা জীবিত আছি। যদি আমরা স্বাধীন না হতাম, তাহলে কি হতো, তা হয়তো আপনারা ধারণা করতে পারছেন। যে স্বাধীনতার জন্য আমার বাবার বুকের উপরে রাইফেল ঠেকিয়ে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। তা না হলে আমার বাবাকে হত্যা করবে এবং বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিবে। আমার মাথার জন্য দশ হাজার টাকা ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছিল। জীবিত অথবা মৃত, আমার মাথা যদি জমা দিতে পারে, তাহলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। আমিতো সেই সালাম, সেই গাজী, সেই বঙ্গবন্ধুর সৈনিক, যার উদাত্ত আহ্বানে একটা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি স্ব-শরীরে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। এটাই আমি আমার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করি। একটা স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা গৌরবের কথা। ভাগ্যের ব্যাপার। দেশ স্বাধীন হয়েছে। হাজার বছরেও আরেকটা মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হবেনা। মুক্তিযোদ্ধা বারেবারে আসবেনা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের আত্মবিসর্জন দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম। এক এক করে বারোজন সহযোদ্ধার সাপের কামড়ের ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে বিষ টেনে নিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে কাজ করতে পিছুপা হইনি। কিন্তু একটা মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। আমি সেজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। আমি চাই এই সেই সোনার বাংলা, বঙ্গবন্ধুর বাংলা, যে দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনও দিয়েছেন। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এবং তিন লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে বাংলা তিনি রচনা করে দিয়ে গিয়েছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, দুর্দান্ত সাহসীকতা এবং ভূমিকা, অগণিত মানুষের দোয়া এবং মনের চাওয়া যে সফল হয়েছে, বাস্তবায়ন হয়েছে, এজন্যই আমরা গর্বিত। আর তাইতো আমরা বলি, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"



বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ আকরাম আলী

"সবেমাত্র ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজে ভর্তি হয়েছি। ১৯৬৯ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের পতন হয়েছে। ইয়াহিয়া সরকার ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অংশ নেয়। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে প্রচারণার জন্য বরিশাল থেকে পথসভা করতে করতে ফরিদপুর হয়ে ঢাকা রওনা দেন। বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখবো বলে ফরিদপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে আমার আব্বা আঃ জব্বার মোল্যা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুকে দেখে আমার অনুপ্রেরণা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষন শুনে মনে হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কন্ঠে জাদু আছে।

আমি ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে নগরকান্দা থানার কিছু অংশ ও বোয়ালমারী থানার কিছু অংশ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করি। গ্রামের স্কুলের কিছু ছেলে নিয়ে ৮/১০ জনের একটি দল তৈরি করে এ অঞ্চলের প্রতিটি হাটে টিনের চোং দিয়ে ৬-দফা ও ১১-দফার আলোকে প্রচার করি ও পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য তুলে ধরি। নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার জন্য অনুরোধ করি ও জয়বাংলা শ্লোগান সহ অন্যান্য শ্লোগান দেই। প্রথমদিকে তেমন কোন সাড়া না দিলেও পরবর্তীতে আমাদের সাথে অন্যান্যরাও সাড়া দেয়। এতে বুঝতে

পারলাম মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতে ও দেখতে চায় (তখন দেখার কোন মাধ্যম ছিল না)। সন্ধ্যায় গ্রামে এই ছেলেগুলোকে নিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট চাই। গ্রামের সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে যোগ দেয়। কিন্তু মৌলভীর দল বাড়িতে এসে বাবা ও বড় ভাই এর কাছে নালিশ দেয়, বলে এদেশকে কী আপনারা হিন্দুস্থান করতে চান। আমার বাবা বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত, তাই কোন কর্ণপাত করেন না। বড়ভাই রাজেন্দ্র কলেজে জাফর ভাই এর সাথে ছাত্রলীগ করেন। প্রতিদিন আমার পরিবার আমাকে আর্থিকভাবে এ কাজে সাহায্য করতো ও উৎসাহ দিতো। মৌলভী সাহেবরা বলাবলি করতো এরা নাস্তিক, পাকিস্তানের বিপক্ষে কাজ করে।

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে ও জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। ইয়াহিয়া খান ১০ জানুয়ারী ঘোষনা করেন ৩ মার্চ ঢাকায় প্রথম অধিবেশন বসবে। কিন্তু ১ মার্চ এক ঘোষনায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষনা করা হয়। আমাদের ফরিদপুরের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা এ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন মোল্যা, কে.এম. ওবায়দুর রহমান, ইমামউদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট মোশারফ হোসেন, এডভোকেট হায়দার হোসেন, এডভোকেট আঃ ছালাম, গৌর চন্দ্র বালা, অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন, নূরনবী ভাই এবং ছাত্রনেতা শাহ মোঃ আবু জাফর, সৈয়দ কবিরুল আলম, সালাউদ্দিন আহম্মেদ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ২ ও ৩ মার্চ হরতাল পালনসহ ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মহাসমাবেশের বঙ্গবন্ধুর ভাষনের অপেক্ষায় থাকি।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি উদাত্ত কন্ঠে আহবান জানান, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিব। দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা-ল্লাহ।" তিনি আরও বলেন, "ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" বঙ্গবন্ধুর ভাষনে সকলে অনুপ্রণিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিদিনই মিটিং মিছিল সহ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫শে মার্চ গভীর রাতে খবর পেলাম পাকবাহিনী রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বর্বরোচিত হামলা করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়েছেন। যা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আঃ হান্নান ঘোষনা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও ছাত্র নেতাদের নির্দেশে ফরিদপুর স্টেডিয়াম ও রাজেন্দ্র কলেজে ট্রেনিং ক্যাম্প করা হয়। ফরিদপুর স্টেডিয়ামে আবু সাঈদ ইউসুফ, ছত্তার মন্ডলসহ আরও কয়েকজন ট্রেনিং দেয়। অপরদিকে রাজেন্দ্র কলেজের মাঠে ইউ.ও.টি.সি রাইফেল দিয়ে মোঃ মোকাররম হোসেন, মোঃ আবুল ফয়েজ সহ কয়েকজন ট্রেনিং দিতে থাকেন। আমি স্টেডিয়ামে ট্রেনিং গ্রহণ করি। অনেকেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে গোয়ালন্দ ঘাট, সিএন্ডবি ঘাট প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অংশ নেন। আমরা গ্রাম থেকে অবসরপ্রাপ্ত আর্মি, পুলিশ, চৌকিদারদেরকে এনে দেই। তাদেরকেও প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো হয়।

২১শে এপ্রিল ১৯৭১ পাক আর্মি ফরিদপুর আক্রমন করে, গোয়ালন্দ হয়ে ফরিদপুর এসে সার্কিট হাউসে অবস্থান নেয়। আমি গ্রামের বাড়ি নগরকান্দার বিভাগদী (বর্তমান সালথা থানা) চলে যাই। খাড়দিয়ার আবুল কালাম আজাদ (বাচ্চু রাজাকার) ১০-১২ জন সহযোগী নিয়ে আমাদের পাশে হিন্দু অধ্যুষিত নতুবদয়িা গ্রামে ব্যাপক লুটপাট ও অগ্নি-সংযোগ করে । পারিবারিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ভারতে যাওয়ার জন্য। একই পাড়ার আবু সাইদ খান রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র । তার সাথে পরামর্শ করি। বোয়ালমারীর জাফর ভাই এর সাথে আমরা ভারতে যাব। তার পরেরদিন বোয়ালমারী গিয়ে আমরা জানতে পারি জাফর ভাই ভারত চলে গেছেন। বিকেল হয়ে যাওয়ায় সাঈদ ভাই বাইখির গ্রামে তার আত্মীয়ের বাড়িতে গেলেন, আমি বাড়ি চলে এলাম। পরেরদিন বাইখির গিয়ে শুনতে পাই সাঈদ ভাই বাড়ির লোকদের না বলে চলে গেছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি বাড়ি এসে গ্রামের ৬/৭ জন ছেলে নিয়ে বাড়ির ভিতরেই লাঠিসোঠা দিয়ে নিজেরাই ট্রেনিং দিতে শুরু করি। সিদ্ধান্ত হলো প্রথমে আমি, ওহাব ও জাফর ভারত যাব। পরবর্তীতে আমার বড় ভাই আবু বকর রাজেন্দ্র

কলেজের ডিগ্রী ছাত্র (সবাই তাকে বাকা ভাই বলে সম্বোধন করতো) কয়েকজনকে নিয়ে ভারত যাবে। নৌকাই তখন ছিল একমাত্র যানবাহন।

পরের দিন আমার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা মাঝিকান্দা নদীর পাড়ে অপেক্ষায় ছিলাম। তখন জানতে পারি নৌকায় ভাংগার রাজেস্বর রায়ের পরিবার ভারতে যাচ্ছে, আমরা তাঁদের নৌকায় উঠে পরলাম। আরও ৬/৭টি নৌকা আমাদের নৌবহরে যুক্ত হলো। বোয়ালমারী থানার সাতৈর ইউনিয়নের ঘোড়াখালী রেলওয়ে ব্রীজ। ৬/৭ জন রাজাকার যারা এই ব্রীজটি পাহারা দিচ্ছিল তারা আমাদের নৌকাগুলিকে আটকায় এবং আমাদের নৌকা থেকে নামিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ফেলে। আমরা ভয় পেয়ে যাই, কারণ যেকোন সময় ট্রেনে পাক আর্মি চলে আসলে আমাদের মেরে ফেলবে। ভাংগার ভারতগামী পরিবারগুলোকে বললাম, কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে গেল। একজন রাজাকার আমার সামনে এসে বলে, তোমার বাড়িতো বিভাগদী। আমার লোকটিকে দেখে চেনা চেনা মনে হলো। কারণ আমি কাদেরদি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে যে বাড়িতে লজিং থাকতাম, লোকটি ঐ বাড়ির রাখাল ছিল। তাকে বললাম যেভাবে হোক আমাদের বাঁচান। তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, মধুমতি নদীর ঐ পাড়ে আমার মামা বাড়িতে যাব। তোমাদের নৌকা কোনটি? আমি দেখিয়ে দিলে আমাদের নৌকাটি ছেড়ে দিল। আমার সহযাত্রী পরিবারটি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

আমাদের নৌকাটি যশোর আড়পাড়া যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আড়পাড়ায় অপেক্ষারত অনেক শরণার্থীদের সাথে আমরাও আড়পাড়া স্কুলে থেকে গেলাম। রাতেই স্কুলে কয়েকজন লোক এসে প্রস্তাব দিলো, কিছু টাকা-পয়সা দিলে আমাদের রাস্তা পার করে দিবে। আমরা ভোর রাতেই রওনা হলাম। রোড পার হয়ে ঐ'পাড় যেতেই দুই দিক থেকে ফায়ার শুরু হলো। যার কাছে যা ছিল ফেলে দিয়ে আমরা দৌড়ানো শুরু করলাম। কিন্তু পথ এতো কর্দমাক্ত ছিল যে দৌড়ানো যাচ্ছিল না। হঠাৎ একটি গাছের শিকড়ে বেঁধে আমি পড়ে গেলাম। উঠে আবার দৌড় শুরু করতেই টের পেলাম আমার পায়ে কিছু হয়েছে, দেখি! পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখটা উঠে গেছে। ব্যথায় হাঁটতে কষ্ট হলেও গন্তব্যে পৌছাতে হবে।

বড় একটি বিল এর পাড় দিয়ে ভারতের বাঘদা বর্ডারে পৌছলাম। বর্ডার পার হয়ে ঐ'পাড়ে যেয়ে মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়লাম আর দাড়াতে পারছি না। আধা ঘন্টা পরে লাইনে দাড়িয়ে চিড়া ও গুড় নিলাম। চিড়া-গুড় খেয়ে সবাই বনগ্রামের দিকে রওনা হলাম।

বনগ্রাম ফরিদপুর ক্যাম্প নামে পরিচিত স্থানে পৌছাতে রাত ১১ টা বেজে গেল। একতলা বিল্ডিং কেউ নাই। আমাদের তিনজনের মধ্যে ওহাবের বয়স বেশি ছিল। সে পূর্বেও নতিবদিয়া গ্রামের হিন্দু পরিবারের সাথে ভারতে আসা-যাওয়া করেছে। ক্যাম্পের আশেপাশে পরিচিত কাউকে পেলাম না। আধা মাইল দুরে ইতি পূর্বে ভারতে যাওয়া নতিবদিয়া গ্রামের রঘু বিশ্বাসের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম। তাঁরা ওহাবের পরিচিত, আমার বাবাকে চিনতেন। পরিবারটি রাতে আমাদেরকে বারান্দায় থাকতে দিল এবং ভাত-ডাল খেতে দিল। প্রায় একদিন না খেয়ে থাকার কারণে, সেই খাবারই আমাদের কাছে অমৃত মনে হচ্ছিল। আমার পা ফুলে যাওয়ায় পরদিন হাঁটতে পারলাম না। ঐখানেই থেকে গেলাম। আমরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার এক ভাই থাকে রানাঘাট, পেশায় চিকিৎসক। তার কাছে উনার ছেলেসহ আমাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন।

যথারীতি ট্রেনে রানাঘাট পৌঁছলাম। স্টেশনের পাশেই ডাক্তার বাবুর বাড়ী। আমরা সে বাড়িতে উঠলাম। আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। ঘরের একপাশে চেম্বার করে রোগী দেখেন ও ওষুধ বিক্রী করেন। চারদিন ঐ বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিয়ে পা একটু ভাল হল। রানাঘাট থেকে কল্যাণী আসলাম। কল্যাণী শরণার্থী ক্যাম্পে খাদ্য বিভাগের ইন-চার্জ কানাইপুর এর আলী ভাই। তাঁর সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম ট্রেনিং ছাড়া অস্ত্র পাওয়া যাবে না। যথারীতি কল্যাণী যুব ক্যাম্পে ভর্তি হলাম। অনেকেই বললো, তারা বেশ কিছু দিন আছে কিন্তু ট্রেনিং নিতে পারে নাই। তাদের কাছ থেকে জানতে পারি স্থানীয় এম.পির অনুমতিপত্র ছাড়া ট্রেনিং এর লোক নেয়া হয় না। আলী ভাইকে বিষয়টি জানালে তিনি লোক পাঠিয়ে কে.এম ওবায়দুর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতিপত্র এনে দিলেন। কিন্তু রিক্রুটিং টিমের লোক আর আসে না। এভাবে প্রায় ১৫দিন

কেটে গেল। দুইবেলা পি.টি করি আর কি? একটি রিক্রুটিং এজেন্ট এসে সকলকে লাইনে দাড়াতে বললো। আমাদের তিনজনের মধ্যে আমাকে শিক্ষাগত যোগ্যতায় সিলেক্ট করলো। কিন্তু জাফরকে ও ওহাবকে বাদ দেয়া হলো । কিন্তু আমরা তিনজন একসাথে ট্রেনিং নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। এক মাস কেটে গেল।

নতিবদিয়ার রবিন নামের ছেলেটি ব্যবসার কাজে সপ্তাহে ২বার বাংলাদেশ ও ভারত আসা-যাওয়া করে। তার কাছ থেকে আমাদের বাড়ীর খবরাখবর পাই। আমার বড় ভাই রবিনের মাধ্যমে খবর দিয়েছে অস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমরা যদি ট্রেনিংএ না যেতে পারি তাহলে যেন বাড়ি ফিরে আসি। খবরটা পেয়ে আমরা তিনজন আবার বাড়ি ফিরে আসলাম। এক চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ২টি রাইফেল যোগাড় করা হয়েছে। এছাড়া তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজের (বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ একটি পিস্তল ও স্টেনগানসহ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী সাঈদ ভাইয়ের বাড়িতে এসেছে। তিনি সাঈদ ভাইয়ের মামাতো ভগ্নিপতি আমাদের বাড়িতে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুদিন এভাবেই চলছিল। আমি ও বন্ধুবর কাজী সালাউদ্দিন ইয়াছিন কলেজের ছাত্র ছিলাম। আমার বাড়ির এলাকা অনেক নিরাপদ, তাই সালাউদ্দিন লোক পাঠিয়েছে, বিস্তারিত জানতে। সালাউদ্দিনকে ঠিকানা দিয়ে আসার জন্য বলা হলো। ইতিমধ্যে শাহ্ মোঃ আবু জাফর ভাই, মধুখালীর কাইয়ুম ভাই, সিংহপ্রতাপের আতিয়ার, বোয়ালমারীর সিদ্দিক ভাই সহ ৬/৭ জন নৌকায় আমাদের বাড়িতে আসে। জাফর ভাই বিস্তারিত আলাপ করার পর নগরকান্দার কিছু অংশের দায়িত্ব বাকা ভাইকে দেন আইন-শৃংখলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। কারণ ইতিমধ্যে কয়েকটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।

আওয়ামী মনোভাবাপন্ন ও ছাত্রলীগ করে এমন পরিচিতদের ডাকার জন্য লিস্ট করা হলো এবং আমাদেরকে লিস্ট ধরে ডাকার জন্য দায়িত্ব দেয়া হলো। যথারীতি ৪/৫টি নৌকা নিয়ে লিস্ট অনুযায়ী ডাকা হলো। নির্ধারিত রাত্রে আমাদের বাড়িতে যারা উপস্থিত হলেন তারা হলেন, কাকিলাখোলার ওহিদ, রামকান্তপুরের মানিক মিয়া, কোন্দাদিয়ার মোকাদ্দেস, গট্টির মুকুল মিয়া, সালথার ইউনুস মিয়া, নগরকান্দার আজিজ মোল্যা, ভাংগার বড় আবু, সহিদ, তালমার

শহিদ, বোয়ালমারীর টোকন, সোনাপুরের বদউজ্জািমান, বাঘারকান্দির মালেক, নকুলহাটির বাদশাহ প্রমুখ সহ প্রায় শতাধিক লোক জমা হলো। জাফর ভাই ও প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করলেন ও পরামর্শ দিলেন, আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প বাড়ি থেকে সরিয়ে নতুবদিয়া প্রাইমারী স্কুলে নিলেন এবং সেটা উদ্বোধন করলেন। ফরিদপুরের আবুল হোসেন ভাইকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য দিলেন। এরপর মিরোজসহ আরও কয়েকজন ক্যাম্পে আসে। এছাড়া ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে যে মুক্তিযোদ্ধাগণ এ এলাকায় আসেন, তাদেরকে বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে তাঁদেরকে দিয়ে ট্রেনিং করানো হয়।

অক্টোবর মাসের দিকে খবর এলো, একটি ডিম্যুনেশন টিম আমাদের বাড়িতে আসবে, দুপুরে তাঁরা খাবেন। টিম প্রধান মোহাম্মদ আলী দেওয়ান, বাড়ী শরীয়তপুর। বাখুন্ডা ব্রীজ সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হলো। প্রায় ১৫০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বিস্ফোরক তৈরী করলেন। আমাদের লোকবল কম থাকায় সিদ্ধান্ত হলো, বিকালবেলা কমান্ডার হামিদ ভাইকে একাজে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে বিনোকদিয়া পৌছে দেয়া হলো। এভাবেই চলতে থাকে। ইতিমধ্যে কমান্ডার কাজী সালাউদ্দিন, ডেপুটি কমান্ডার মেজবাহ্উদ্দিন নৌফেল, ডাক্তার রুনু ভাই সহ প্রায় ২০-২৫ জন এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হন। থাকার সংকুলান না হওয়ায় ৬/৭ জনকে সাঈদ ভাই এর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। পরবর্তীতে তাদেরকে নতিবদিয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে সূর্য্য মন্ডলের বাড়িতে দুইটি টিনের ঘরে ক্যাম্প করে দেয়া হলো। আবার আলফাডাঙ্গার কমান্ডার হিমায়েত উদ্দিন তালুকদার তার দলবল নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তাদেরকে নতিবদিয়া ক্যাম্পে একসাথে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আমরা নতিবদিয়া স্কুলের ট্রেনিং ক্যাম্প বন্ধ করে কাজী সালাউদ্দিন বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করার অংগীকার করা হলো।

এখন অস্ত্র-গোলাবারুদে, লোকবলে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দ্রত অপারেশন শুরু করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত হলো কানাইপুর ব্রীজ অপারেশনের জন্য। আমি শুক্রবার রেকি করলাম; ৪ নভেম্বর কানাইপুর ব্রীজ আক্রমণ করা হলো। দুই দলে

বিভক্ত হয়ে একদল পূর্ব পাশে কানাইপুর গোরস্থানের পাশ থেকে ও অন্যদল পশ্চিম থেকে ব্রীজ আক্রমণ করা হলো। রাজাকাররা বাংকারের মধ্য থেকে গুলি করতে থাকে। অন্যদিকে পাক আর্মি অনেক দুর থেকে ফায়ার করতে করতে আসতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে ব্যাক করে আমাদের উভয় দল নতিবদিয়া ঘাঁটিতে চলে যাই।

করিমপুর ব্রীজে গ্রেনেড চার্জ : ৭ নভেম্বর রাত্রিতে দুই দিকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে করিমপুর ব্রীজে আক্রমণ করা হয়। ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক বিধায় বেশি সংখ্যক রাজাকার দল দিনরাত্রি পাহারা দিত। কাজী সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে নওফেল, আবু বকর, খোকন, আলী, সিরাজ, খলিল, শাহাদৎ, ওহাব, আইয়ুব ও আমি সহ ১২/১৩ জনের দল। অন্য দলের নেতৃত্বে ছিল হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার। বাদশাহ পাট্টাদার, শামসুদ্দিন, দেলোয়ার, রমেন, মমিন, চাঁন মিয়া, মিরাজ, জাফর, আবুবকর (বাকা ভাই), ইদ্রিস, সোহরাব, বাশার, ফরিদ সহ প্রায় ১৫ জনের দল করিমপুর ব্রীজ আক্রমণ করে। ব্রীজের উত্তর দিক থেকে খোকন গ্রেনেড চার্জ করলে দুইজন রাজাকার নিহত হয়। আমরা দুইটি রাইফেল হস্তগত করি । আক্রমণ শেষে আমরা নিরাপদে ঘাটিতে ফিরে আসি।

কামারখালী ঘাটে আক্রমণ ও ফেরি নিমজ্জন: আমি ও ইদ্রিস কামারখালী ঘাটে রেকি করে এসে বিস্তারিত তথ্য ও ম্যাপ আমাদের বাড়িতে অবস্থানরত নৌ-কমান্ডো মোহাম্মদ আলী ও আবুল কাশেমকে রিপোর্ট করি। এই মুক্তিযোদ্ধা দল কৌশলে অপারেশন সম্পূর্ণ করে আমাদের বাড়িতে নিরাপদে ফিরে আসে।

৯ ডিসেম্বর ফরিদপুরের করিমপুরে যুদ্ধ: কমান্ডার হিমায়েত ভাই এর সাথে নতুন করে ২জন ই.পি.আর ও ২জন পুলিশ বাহিনীর সদস্য এলএমজি, ল্যান্ডমাইন, হ্যান্ড গ্রেনেড, অনেক ভারী অস্ত্র-শস্ত্র সহ যোগ দেন। এতে আমাদের মনোবল আরও দ্বিগুন বেড়ে যায়। কাজী সালাউদ্দিনের জীবিত পাক আর্মি ধরা খুব ইচ্ছা। ইতিমধ্যে খবর আসে, করিমপুর ও ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর রোডে করিমপুর গাড়িয়াল ব্রীজে ১৫/১৬ জন রাজাকার থাকে। তাদের আর্মস এ্যামুনিশন নিয়ে আত্মমর্পন

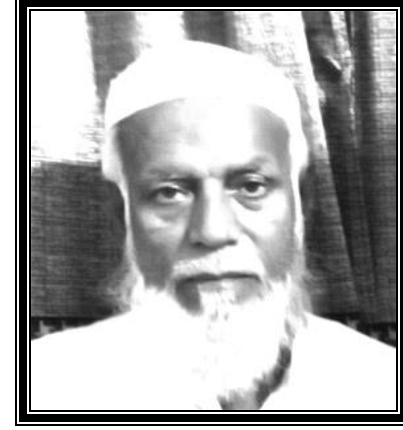
করবে। আপনারা ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর বাজারে আসেন। খবরটি শুনে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। রাত্রে সকলে একত্রিত হলে আমি বললাম, রেকি করে বিষয়টির সত্যতা জানা হোক। কিন্তু সালাউদ্দিন ও আরও কয়েকজন মানতে নারাজ। সকাল ৮ টায় আনুমানিক ৩০/৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে ধোপাডাঙ্গা-চাঁদপুর বাজারে ৯টার দিকে পৌছে যাই। কিন্তু এখানে কোন রাজাকার বা সংবাদদাতাকে খুজে পাওয়া গেল না। স্থানীয় লোকজন জানায়, গতকাল এখানে পাক আর্মি এসেছিল; আজও আসতে পারে। তবে আপনারা সামনে বড়ঘাট নামক স্থানে চলে যান, ঐখানে পজিশন নিতে সুবিধা হবে। দলবলসহ বড়ঘাটে গেলে কাজী সালাউদ্দিন ভাইয়ের নির্দেশে আরও সামনে এগিয়ে যাই (বর্তমানে এ.এইচ জুট মিল অবস্থিত)। যথারীতি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে রাস্তার পূর্ব পাশে আতাহার, শরিফ, আলী, বাদশাহ, শামসুদ্দিন, ইদ্রিস, বাকা ভাই, শাহাদত, বাশার, আশরাফ, দেলোয়ার, বক্কার, আইয়ুব পুলিশ ও পশ্চিম পাশে নওফেল, খোকন, ওহাব, মজিবর, শামসুদ্দিন, মঈনুদ্দিন, হামিদ, খলিল, মোমিন ও সিরাজ এ্যামবুশ করে থাকে। হেমায়েত ভাই, জাফর ও আমি রাস্তার উপর ইট উঠায়ে ল্যান্ডমাইন স্থাপনের কাজ করছি। হিমায়েত ভাই ও জাফর মাইন স্থাপনের কাজ করছে, আমি রাইফেল নিয়ে কাভার করে আছি। হঠাৎ করে পাকিস্তান আর্মির একটি জীপ আসতে দেখা যায়। কাজী সালাউদ্দিনের কাছে এলএমজি ও গুলি বহনকারী রমেন। অন্যদের হাতে ছিল এসএলআর, রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড। দুই পাশ থেকে ব্রাশ ফায়ার সহ আমি সামনে থেকে ফায়ার শুরু করলে জীপটি পিছু হটে পালাতে থাকে। জীপে থাকা কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয় তা বুঝা যায় না। যশোহর ক্যান্টেনমেন্ট ফল করার পর পাকিস্তানের আর্মি কামারখালী ঘাট হতে ফরিদপুর পর্যন্ত রাস্তার উপর ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করছিল। করিমপুর রাস্তার পার্শ্বেও তাদের অবস্থান ছিল। এই গুলির শব্দে পাকিস্তান আর্মিসহ রাজাকাররা তাদের বাংকার থেকে গুলি বর্ষন করতে থাকে। বৃষ্টির মতো গুলি আসতে থাকে। তারই একটি গুলি হেমায়েত ভাই এর ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলে লাগে। আমরা দ্রুত রাস্তার খাদে নেমে যাই। মুহূর্ত দেরি করলে আমরা সবাই ব্রাশফায়ারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যেতাম। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুতে থাকলে গেঞ্জী ছিড়ে আঙ্গুল বাঁধলেও রক্তে কাপড় ভিজে যাচ্ছিল।

কিছুসময় অপেক্ষার পর দেখি পশ্চিম দিক থেকে গুলি আসছে। অর্থাৎ তিনদিক থেকে পাকবাহিনী আমাদের ঘিরে ফেলেছে। হেমায়েত ভাইকে দ্রুত চিকিৎসা দিতে হবে। আমরা ব্যাক-ফায়ার করতে করতে হেমায়েত ভাইকে নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে পিছন দিকে ফিরতে থাকি। তাকে নিয়ে আজলবেড়া গ্রামের একটি বাড়ি থেকে কাপড় এনে আঙ্গুল ব্যান্ডেজ করে সেখানেই থাকতে বলি। আমি আবার ফিরে আসি। এদিকে রাস্তার পূর্ব পাশে যারা ছিল ফাঁকা মাঠ বিধায় তারা শেল্টার না পেয়ে কিছু রাস্তার কালভার্ট দিয়ে পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশে আখক্ষেতের মধ্যে যায়। বাকি কয়েকজন ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং দুরে অবস্থান নেয়। আমাদের বাহিনী মাঝেমধ্যে গুলি ছোড়ে আর পাকিস্তান আর্মি বৃষ্টির মতো ব্রাশ ফায়ার করতে থাকে। বিকাল গড়িয়ে যায়। আমাদের দল অর্থাৎ যারা রাস্তার পশ্চিম পাশে ছিল, স্থানীয় রাজাকাররা (করিমপুর ও কুশাগোপালপুর গ্রামে ১০/১৫ জন রাজাকার) করিমপুর ব্রীজের দক্ষিণ পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে গেছে ঐ রাস্তা দিয়ে পাক হানাদার আর্মিদেরকে পথ দেখিয়ে আমাদেরকে তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কয়েকজন অর্থাৎ খোকন, খলিল, বাদশাহ, সিরাজ, আইয়ুব, শাহাদাৎ সহ ৫/৬ জন ছোন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়। কাজী সালাউদ্দিন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী বাকের মন্ডলের বাড়িতে আশ্রয় নিলে সন্ধ্যার দিকে পাকআর্মি ও রাজাকার দল কাজী সালাউদ্দিনসহ ওই বাড়ির ৩ জনকে গুলি করে মেরে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এছাড়া শহীদ মেজবাহ্উদ্দিন নওফেল (ফরিদপুর), শহীদ ওহাব (নিমতলি খানাখানাপুর, রাজবাড়ি), শহীদ মজিবর, শহীদ শামসুদ্দিন, বোয়ালমারীর শহীদ ময়েনউদ্দিন, পাড়াগ্রামের শহীদ হামিদ (খোলাবাড়িয়া, আলফাডাঙ্গা) ৩ জন সালাউদ্দিন কমান্ডের মুক্তিযোদ্ধা ও ৪ জন হেমায়েত কমান্ডের মুক্তিযোদ্ধা মোট ৭ জন শহীদ হয়। আমরা সকলেই কান্নাকাটি করছিলাম। কাজী সালাউদ্দিনের ভাই কাজী ফরিদের কান্না আর থামানো যাচ্ছিল না। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পরের দিন সকালে বেশ কিছু লোকজন কাঠের তক্তায় করে মমিন (যার বাড়ি খোলাবাড়িয়া, আলফাডাঙ্গা) তার শরিরে বেয়নেটের খোচায় ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে, বুট দিয়ে মাড়িয়ে তার বুকের

পাজর ভেঙ্গে ফেলেছে। তাঁকে নতিবদিয়া ক্যাম্পে নিয়ে আসে এবং ডাক্তার রুনু ভাই চিকিৎসা দয়োর পর তাকে মুক্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১০ই ডিসেম্বর আমরা বিভাগদী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গ্রামবাসীদের নিয়ে গায়েবানা জানাজা পড়ি। ১১ ডিসেম্বর শাহ্ মোঃ আবু জাফর ভাই লোক পাঠালে আমরা নতিবদিয়া ঘাঁটি ছেড়ে বোয়ালমারী ডাকবাংলোয় অবস্থান করি। এখানে ৮নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ফ্লাইট লেফঃ জামাল চৌধুরী সহ আরও অন্যান্য কমান্ডারদরে সাথে পরিচিত হই।

১৬ই ডিসেম্বর সকালে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা দুই দলে ভাগ হয়ে এক দল নতিবদিয়া হয়ে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে আমরা পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর পাই। বিজয়ের সংবাদ কানে আসছে, আমরা আনন্দে ফেটে পড়ব নাকি বন্ধু-স্বজন হারানোর দুঃখে ভেঙ্গে পড়ব তা বুঝে উঠতে পারি না। সেই মুহূর্তটি কেমন ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। গট্টির কাছা কাছি আসলে সন্ধা হয়ে যাওয়ায় মুকুল মিয়ার বাড়িতে রাত্রে অবস্থান করে সকালে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ২য় দল মাঝিকান্দি হয়ে ফরিদপুর পৌছায়। উল্লেখ্য যে, ফরিদপুর সদরের করিমপুরে যুদ্ধের মত ভয়াবহ এতবড় যুদ্ধ আর দ্বিতীয়টি হয় নাই। পরে জানা যায় উক্ত যুদ্ধে একজন অফিসার সহ বেশকিছু পাক হানাদার নিহত হয়। আমরা ফরিদপুর এসে করিমপুরে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই। সেখানে শহীদ কাজী সালাউদ্দিন, মেজবাহউদ্দিন নওফেল সহ ৭জনের দেহাবশেষ নিয়ে আসি এবং আলীপুর গোরস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় জানাজাসহ দাফন করি। পরবর্তীতে আমাদের অস্ত্র বায়তুল আমান মিলিশিয়া ক্যাম্পে জমা দেই।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামছুউদ্দিন ভূইয়া

৭ই মার্চ ১৯৭১ইং তারিখ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ঘোষনা করেছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, তোমাদের যার যা কিছু আছে তা নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করো। সে বছর অর্থাৎ ১৯৭১ সালে আমি দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর দেশের যখন টালমাটাল অবস্থা, কিছুদিন পরেই ২৫শে মার্চ রাত ১২ টার পর হতে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা, লুন্টন, নির্যাতন, জ্বালাও পোড়াও শুরু করে দিয়েছে সেই সাথে শহরগুলোতে চলছে কারফিউ। যদিও গ্রামের লোকজন টের পায়নি দেশে কি ঘটতে যাচ্ছে। ঢাকার খবর ও ঠিকমত গ্রামে আসে না। এলাকার লোকজনের সাথে বলাবলি করি দেশের কি হবে। সবার এক কথা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে কি করব ভেবে পাই না, লোক মুখে শুনি যুবক ছাত্র-জনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ট্রেনিং নিতে ইন্ডিয়া যাচ্ছে। পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বললাম যুদ্ধে যাব। কেউ রাজী হল না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম ইন্ডিয়া যাবই। ট্রেনিং নিব দেশ বাঁচানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করব। পরাধীন আর থাকতে চাই না। সেই মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাড়া দিয়ে ইন্ডিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী হই। তখন মে মাস, যাওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ৩ মে ১৯৭১ বাড়ী ছাড়লাম। সাথে চরজামাইলের জামাল উদ্দিনকে নিয়ে কিশোরগঞ্জ, নান্দাইল, তাড়াইল, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, ধর্মপাশা, মধ্যনগর হয়ে বর্ডারের মহেষ খোলা ইয়ুথ ক্যাম্পে

১৫/০৫/১৯৭১ইং তারিখে পৌঁছি। সেখানে নাম ঠিকানা শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সবকিছু জেনে রিক্রুট করেন। আমরা একসাথে ছাত্র-যুবক মিলে ২০০ জন হবে। কি করুণ অবস্থা, থাকার মত বাড়ীঘর ছিল না। গোসলসহ খাওয়া ধাওয়ার নানা সমস্যা দিন অতিবাহিত করি। ক্যাম্পের পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে মনটা দূর্বল হয়ে পড়ে। তারপরও আছি থাকছি দেশে যুদ্ধ, ট্রেনিং না করে গেলে অসাহয়ের মত পাকিস্তানিদের গুলি খেয়ে মরতে হবে। এটা কখনও মেনে নিতে পারব না। মোটামুটি সবাই ১৯ দিন থাকার পর নিজেরা থাকার জন্য শেড তৈরি করলাম। শেডের সামনে মাঠ মাটি দিয়ে কিছুটা সমতল করা হল। কারণ এ মাঠেই আমাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজনীয় পিটি প্যারেড অস্ত্র চালনার ট্রেনিং দেওয়া হবে। সবকিছু প্রস্তুত হওয়ার পর বেশ ভালভাবেই কাটছিল দিনগুলো।

মহেষ খোলায় কিছুদিন থাকার পর হাতে যে টাকা পয়সা ছিলো তা শেষ। সে কারণে আমি বাড়িতে টাকা নিতে আসার জন্য ক্যাম্প ইনচার্জ সেকান্দার নূরি সাহেব কে বলি। আমাকে ৭দিনের ছুটি দেন, না হয় উচ্চতর প্রশিক্ষণে পাঠান। তখন সেকান্দার নূরি সাহেব বললেন চিঠি আসলেই আমরা তোমাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষনের জন্য পাঠাবো। এই জবাব দিয়েই পরদিন আমাকে ৭দিনের ছুটি মুঞ্জুর করেন। আমি প্রথমে নৌকায় মধ্যিনগর হইয়া ধর্মপাশা শেলবড়শ নামক স্থানে এক জেলের বাড়িতে রাত্রে অবস্থান করি। পরদিন সকালে পায়ে হেটে ৫দিনে বাড়িতে পৌঁছি। বাড়িতে ৪ দিন থাকার পর আমার মামার বাড়ির ২জন, লাল মিয়া ও আমির খছরু এবং নিজ গ্রাম উত্তর চরপুমদীর মজিবুর রহমান সাফিকে নিয়ে আমার সাথে ভারতের মহেষ খোলা ক্যাম্পে পৌঁছি। আমি মহেষ খোলা সময় মত পৌঁছাতে না পারায় রাত ৮টার সময় রোল কলে নাম ডাকেন, ক্যাম্প ইনচার্জ শেকান্দর নূরি সাহেব আমাকে বলিতেছেন তুমি দেরিতে আসায় তোমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হইবে কারন তোমাকে সন্দেহ হয় তুমি মুক্তিবাহিনী কিনা? এই কথা শোনা মাত্রই শরীর চর্চা প্রশিক্ষক বললেন, শামছুদ্দিন ভূইয়া আরো ৩জন কে নিয়ে এসে ভর্তি করিয়াছেন। সে গুপ্তচর হয় কি করে? এই ক্যাম্পের আরও কর্মকর্তাগন বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ড হইতে মওকুফ করে দেন। সেই সাথে আদেশ দেন আগামীকাল তুমি সহ ৫০জন উচ্চতর প্রশিক্ষনে ভারতের তোরা ক্যাম্পে যাবে। তখন আমি খুশি হয়ে বললাম আজ রাতে বললেও চলে যাব। আমি উচ্চতর প্রশিক্ষনে চলে যাওয়ার পর আমি যে ৩জন (লাল মিয়া ও আমির কছরু এবং নিজ গ্রাম উত্তর চরপুমদীর মজিবুর রহমান সাফি) কে ভর্তি করে দিয়ে ছিলাম তারা ট্রেনিং না করে পালিয়ে

বাড়িতে চলে গিয়েছে, বিষয়টি ক্যাম্প ইনচার্জ আমাকে জানান। আমি ভারতের মেঘালয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষনের জন্যে তোরা ক্যাম্পে মোট ৩১ দিন অস্ত্র ও এক্সপ্লোসিভ এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রথমত রাইফেল- ৩০৩ এবং মার্ক-৪ পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেই। এর পর এস এম জি, এল এম জি, এস এল আর এর চালনা, খোলা জোড়া ও প্রতিবন্ধকতা হলে করনীয় বিষয় সম্পর্কে শিখি। টু ইঞ্চি মর্টার ও হ্যান্ডগ্রেনেড কিভাবে থ্রো করতে হয় এ বিষয়টি ও শিখানো হয় এবং এরই সাথে ভারত সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোরের বারুদ বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকগন আমাদের কে শিক্ষা দেন, কিভাবে বারুদ দ্বারা গাছ কাটা, ব্রিজ ভেঙ্গে ফেলা, ভবন ধ্বংস করা, কালভার্ট ভেঙ্গে ফেলা, নদীতে নৌকা ও লঙ্গ স্টীমার সমূলে ধবংস করা যায়। এর মধ্যে ডেটেনেটর সেফটি ফিউজ, প্রাইমার, ডেটেনেটিং কর্ড ও বিভিন্ন ধরনের শক্ত ও নরম বারুদের ব্যবহার কোনটির কি কাজ কিভাবে লাগাইতে হয় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেই। উল্লেখ যোগ্য ভাবে বারুদ প্রশিক্ষনের প্রতিফলন ঘটে কিশোরগঞ্জ জেলার গোবিন্দপুর টু রশিদাবাদ রোডে ফটিকখালী ব্রিজে আমি বারুদ স্থাপন করে ব্রিজটি উড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের যাতায়াত সম্পূর্ন রুপে বন্ধ করে দেই। ১৯৭১ সালে ১৪ই আগষ্ট ১১ নং সেক্টরের দ্বিতীয় গ্রুপ হিসাবে প্রশিক্ষণ শেষে আমরা ১৮৭ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ কাজী আলম (কোম্পানী কমান্ডার) ও আ: সালাম ঈশ্বরগঞ্জ (সহ: কোম্পানী কমান্ডার) এক সাথে শপথ বাক্য পাঠ করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তোরা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হতে মহেষ খোলা, মধ্যনগর, ধর্মপাশা হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে নেত্রকোনায় মদন থানায় অবস্থান করি। ১৭/০৮/১৯৭১ইং তারিখে ১১ নং সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু তাহেরের নির্দেশ মোতাবেক গ্রুপওয়ারি ভাগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ বিভিন্ন থানায় প্রেরণ করেন। আমাকে ১৭ জনের দায়িত্ব দিয়ে কাজী আলম ও আঃ সালাম ভারতে চলে যায়। ১৮/০৮/১৯৭১ইং তারিখ সকাল ১১টায় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু এবং পাক সেনাদের সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সন্ধ্যার আগে আঃ কদ্দুস নামে আমার এক সহযোদ্ধা পাক সেনার গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। ১৮/০৮/১৯৭১ইং তারিখ সারাদিন সারা রাত পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আমার একজন সহযোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেন এবং ৪৫০ জন পাক সেনা নিহত হয়। ১৯/০৮/১৯৭১ইং তারিখে রাতে গোবিন্দ শ্রী গ্রাম হইতে নৌকা যোগে ধর্মপাশা পৌছি। ২০/০৮/১৯৭১ইং ভোর ৬টায় পাক সেনারা আমাদের উপর আক্রমন চলে এই আক্রমন চলে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। আমার একজন সহযোদ্ধা তার ভূলে সে মারা

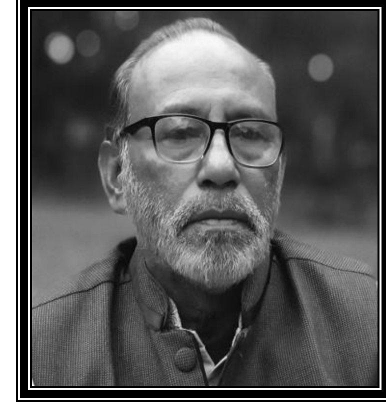
যায়। প্রায় আরও ৪০০ জন পাক সেনা নিহত হয় আমাদের এ্যাম্বুসের ভিতর দিয়া যাওয়ার সময় গুলি করে হত্যা করি। তখন বর্ষা কাল ধর্মপাশা যুদ্ধের শেষের দিকে মনে করলাম ধর্মপাশা ব্রিজের উপর দিয়ে হাটিয়া পার হইব। হঠাৎ ব্রিজের উপর উঠার পরেই আমার উপর মোষলধারে গুলি বর্ষন করে। আমি কোন কিছু না বুঝিয়া ব্রিজের উপর পরে যাই এবং আস্তে আস্তে ক্রলিং করে পার হইয়া কোমর পানি অতিক্রম করে রাস্তার সাইড ধরিয়া হেটে প্রায় ১ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর আনুমানিক বিকাল ৪টার সময় একটা ছোট নৌকা নিয়ে আসে একজন লোক, আসিয়া বলে নৌকায় উঠেন আমি নৌকায় উঠিলাম, ধর্মপাশা হইতে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে ভাসমান পাড়ায় নিয়ে রাখে তখন প্রায় ৩টা বাজে। এই সময় ওই এলাকায় নারী পুরুষ আমাকে অনেক প্রশ্ন করে, আমি কেন এই মুক্তিযোদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে আসলাম তখন আমি বহু উত্তর দিলাম এই সময় এলাকার লোকজন আমাকে বলিতেছে এখন আপনি কি করিবেন? উত্তরে আমি বললাম আমি এখন ভারতের মহেষ খোলা যাইতে চাই। হঠাৎ একজন লোক আসিয়া বলিতেছে বাড়ির পাশে একখানা নৌকা বাঁধা আছে সেটি মহেষ খোলা যাইবে। আনুমানিক ৫টার সময় আমি নিজে নৌকার মাঝিদের সাথে আলাপ করে নৌকায় উঠিলাম, এবং নৌকার মাঝিদের বলিলাম কখন নৌকা ছাড়বেন। এই সময় মাঝিগন বলিলেন উজান পানি দিয়ে নৌকা চালাইয়া যাইতে ৩/৪দিন সময় লাগবে এবং মাঝিদের বললাম আমার কাছে তো টাকা পয়সা নাই খাওয়া দাওয়া কিভাবে করিব? মাঝিগণ উত্তর দিলেন তোমার টাকা পয়সার প্রয়োজন হবে না আমরা খাইলে তুমিও খেতে পারবে। মাঝিগন সন্ধ্যার পর নৌকা ছাড়িয়া উজান পানি বাইয়া চলিল। সন্ধ্যা ৭টার সময় এক বৃদ্ধ মাঝি নৌকার ভিতর একখানা থ্রিব্যান্ড রেডিও আছে তা নিয়ে চৈয়ার উপরে চলে আসো, স্বাধীন বাংলার খবর শুনি তখন রেডিও নিয়া বৃদ্ধ মাঝির হাতে দিলাম। তখন বৃদ্ধ মাঝি স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের খবর শুনতে শুরু করলো। প্রথমেই মদন থানার এবং ধর্মপাশা থানার যুদ্ধের খবর বলিতেছে। মদন থানার যুদ্ধে ৪৫০ জন এবং ধর্মপাশা থানায় ৪০০ জন পাকসেনা নিহত হয়। মদন থানা যুদ্ধে একজন মুক্তিসেনা শাহাদাত বরণ করেন এবং ধর্মপাশা যুদ্ধে ২জন মুক্তিসেনা শাহাদাত বরণ করেছে খবরে বলেন। তখন আমি বৃদ্ধ মাঝিকে বললাম আমার সাথে একজন নিজের ভূলের কারণে গুলি লেগে মারা গিয়েছেন। বৃদ্ধ মাঝি উত্তর দিলেন তোমাকে না পাইয়া তোমার নাম ও মৃত্যুর তালিকায় বলেছে। খবর প্রকাশ করছেন সালেহ আহম্মেদ। নৌকা ২৪/০৮/১৯৭১ইং তারিখে মহেষ খোলা নামা বাজার ঘাটে পৌছি, মহেষ

খোলা বাজারের নৌকা হইতে উঠার পর হোটেলের মালিক আমাকে বলিতেছে আপনি না ধর্মপাশা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন? আপনার নামে গাইবী জানাজা হইতেছে এখন দেখবেন মুক্তিযোদ্ধারা গাইবী জানাজা শেষ করিয়া আসিতেছে, বলিয়া আমাকে ভাত খাইতে দেয়। তখন আমি বললাম আমার হাতে তো টাকা পয়সা নাই। হোটেল মালিক বলতেছে আপনার টাকা পয়সার প্রয়োজন নাই আপনি বসেন। আমি ভাত খাইয়া পান খাইতেছি, হোটেলের মালিক মুক্তিযোদ্ধাগণ কে প্রশ্ন করে আজকেও কি গাইবী জানাজা করেছেন? মুক্তিযোদ্ধাগণ উত্তর করিল আজই শেষ গাইবী জানাজা। হোটেলের মালিক বলিতেছে আপনারা যার জানাজা পড়েছেন তিনি তো জীবিত হোটেলে ভিতর দেখেন, এই সময় আমার সহ যোদ্ধাগণ আমাকে হেটে যাইতে দেই নাই। আমাকে কাঁধে করে তাড়াতাড়ি মহেষ খোলা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এইদিন রাতে বলা হয় যে ধর্মপাশা যুদ্ধে যে ২জন মুক্তিযুদ্ধা শাহাদত বরণের খবর ছিল তাহা সত্য নয়। একজন ক্যাম্পে ৩দিন পর ফিরে এসেছেন। সে খবরও সালেহ আহম্মদ খবরে বলিয়াছেন। ভারতের মহেষ খোলা আগষ্টের শেষে এই দুই যুদ্ধে পুরস্কার স্বরূপ ভারত সরকার কতৃক ২৫জন মুক্তিযোদ্ধাদের ২৫টি এস,এল,আর এবং ১টি করে সনদপত্র বিতরন করেন। কিন্তু এই পুরুস্কার এর সনদপত্র কারো কারো হাতে আছে, কারো কাছে নাই। ২৭/০৮/১৯৭১ইং তারিখ সকাল বেলায় ভারতীয় ক্যাপ্টেন নিরঞ্জন চোওহান এই দুই যুদ্ধের বর্ণনা শুনিয়া আমাকে ৫১ জনের গ্রুপ কমান্ডার করে প্রথমে ধর্মপাশা থানার চামরজানি গ্রামে জল ডিওটিতে পাঠায়। আমি একদিন থাকার পর গ্রুপের সবাই বলিতেছে যে সিলেট এলাকায় আর থাকবো না নিজের এলাকায় যাবো। আমি বললাম কিভাবে যাইবো তখন ১২টা ছোট আর ১টি বড় নৌকা নিয়ে ১০ বাক্স গুলি, ১২ বাক্স হ্যান্ডগ্রেনেড, ৩টি এন্টিট্যাংক মাইন, ১০টি রাইফেল এবং মাল ছামানা সহ ২দিন পর চামরজানি হইতে পালাইয়া নৌকা যুগে বড় আউর (গচিহাটা) করগাও পৌছিঁ এবং গচিহাটা হইতে রাতে পাকুন্দিয়া থানা চরকাওনা বাছির উদ্দিন স্কুলে ৪দিন থাকিয়া ০৫/০৯/১৯৭১ইং তারিখ ১২টা ৫ মিনিটে পাকুন্দিয়া থানায় আক্রমন করি এবং ২২৫ জন রাজাকার ধরি। ০৫/০৯/১৯৭১ইং তারিখ যুদ্ধের পর আরও ২ থানা হোসেনপুর ও কটিয়াদী এমনিতেই রাজাকার মুক্ত হয়। আমি মোঃ শামছুউদ্দিন ভূইয়া এই তিন থানা মুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষনা করি। উদ্ধার কৃত অস্ত্র মফিজ উদ্দিন মাষ্টার, শুকুর মাহমুদ ও রতন কে দিয়া এই ৩জন কে কমান্ডার এর দায়িত্ব প্রদান করি। পরবর্তিতে আমার মামা নায়েক মোঃ আফাজ উদ্দিন ভূইয়া সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি এবং বিভিন্ন

এলাকা থেকে আসা যুবকগন কে স্কুল মাঠে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ করাই এবং উদ্ধার কৃত অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করি পরবর্তিতে গফরগাও এর বাশিয়া বাজার, কিশোরগঞ্জের প্যাড়াভাঙ্গা (খিলপাড়া), কিশোরগঞ্জের মুকসেদপুর ও কিশোরগঞ্জের পেট্রল পাম্পে হামলা করি। আর প্যাড়াভাঙ্গা চরপুমদী বাজারে প্রায়শই যুদ্ধ সংঘঠিত হইত এর মধ্যে উল্লেখিত কয়েকটি যুদ্ধে যাহারা ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্প হতে ট্রেনিং নিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভারত হতে ফিরে আসা কিশোরগঞ্জ সদরের, হোসেনপুর থানা এবং পাকুন্দিয়া থানার মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রিত করে উল্লেখিত বিভিন্ন স্থানে রেইড, এ্যাম্বুস ও সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমার সাথে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকের নাম আমার মনে নাই। কয়েক জনের নাম মনে আছে, কিশোরগঞ্জ সদর এর এডভোকেট মতিউর রহমান, মুক্তু মাষ্টার, মেনু মিয়া, আবুল হাসেন ভূইয়া, কুতুব উদ্দিন, আবুল হাসেম (২) হোসেনপুর থানার চর জামাইল গ্রামের মোঃ মুঞ্জুরুল হক, আঃ আজিজ ও উবাইদুর রহমান রতন। দক্ষিন পুমদীর মিছবাহ উদ্দিন আহমদ। গিয়াস উদ্দিন, হরিচন্দ্রপট্টি। আবু তাহের, আঃ জলিল আড়াইবাড়িয়া । চরপুমদীর জালাল উদ্দিন, সিরাজ উদ্দিন, গনি মিয়া ও শহীদ রেনু মিয়া। আঃ মোতালেব, দ্বীপেশহর। মফিজ উদ্দিন, আকবর হোসেন ফালু, চরবিশ্বনাতপুর। সিরাজুল হক, পুমদী। সাহাব উদ্দিন, জিয়া উদ্দিন, চরজামাইল। গিয়াস উদ্দিন, জগদল। মফিজ উদ্দিন মাষ্টার, চরকাউনা। রতন, আরজু, এগারোসিন্দুর। আঃ আওয়াল, চরপরাদী। আঃ আজিজ চরবিশ্বনাতপুর। নূর হোসেন, কাপাসটিয়া। শামছুউদ্দিন, গোবিন্দপুর। জামাল উদ্দিন, বীর পাইসকা। শুকুর মাহমুদ, পুমদী। সোহরাব উদ্দিন খান, বীরহাজীপুর জিনারী। মতিউর রহমান, আঃ রহমান, জাঙ্গালীয়া। ফজলুর রহমান, গৃদান। নরেশ ঘোষ, হোসেনপুর বাজার ২৬/১১/১৯৭১ইং তারিখ আবার পাক সেনারা রাজাকাররা হোসেনপুর থানা দখল করে নেওয়ার জন্য আসিলে কিশোরঞ্জের প্যাড়াভাঙ্গা (খিলপাড়া) নামক জায়গাতে তুমল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে লতিবপুরের বীর প্রতীক খাইরুল জাহান ও কুলিয়াচরের সেলিম, দক্ষিন চরপুমদীর কেরামত আলী ও শামছুদ্দিন উত্তর চরপুমদী পাক সেনার গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। ২৬/১১/১৯৭১ইং দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে পাক সেনা, রাজাকার, আলবদর হোসেনপুর দখল করে কিছু সংখ্যক রাজাকার রাখিয়া পাকসেনারা পাকুন্দিয়া চলে যায়। পাকুন্দিয়া রাত্রে থাকিয়া পরদিন কিশোরগঞ্জ মহুকুমা শহরে চলে যায়। ২৯/১১/১৯৭১ইং তারিখ আমার গ্রুপের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পূনরায়

আক্রমন করিয়া হোসেনপুর দখল করি। হোসেনপুর যুদ্ধে প্রায় ৮৫ জন রাজাকারদের ধরে খতম করি। হোসেনপুর দখলের ৩দিন পর কিশোরগঞ্জের তৈল পাম্পে আমি সহ ৬জন তৈল পাম্পে আক্রমণ করি কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারি নাই, ১দিন পর ১০জন রাজাকার আমার নিকট রামদিয়া গ্রামে আসিয়া হাতিয়ার সহ আত্মসমর্পন করে করে। আমি তাদের কাউকে মারি নাই। আর প্রতিদিন পাকসেনা ও রাজাকারদের আমাদের উপর হামলা করার জন্য চরপুমদী বাজারে আসে। কিন্তু প্রতিদিনই প্রতিহত করতাম ২৬/১১/১৯৭১ইং তারিখ হোসেনপুর আসার পথে আমার সহযোদ্ধা কয়েকজন পাকসেনা গুলিতে শাহাদাত বরণ করে। তাতে আমি অল্পের জন্য বাচিঁয়া গেলাম। আমার এক সহযোদ্ধা হাবিবুর রহমান মুক্তু সে ঢেকিয়ার যুদ্ধে পাকসেনার গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। হোসেনপুর মুক্ত হওয়ার পর হোসেনপুর শাহ্ বাড়িতে কোম্পানী কমান্ডার নায়েক মোঃ আফাজ উদ্দিন ভূইয়া আমার সহয়তায় ক্যাম্প তৈরি করে এই ক্যাম্পে উদ্ধারকৃত হাতিয়ার দিয়া কিছু সংখ্যক যুবক কে প্রশিক্ষণ করায় এবং আমি এই ক্যাম্পে যোগদান করি। এই কোম্পানীতে যোগদান করার পর দেখি যে গোলা বারুদ আছে তাহা দিয়ে কিছুই করিতে পারিব না এই কোম্পানীতে যোগদানের কারণ নায়েক মোঃ আফাজ উদ্দিন ভূইয়া আমার চাচাতো মামা তাই এই কোম্পানীতে যোগদান করি আমি আমার চাচাতো মামা কে বলি যে গোলা বারুদ যা আছে তা দিয়ে কি করিব তখন তিনি বলিলেন চলো গোলা বারুদ সংগ্রহ করি। তখন আমি বললাম জ্বি আচ্ছা চলেন, তখন আমি নিজে ও নায়েক মোঃ আফাজ উদ্দিন ভূইয়া, মুঞ্জুরুল হক, হযরত আলী (চরজামাইল) মিছবাহ উদ্দিন আহমদ, দক্ষিনপুমদী, এই ৫ জন ২টি রিকসা নিয়া পুটিয়া হইয়া রাতে নরসিংদী পৌছি। এই সময় নরসিংদী এলাকা মুক্ত ছিলো। রাতে নরসিংদী থাকিয়া শেষ রাতে নদী পার হইয়া ব্রাক্ষনবাড়িয়া পৌছি এই সময় ব্রাক্ষনবাড়িয়াও মুক্ত ছিলো। ব্রাক্ষনবাড়িয়া মিত্রবাহিনী নিকট আলোচনা করিলে গোলা বারুদ ব্যবস্তা করিয়া দেওয়া হয় গোলা বারুদ ট্রাকে উটাইয়া নরসিন্দী পার করিয়া নিয়ে আসি তারিখ ছিলো ১৫/১২/১৯৭১ইং এবং ১৬/১২/১৯৭১ইং সব জেলা মুক্ত কিন্তু কিশোরগঞ্জ জেলা মুক্ত হয় ১৭/১২/১৯৭১ইং তারিখ। সব মুক্ত হওয়ার পর আমরা গুরুদয়াল কলেজে ক্যাম্প করে অবস্থান করি। গুরুদয়াল কলেজে থাকার পর আমাদের কে জানানো হয় যে ম্যালেশিয়া বাহিনীতে ভর্তি হতে হবে, কিশোরগঞ্জ এই ক্যাম্পে গুরুদয়াল কলেজে খাবার দেওয়া হইত। আমার সাথে ৫৮জন স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিলো তাহাদের তালিকা ভুক্ত করার জন্য আমি নিজেই

এবং আমার সহযোদ্ধা শুকুর মাহমুদ কে সাথে নিয়ে ময়মনসিংহ যাই। ময়মনসিংহ যাওয়ার সময় কোম্পানী কমান্ডার নায়েক মোঃ আফাজ উদ্দিন ভূইয়া একখানা আবেদন পত্র লিখে দিয়ে ছিলেন সেটি নিয়ে মেজর আজিজ সাহেবের সাথে আমি নিজে দেখা করি এবং আলোচনা করি। কিশোরগঞ্জ ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে দায়িত্বে থাকা লেফটেনেন্ট কামাল সাহেবের কাছে আবেদনের উপর লিখে পাঠালেন ব্যবস্থা করার জন্য। আমি ময়মনসিংহ হইতে আসিয়া পরদিন ম্যালেশিয়া ক্যাম্প ইনচার্জ এর নিকট ৫৮ জনের তালিকা জমা দিয়ে চলে আসি এবং আবেদন খানা আমার নিকট দিয়েছেন এবং শুধু ৫৮ জনের তালিকা রাখেন আমি ম্যালেশিয়া বাহিনীতে ভর্তি না হইয়া বাড়ি আসিয়া স্কুলে ভর্তি হইয়া ১৯৭২ইং সনে এস, এস, সি পরিক্ষা দেই এবং পাশ করি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা তমিজউদ্দীন আহমেদ হাওলাদার

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা তমিজউদ্দীন আহমেদ হাওলাদার, পিতা- জনাব আলী হাওলাদার, মাতা- কাঞ্চন বেগম ও আমার স্ত্রীর নাম ফাতেমা আকতার। আমার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নে। আমার জন্ম ১৯৫১ সালের পহেলা ডিসেম্বর। আমি বাল্যকালে যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন তদানীন্তন পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। ক্লাস ফোর-এ পড়াকালীন আমাদের একটা পাঠ্যপুস্তকের নাম ছিল ‘আমার জানতে হবে’। এ বইয়ে ২৫/৩০ জন মন্ত্রিসভার সদস্যদের ছবি ছিল যার মধ্যে একজনও বাঙ্গালি সদস্যের ঠাঁই ছিল না। সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। তন্মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের গভর্নর ছিলেন আজম খান-তিনিও ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। বাঙ্গালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের এহেন বিমাতাসুলভ ও হিংসাত্মক আচরণ ছোটবেলা থেকেই আমার মনে দারুণ ক্ষোভের উদ্রেক করেছে। বড়দের কাছে শোনা ও নিজের দেখা পাকিস্তানিদের এহেন কর্মকাণ্ড বড় হওয়ার সাথে সাথে হৃদয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে। আমরা বইয়ে পড়েছি আমাদের দেশের লোকসংখ্যা চার কোটি ওদের তার চেয়ে কম ছিল। অথচ আমাদের বেশি হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রী সভায় একজনেরও স্থান হয়নি। সর্বক্ষেত্রে ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও অবহেলা। স্কুলে আমরা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন

করতাম বাঙ্গালী কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব রচিত। তখন জাতীয় সংগীতটি ছিল নিম্নরূপ যথা- পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ পূর্ববাংলার শ্যামলীময় পঞ্চ নদীর তীরে অরুণীময় ধুসর সিন্ধুর মরু সাহারায় ঝাণ্ডা জাগে যে আজাদ। সামরিক সরকার ক্ষমতায় বসে জেনারেল আইয়ুব খান ওই জাতীয় সংগীতটা পরিবর্তন করে তখন উর্দুতে চালু করে যা আজও পাকিস্তানে বহাল আছে। পরিবর্তন করার পর আমরা নতুন সঙ্গীত গাইতাম কিন্তু কিছুই বুঝতাম না। ১৪ই আগস্টকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস বলা হত। আমরা বলতাম পাকিস্তান দিবস সেটা খুব জমকালো ভাবে পালন হতো। ঐদিন পাকিস্তানের যে জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণ প্রচার হতো রেডিওতে। তার ভাষণে উল্লেখ ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর কথা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর বাংলা ভাষার তার কাছে কোন মূল্য ছিলনা। স্বাভাবিকভাবে আমার ছোট বয়সেই তাদের উপর একটা বিরূপ ভাব সৃষ্টি হয়। আমি জীবনে উর্দুতে কথা বলতে পারি না, কারন আমি এই ভাষাটা কে পছন্দ করতাম না। যেহেতু আমাদের প্রতি তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল। স্বাধীনতার আগেই আমি বর্তমান পানি উন্নয়ন বোর্ড যার পাকিস্তান আমলে নাম ছিল EPWAPDA ইষ্ট পাকিস্তান ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলাপমেন্ট অথোরিটি।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রমনা রেসকোর্স ময়দানে বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং সে ভাষনে বলছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর সরকারি কর্মকর্তারা আপনারা ২৮ তারিখে বেতন নিয়ে যাবেন আর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে পালন করবেন। দেশের সবাই অসহযোগ আন্দোলন করতে লাগলো। তখন আমি রংপুরে চাকরি করতাম, যেহেতু অফিস আদালত চলে না এবং সারা বাংলাদেশের প্রতিবাদ ও অসহযোগ আন্দোলন চলতেছিল তখন আমি আমার গ্রামের বাড়িতে গেলাম সেখানেও দেখি একই অবস্থা। যেহেতু আমাকে ২৮ তারিখে বেতন নিতে হবে ২৫শে মার্চ তারিখে গ্রামের বাড়ি থেকে আমি রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেই কিন্তু ২৫ শে মার্চ আমি ঢাকায় আটকা পড়ে যাই। ২৫ ও ২৬ শে মার্চ এই দুটি

রাতে আমি ছিলাম ঢাকা শহরে এবং দুটি রাতেই বীভৎস ছিল- যদিও ২৬ শে মার্চ একটু কম ছিল কিন্তু সারারাতই গোলাগুলি হয়েছে এবং অগণিত নীরিহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এরপর আমি কয়েকজন মিলে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেলাম। আমি যখন মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই তার আগে আমার চাকরিতে একটি পদোন্নতি হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আমি যখন অর্ডারগুলো পাই স্বাধীনতার পরে তখন দেখা গেল ওই সরকার আমলেই আমার পদোন্নতি বাতিল করে এবং মার্শাল-ল- বি জোনের অধ্যাদেশে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এখানে একটা কথা বলতে হয় আমাদের শরীয়তপুর জেলা ছিল তখন বৃহত্তর ফরিদপুরের অংশ। ইহা ছিল মাদারীপুর মহকুমাধীন। এখানে কোন পাকা রাস্তা ছিল না স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ওই অঞ্চলে পাকিস্তান আর্মিরা যেতে ভয় পেত। আমাদের এলাকা ছিল নদীপথ এবং আমাদের কয়েকজনের ডিউটি ছিল কর সুরেশ্বর লঞ্চঘাট ও ওয়াপদা লঞ্চ ঘাটে। সেখানে বাংকার ও ট্রেঞ্চ করে দিবারাত্র দায়িত্ব পালন করতাম। এদুটো ঘাট লঞ্চ বা শিপে আসার শত্রুপক্ষের একমাত্র প্রধান পথ। তবে দুইটা যুদ্ধ হয়েছে। ১০ই অক্টোবর ভেদেরগঞ্জ থানার যুদ্ধে আমরা প্রায় চার পাচঁ শত মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেই যুদ্ধ ১০ই অক্টোবর খুব ভোরে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং রাত বারোটায় শেষ হয়। আমাদের পক্ষে ৪-৫ জন ও শত্রুপক্ষের ৮৫ জন নিহত হয় । দেশ স্বাধীন হলে আমি আমার চাকরিতে পুনরায় যোগদান করি।

আমি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বাগমারা/বাঘমারা ট্রেনিং সেন্টারে চারসপ্তাহের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে আমারা মেলাঘর নামক স্থানে অস্ত্রের জন্য অপেক্ষাকালে মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি এম এ জি ওসমানী সাহেব ও খালেদ মোশারফ সাহেব আমাদের ওখানে যান। আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে কর্নেল ওসমানী সাহেব সকল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে পাকিস্তানিদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করবে হিসেব করে। আমরা যে কটা গুলি দেবো তা পর্যাপ্ত নয়। ওরা বৃষ্টির মতো ছাড়বে কিন্তু তোমাদের বৃষ্টির মত ছাড়লে হবে না তোমাদের প্রত্যেকটা গুলি মূল্যবান এবং প্রত্যেকটা গুলি ঠিক টার্গেট মত ফেলতে হবে। তারপর আমরা ওখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। আসার পথে দেখলাম অনেক কিছু। আমাদের শরীয়তপুর এই অংশটা ছিল দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে পরবর্তীতে

প্রশাসনিক সুবিধার্থে ৮ নম্বর সেক্টরে চলে যায়। কাজেই আমাদের ট্রেনিং গুলো হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য। আমরা আসা যাওয়ার পথে বৃহত্তর কুমিল্লার গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যেভাবে আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করছে, আমাদের সহযোগিতা করেছে ও দোয়া করেছে তা ব্যক্ত করার ভাষা নেই। আমরা আসার সময় ১২৬ জন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম একসাথে। রাত হয়ে গেলে দাউদকান্দির একটি হাই স্কুলে অবস্থান করি। পাকিস্তান আর্মিরা তখন খবর পেয়ে ওখানে গোলাগুলি আরম্ভ করে। আমরা শরীয়তপুর জেলার মানুষ আমরা ওখানকার অবস্থান বুঝিনা বিধায় ঐ রাতে আমাদের তরফ থেকে প্রতিত্তোরে কোন গোলাগুলি হয় নাই। ওরা অনেকক্ষণ গোলা গোলাগুলি করে চলে যায়। রাত পোহালে ১২৬ জন যোদ্ধা যাত্রা করি। পথিমধ্যে গ্রামে বাড়ির একজন মায়ের বয়স ৭০ উর্দ্ধ। তার স্বামী নাই, সন্তান নাই, মোটামুটি ভালো আর্থিক অবস্থা আমাদের জন্য মুড়ি নিয়ে আসলো ১২৬ জনকে ডালায় কইরা মুড়ি দিল আমরা খাব না বললে তিনি বড়াই করে বলেন কেন খাবেনা? না খেয়ে যেতে পারবা না। এইযে বাংলার প্রতিটা নরনারীর যোদ্ধাদের প্রতি ভালবাসা ও যুদ্ধের প্রতি যে তাদের সমর্থন ছিল তা ব্যক্ত করার মত নয়। আমরাও উৎসাহিত হয়েছি আমরা যখন আমাদের এলাকায় প্রবেশ করি তখন আমাদের ভিতরে ভাগা ভাগি করে বেশিরভাগ ডিউটি করছি। আমি ব্যক্তি গতভাবে পুরা দুই মাসই আমি সুরেশ্বর ও ওয়াপদা ঘাটে ব্যাঙ্কারে ডিউটি করেছি, আজও আমাদের মনে পড়ে এই যুদ্ধের কথা এই মুক্তিযুদ্ধের কথা। যে সৌভাগ্য শুধু আমার একা নয়- সমগ্র জাতি ও দেশবাসী তখনকার ৭কোটি মানুষের যারা জীবিত ছিল। ওই ৭ কোটি মানুষের সৌভাগ্য যে তারা একটা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে হাজার বছরের বাংলা স্বাধীন করেছে। অনেকেই হয়তো বলে সে যুদ্ধ করেছে। ওই যুদ্ধ সবাই করেছে। আমার দুটো স্মৃতির কথা আজো মনে পড়ে এবং আজও জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় মাঝে মাঝে পীড়া দেয় এই প্রজন্মের ছেলেরা হয়তো সত্যি বললে বিশ্বাস করবে না। আমাদের ট্রেনিং এর সময় ভারতে অতি মোটা চালের ভাত ও পঁচা ডাল খেয়ে জীবন ধারণ করতাম। একদিন দুপুর বেলা যখন খাবারের লাইনে দাঁড়ালাম তখন সবার পেটেই প্রচণ্ড ক্ষুধা। কড়া দুপুরের সময় ডান দিক থেকে খাবার নিয়ে আসছে আমার ডান পাশে একজন মুক্তিযোদ্ধা লাইন ভেঙে সামনে ঢুকে পড়ায় আমি তাকে ভৎসনা করায় সে

লাইনের শেষ মাথায় চলে গেল। তার পর্যন্ত খাবার পৌঁছানোর আগেই ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায়। অজ্ঞান হওয়া বন্ধুটিকে সেবাশুশ্রুষা করে সুস্থ করা হয়।

ক্ষুধার জ্বালা যে কি জ্বালা এই বিষয়টা পরে অনুধাবন করেছি। ঘটনাটি আজও আমাকে পীড়া দেয়- জানিনা, সেই মুক্তিযোদ্ধাটি বেঁচে আছেন কিনা যদি বেঁচে থাকেন তার জন্য আমার শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও দীর্ঘায়ু কামনা। প্রয়াত হলে বিনম্র শ্রদ্ধা ও জান্নাত কামনা করি। আমি মাঝেমধ্যে দোয়া করি যে সে যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আরেকদিনের ঘটনা হলো মেলাঘরে হাজার হাজার মানুষ। ওটা ছিল বনাঞ্চল। পায়খানা প্রসাবের জন্য অনেকেই ঝোপঝাড়ে চলে যেত। একদিন আমি ও আরেকজন বন্ধু সে কাজে হেঁটে যাচ্ছিলাম। মাঠে পৌঁছলে একজন বয়স্ক হিন্দু কৃষক আমাদেরকে বললেন- বাবা তোমরা কবে যাবে এদেশ থেকে? তা আমি বললাম কি কাকা আপনাদের কি খারাপ লাগে আমাদেরকে দেখে? তিনি বললেন-- না কাকা এবছর তোমরা পায়খানা প্রসব করে চাষাবাদের জমি গুলো একেবারে নষ্ট করে ফেলছো- জমিতে পা রাখার জায়গা নেই তাই বললাম। যে অবস্থা এ বছর আমরা চাষাবাদ করতে পারবোনা কিনা ভগমান জানেন। আমরা খুব হাসলাম এবং তিনি আমাদের কে উৎসাহ দিলেন আর বললেন, আশীর্বাদ করি তোমরা যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করো। তোমরা আমার কথায় মনে কিছু নিও না। ভারতীয় নাগরিকের উৎসাহ প্রদান দেখে শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গেল। ফেরার পথে হঠাৎ দেখি এই পঞ্চাশ ৬০জনের একটি যোদ্ধাদল অস্ত্রশস্ত্র সহ দেশে ঢুকবে। যার যার অস্ত্র পরিষ্কার করছে। কমাণ্ডার হুইসেল দিচ্ছেন এখনি তাদের যেতে হবে। যার যার অস্ত্র নিয়ে তোমরা রেডি হও, আমি যেই পাশ দিয়ে আসতেছিলাম হঠাৎ একটা ছেলে দেখি চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল অর্থাৎ ও যে অস্ত্রটা রেডি করার জন্য পরিষ্কার করতেছিল সে অস্ত্রের গুলিটা বের হয়ে তার মাথা ভেদ করে চলে গেল ঠিক আমার পেছনে। তার পেছন দিয়েই আমি হেঁটে আসতে ছিলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা অনেকগুলো অস্ত্র চালনা শিখেছিলাম তন্মধ্যে এসএমসি, এসএমজি,থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এমকে-৫, এসএলআর, এলএমজি এবং হ্যাণ্ড গ্রেনেড। এর মধ্যে সবচেয়ে একটা হালকা অস্ত্র ছিল তার নাম ছিল

এসএম সি। ওটা খুব হালকা, ওইটা যে কোন সময় অসতর্ক হইলেই গুলি বের হয়ে যায়।ঐ অস্ত্রটা দিয়েই সে ছেলেটা মারা গেছে। তারপর থেকে আমরা সতর্কতার সহিত যতদিন মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম ওই অস্ত্রটা কেউ হাতে নিতাম না যে ছেলেটা মারা গিয়েছিল সেই ছেলেটার নাম ছিল আলাউদ্দিন। সে নাকি ১৫ দিন আগেও একবার দেশে ঢুকতেছিল কিন্তু কুমিল্লা এসে পাকিস্তান আর্মির সম্মুখীন হওয়ায় তারা আবার ইন্ডিয়াতে ফেরত যায়। কিন্ত তার বাড়িতে তার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে সে পাকিস্তানিদের গুলিতে মারা যাওয়ার। অথচ সে পাকিস্তানিদের হাতে মারা যায়নি- সে এক্সিডেন্টলি মারা গেছে । বর্ণিত স্মৃতি দুটো আমার আজও মনে পড়ে।



বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এম মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ

আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএম মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, আমার পিতার নাম আব্দুল হাই মাঝি, মাতার নাম ফাতেমা বেগম, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যখন মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলেন তখনই আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আমরা আটজন প্রস্তুতি নিয়েছিলাম যার মধ্যে ছিলেন একজন কমান্ডার তিনি আমার চাচা ছিলেন এবং তাকে নিয়ে আমরা প্রস্তুতি নিতে লাগলাম ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য। আমরা আগস্ট এ ৩১ তারিখে ইন্ডিয়া অভিমুখে রওনা করলাম আমাদের এই এলাকা থেকে আমরা নৌকার যোগে ষাট নল এলাকায় গেলাম ওখান থেকে আমরা কুমিল্লার চান্দিনা গেলাম, চান্দিনা থেকে আমরা গোমতী পার হয়ে গেলাম দিঘির পাড় এরপর আরো কিছু এলাকা অতিক্রম করে কোনাবন দিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ায় যাওয়ার প্রস্তুতি ছিল কোনবোন দিয়ে আমাদের ইন্ডিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি ছিল। এই জায়গাটুকু পার হতে আমাদের ছয় দিন সময় লাগে কেননা আমাদেরকে রাতের বেলা যখনই প্রস্তুতি নেই ঠিক তখনই কোনো না কোনো সমস্যার কারণে আমরা বের হতে পারি না। পাকিস্তানি আর্মিদের টহল ছিল যার কারণে আমাদের অনেক সময় লাগে।

আমাদেরকে সেখান থেকে ছয় সেপ্টেম্বর হাপানিয়া ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় তারপর

হাপানি ক্যাম্পে আমাদের সময় কাটতে থাকে, সেখানে আমরা রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সবকিছু নিজেরেই করতাম। সেখানে ৭০ ফুট নিচ থেকে পানি তুলে আমাদের রান্না বান্না অন্যান্য কাজকর্ম চলত এবং আমরা নিজেরাই পরিবেশন করতাম, সবকিছু ব্যবস্থা ছিল। অক্টোবর দুই তারিখে আমরা শুনলাম যে ক্যাপ্টেন নাসির সাহেব আসছেন আর্মিতে লোক রিক্রুয়েট করার জন্য এই কথা শুনে আমরা লাইনে দাড়ালাম লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা নয় জনের মধ্যে তিনজন রিক্রুট হলাম। ২ তারিখে রিপোর্ট করার পরে উনারা চলে গেলেন এরপরে কারো একটু পরে এসে আমাদেরকে নিয়ে গেল ফটিকছড়ি সেখানেই আমাদের ট্রেনিং শুরু হবে এই ফটিকছড়িতেই ছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, আমরা সেখানে ১১ তারিখ পৌঁছালাম এবং ১৮ তারিখে আমাদের ট্রেনিং শুরু হল, ভোর পাঁচটা থেকে শুরু করে দেড়টা পর্যন্ত আমাদের ট্রেনিং হতো, সকালে কিছুক্ষণ শরীর চর্চার করার পর এসে আমরা রুটি আর এক মগ চা দিয়ে সকালে নাস্তা করতাম। আমরা এগুলো খেয়ে চলে যেতাম আবার ট্রেনিং গ্রাউন্ডে এবং সেখানে একটা দেড়টা পর্যন্ত ট্রেনিং হতো ট্রেনিং শেষ করে আবার তাবুতে এসে গোসল করে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করতাম, এরপর ট্রেনিংয়ের সাথে ছিল ডিউটি একেক দিন রাত্রে একে গ্রুপের এবং দিনে ভাগ করে বিভিন্ন জায়গাতে ডিউটি করতে হতো আমাদের ট্রেনিং অবস্থায় আমি ট্রেনিং এ খুব ভালো করেছিলাম এই জন্য আমাকে প্লাটুন টুআইসি তে সুযোগ দেয় এবং আমাদের যে লেন্স নায়ক ছিল তাকে বিভিন্ন কাজ এবং অন্যদের ডিউটি ভাগ করার কাজে সহযোগিতা করতাম। এভাবে দীর্ঘ এক মাস নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের ট্রেনিং চলে। ট্রেনিং এ হ্যান্ড গ্রানেট রাইফেল এলএমজি এসএমজি সাবমিশন গান টুইস্ট মোটার থ্রি ইঞ্চ মটার ও অন্যান্য অস্ত্রের উপর আমাদের ট্রেনিং হয়। আমাদের ট্রেনিং হওয়ার পরে আমাদের আবার নতুন করে ডাক আসলো যে আমাদেরকে এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে আমাদের কে তিন ভাগে ভাগ করে। সেই মতে আমি সেকেন্ড বেঙ্গলে পড়ে গেলাম। সেকেন্ড বেঙ্গল এর অবস্থা ছিল আমাদের পাশের পাহাড়ে, আমার সাথে যারা পড়ল, আমরা সবাই মিলে ওই পাহাড়ে চলে গেলাম এবং সেখানে কিছুদিন থাকার পর নভেম্বরের শেষের দিকে শুরু হলো আমাদের শত্রুর উপর আঘাত

আনার সময় এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমরা প্রস্তুতি নিতে রাখলাম এবং ডিসেম্বর এর প্রথম সপ্তাহেই আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ৬ তারিখে আমরা প্রথম আক্রমণ করলাম আখাউড়ার সিংগারবিল এই যুদ্ধে পাকিস্তানিরা কুমিল্লা থেকে সেলিং আর ইন্ডিয়ানরা আগরতলা থেকে সেলিং করে এই যুদ্ধে আমাদের একজন ক্যাপ্টেন মারা যায় এবং আমরা সেখানে আত্মগোপন করি, সেই অবস্থায় একটি টিয়ারশেল এসে আমাদের একজনের ওপরে পড়ে এবং সেখানে সে মারা যায়। এরপরের দিন আমাদের ব্যাটেলিয়ান সিঙ্গার বিলে যায় এবং দেখি অনেক পাকিস্তানি সৈন্য মরে পড়ে আছে এবং আমরা বুঝতে পারি যে আমারা এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। এরপর আমরা আবার ফিরে গেলাম আগরতলায়।

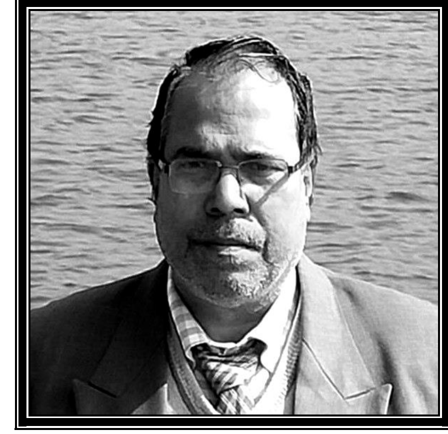
আমাদের ব্যাটেলিয়ান আবার গেল সিলেটের মাধবপুর সেখানে গিয়ে আমরা কয়েক দিন অবস্থান করলাম। সেখানে সিলেটের মাধবপুরে প্রায় সাতশ রাজাকার আমাদের এখানে আত্মসমর্পণ করল এবং তাদের সব অস্ত্রসমর্পণ করল এর মধ্যে একটা অঘটন ঘটল সিলেট চট্টগ্রাম রোড পার হওয়ার সময় আমাদের সেকেন্ড বেঙ্গলের সিও নাসির সাহেবের তলপেটা গুলি লাগলো এবং রফিক নামের একজন হাবিলদার মারা গেল। সেখানে আমরা কিছু দিন অবস্থান করার পর আবার রওনা দিলাম কুমিল্লার দিকে কুমিল্লা থেকে গেলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এরপর আশুগঞ্জ আখাউড়া হয়ে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এর মধ্যে রাত্রে পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের অনেক যুদ্ধ হয়েছে আমরা আগাইছি এবং তারা পিছিয়েছে এভাবে আমরা আশুগঞ্জ পার হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যখন যাচ্ছি তখন আমরা মুড়াপাড়ায় কয়েকদিন যুদ্ধ করে আসি শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে। আমরা নারায়ণগঞ্জের ডেমরায় অবস্থান করলাম ১৫ তারিখ রাত্রে আমরা সেখানে আসলাম কিন্তু কেউ বলতে পারব না যে আমরা একটা ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে বসে আছে। ১৬ তারিখে যখন দেশ স্বাধীনতার ঘোষণা হলো তখন আমরা ডেমরা থেকে স্টেডিয়ামে আসি এবং সেখানে দুই দিন অবস্থান করি এবং আমরা চলে গেছি রেসকোর্স ময়দানে সেখানে গিয়ে আমাদের তাবু টানানো হয় এবং ওখানে আমরা দীর্ঘদিন অবস্থান করি। জানুয়ারি ২৯ তারিখে কোরবানি ঈদ হয়েছিল সে

ঈদের পরে মিরপুর ১২ নম্বরে অনেক পাকিস্তানিরা অস্ত্র জমা দিবে সেগুলা আনার জন্য আমাদের সিও সাহেব মইনুল হোসেন চৌধুরী, তিনি সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সি ইউ ছিলেন। তিনি অর্ডার করলেন যে আগামীকাল ৩০ তারিখ যেতে হবে মিরপুর ১২ নাম্বার এই প্রেক্ষিতে আমরা আমরা ঈদের দিন দিনের বেলা দুপুরের খাবার খেয়েই রাতের মধ্যে ট্রাক করে চলে গেলাম মিরপুর ১২ নাম্বারে সারারাত মিরপুর ১২ নাম্বার এর এদিক সেদিক ঘুরাফেরা এবং সেদিকের পরিস্থিতি অবজারভেশন করা এবং তারপর ৩০ শে জানুয়ারি ভোর ছয়টায় আমরা ১২ নাম্বারে ঢুকে পড়ি। ঢুকে পড়েই আমরা সেখানে অবস্থান নেই এবং অবস্থান নেওয়ার পর দেখি কোন রুমে কোন পুরুষ লোক নাই, সেখানে কয়েকটা রুমের ভিতরে তখন আমাদের কমান্ডার আমাদেরকে বলল যে তোমরা ছাদের উপর উঠে এদিক সেদিকে দেখো যে কি অবস্থা। তার কথামতোই সেখানে সবকিছু করা হচ্ছিল ঠিক এই মুহূর্তে দেখা গেল কিছু লোক আমাদের দিকে গুলি করতে করতে আগাইতেছে আমরা তখন আমাদের কমান্ডার কে জিজ্ঞেস করলাম যে ঘটনা কি? তখন সে বলল এই লোকগুলো হচ্ছে মুক্তিফৌজ তারা আমাদের সহযোগিতার জন্য আসতেছে তো আমাদের একজন এলএমজি ম্যান এবং একজন হাবিলদার ১২ নাম্বার পানি ট্যাংকের নিচে একটি মসজিদ ছিল সেখানে এলেন যিনি অবস্থান নিলো যারা আসতেছে তাদের প্রতিহত করার জন্য এবং আমরা তাদের পেছনে অবস্থান নিলাম এবং রাইফেল তাক করলাম যে কিছু দেখা যায় কিনা হঠাৎ দেখা গেল ওই এলএনজি নিয়ে যে অবস্থান করেছিল আবুল খায়েরের পিঠে গুলিয লেগেছে, তার গুলি লাগার পর আমাদের হাফিলদার অলিউল্লাহ আমাদের এলএমজি ম্যান আবুল খায়েরকে মসজিদে নিয়ে রাখল।

মসজিদের রেখে মসজিদ থেকে বের হয়ে উনি যেই মসজিদের সামনে দাঁড়ালো সেই টাইমেই একটা গুলি গিয়ে লাগলো তার বুকে এবং উনি পড়ে গেলেন, এই দৃশ্য দেখে আমি আর একজন ছিল ইকরামুল হক আমরা কয়েকজন মিলে পূর্ব দিকে দেওয়াল টপকিয়ে ওপাশে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের রেজিমেন্টের কিছু লোক সেখানে অবস্থান করতেছে এই মুহূর্তে আমরা নিজেরাই হতভম্ব হয়ে গেছি

এবং নিজেদের গ্রেনেট নিজেদের লোকেদের উপরেই মারছি আবার ওরাও গালাগালি করতেছে, আমাদের সাথে এক সহকর্মী ছিলেন তার নাম ছিল আব্দুল হাই হঠাৎ তার নাকের উপর গুলি লাগলো এবং সে পড়ে গেল এই অবস্থা দেখে আমরা সবাই হতাশ হয়ে গেলাম। কি হবে, বসে বসে আমরা চিন্তা করছি যে দূর থেকে একটা বিল্ডিং এর ছাদের উপর থেকে আমাদের দিকে তাক করে গুলি করতেছে এবং আমরাও গুলি করতেছি এইভাবেই চলছে কিন্তু কেউ বের হওয়ার মত সুযোগ নাই এভাবে চলতে চলতে যখন আসর নামাজের আযান দিল আমাদের সাথের সুবেদার চান মিয়া আর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সেলিম সাহেব উনারা এসে আমাদেরকে বলল এখন আর আমাদের এখানে বসার সময় নাই এখন আমাদের এখান থেকে চার্জ হয়ে বের হয়ে যেতে হবে যদি না বের হতে পারি আমরা কোন মতেই কেউ বাঁচতে পারব না। যাইহোক আমরা সেখান থেকে উনাদের কথা মত সবাই মিলে ১০-১২ জন রাইফেল ডান দিক বামদিক এদিক সেদিক ত্যাগ করে মিরপুর উত্তর সাইডে যেদিকে নাকি তখন যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে একমাত্র সেটি ছিল আমাদের বের হওয়ার রাস্তা আর কোন রাস্তা ছিল না। আমরা উত্তরদিকে বের হয়ে গেলাম এবং সেদিকে গিয়ে দেখি জমিতে ধান লাগানো ছিল এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের এগোনো লাগবে এবং সেখানে আমাদের সাথে ছিল হাবিলদার চান মিয়া আর মিরপুর থানার ওসি, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সিলিম সাহেব এছাড়া আরো ১০-১২ জন ছিল, আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম, আমরা ওইখানে গিয়ে যখন লাফিয়ে পড়লাম তখন আমরা সবাই কাঁদার ভিতর আটকে গেলাম পিছন দিক থেকে বিহারীরা আমাদেরকে গুলি করতেছে এবং ইয়াল ইয়ালি বলে এগিয়ে আসতেছে, ওই অবস্থা দেখে আমাদের জুতা কাপড়-চোপড় শুধুমাত্র একটা জাইঙ্গা এবং একটা জামা পরা অবস্থায় পানিতে ভেসে উপরে গিয়ে উঠলাম, ওপাড়ে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন আমরা দেখতে পারলাম শেষ মুহূর্তে আমরা মাত্র তিনজন লোক আমি হাবিলদার চান মিয়া আরেকজন লোক এই তিনজন লোকই মাত্র আমরা ওখান থেকে বের হয়ে ওপাড়ে পৌছালাম। ওখান থেকে হেটে আমরা টঙ্গী যাই। সেখান থেকে একটা ট্রাক নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে আমাদের সিও সাহেবকে

এ ব্যাপারে জানানো হয় আর এই যুদ্ধে আমাদের প্রশিক্ষিত সুবেদার হাবিলদার লেস নায়ক এরকম ৪০ জন লোক মারা যায়। আর সেই লাশ গুলো রেখেছিল পানির ট্যাংকির নিচে কারণ বহু বছর পর সেখানে অনেক মানুষের হাড় পাওয়া যায় এবং আমরা সে মনে করলাম যে এই সেই মানুষের লাশগুলোর হাড়গোড়, যারা ওই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল আমাদের সমস্ত লোককে ওই ওখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারপর আমরা চলে আসলাম সেখানে আসি আমি পাঁচ তারিখে রিপোর্ট করলাম এবং বললাম যে আমি আর এখানে চাকরি করব না তখন ৬ তারিখে আমাকে রিলিজ দেওয়া হয় এবং আমি বাড়িতে চলে আসি তারপরে লেখাপড়া শুরু করি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদীপ শংকর রায়

১৯৭০ সালে তখন আমি এস এস সি পরীক্ষার্থী, আমার রাজনীতিতে হাতে কড়ি মাষ্টার কমরেড মিলন বড়ুয়ার হাত দিয়ে, আমার বাবাও কমিউনিজম বিশ্বাস করতেন, মাষ্টার কমরেড এর সাথে সক্ষতা ছিল ভীষণ ভাবে, আমি তখন ৮ ম শ্রেনীর ছাত্র, মিলন বাবু একটা বই গুঁজে দিয়ে বল্ল পড়ে দেখ, তবে গোপন করে পড়তে হবে, বইটা মলাট পড় কৌতুহল বাড়ল, মলাটে লেখা ভোল্টাইয়ার, রাতে ক্লাসের পড়া শেখার পড় হাতে বইটা নিয়ে পড়তে শুরু করলাম, যতই পড়ি ততই ভালো লাগছে, আমার শরীরের মধ্যে বিপ্লবী শিহরণ জেগে উঠল, বইটি পড়তে পড়তে কখন যে সকাল হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি, আমার মা” এর কথা শুনে তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে উঠে পরলাম, সেই থেকে আমাকে বইয়ের নেশা পেয়ে বসল, এর পর থেকে একটা একটা অনেক বই পড়ার সুযোগ হল, তানিয়া, মা মেক্সিমগোর্কী, লেনিন, কালমার্কস, মাউসেতুং, চীনের আকাশে লাল তারা, ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, রেনেসাঁ, একপা সামনে একপা পেছনে, ও ভোলগা থেকে গঙ্গা আরও অনেক বই যা এই মুহুর্তে মনে পরছে না, বিভিন্ন মিটিংএ মিছিলে যোগ দিতে দিতে আমি কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী হয়ে গেলাম।

১৯৭১ সালের ৭ ই মার্চে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে ঘোষণা শুনলাম, সাথে

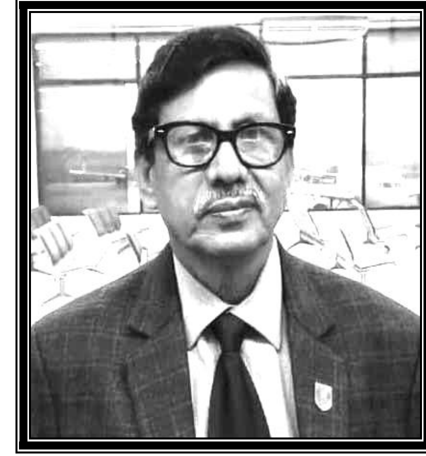
বাঙ্গালী জাগরনের ভাষণ, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে অবরোধ তৈরী কর, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি তোমার যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, তোমার আমার ভাই, যখন রক্ত দিতে শিখেছি, রক্ত আরও দেব, এই দেশকে ও এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ, সেই দিনটা ছিল ৪ টাএপ্রিল রোজ রবিবার বিকাল ৫ টার দিকে রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মজুমদার খীল গ্রামের স্বর্ণ ব্যবসায়ী রাঙ্গামাটিতে তবল ছড়ীতে স্বর্ণ দোকানের মালিক দিজেন্দ্র সাহা তার বউ সহ দুই মেয়ে একটা ছেলেসহ আমাদের বাড়িতে (লালানগর তেজেন্দ্র মাষ্টার) আশ্রয় নেই, লুটার বাহিনী খবর পেয়ে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে, অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি, সকাল হতেই আমাদের গ্রামের শুধাংশু বিমল নাথ, বর্তমানে বীর মুক্তি যোদ্ধা, সে ওদের সবাইকে নিয়ে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়, আমার মাসি মেসো, আমার বড় বোন কে নিয়ে স্থানীয় একজন মুসলিম কে সাথে নিয়ে কাউখালী পার্বত্য জেলায় চলে যাই, সেখানে গিয়ে আর অনেকের সাথে দেখা হয়ে যায়, তার মধ্যে আমার আপন জ্যেষ্ঠতোত ভাই আমার মেজদা স্বপন কুমারের সাথে দেখা হয়, পরের দিন উক্ত এলাকার ঊর্য্য মাষ্টার চাকমা উপজাতি আমাদের ভারতে নিয়ে যাওয়ার সব রকম ব্যবস্তা করে আমরা প্রায় ৫০/৬০ জনের দলকে নিয়ে পাহাড়ী পথে পানছড়ি হয়ে লক্ষ্মী ছড়ি বাজারে পৌঁছাতেই রাত হয়ে যায়, বাজারের হোটেলে রাতের ভাত খাওয়ার পর আমরা সবাই লক্ষ্মীছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাত যাপন করছিলাম, গভীর রাতে একদল পাহাড়ী ডাকাত বাহিনী আমাদের কে বিদ্যালয় সকল দরজা ছিকল টেন দিয়ে একটা দরজা খোলা রেখেই আক্রমণ করে বসে, আমরা লোক বেশী থাকায়, তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

পরের দিন সকালে বাজারের চা এর দোকানে সকালের নাস্তা করতে প্রায় ১১ বেজে গেছে সেইখান থেকে রওনা হলাম পাহাড়ী পথ আকা বাকা উচু নিচু সেইদিন আর কোথাও অপেক্ষা করিনি, রাত প্রায় ২ টা হবে শিলছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাহিরের বারান্দায় চন্দ্রের আলোতে স্পষ্ট দেখা গেছে কিছু অন্ধ সম্ভতা দেখতে পেয়ে সুর্য্য কুমার চাকমা আমাদেরকে চুপচাপ নিচের দিকে নামতে বলাতে সকলেই ইষ্টনাম জপ করতে করতে ত্রিপুরা বর্ডারে প্রায় কাছেই সাড়ে

পাঁচ হবে প্রায় হঠাৎ গুলিবর্ষণ হচ্ছে, অনেক সাবধানতার সাথে আগাতে লাগলাম, কিছু দুর আগাতেই সমুখে একটা নদী পেলাম পানি তত বেশি নয় এক হাটু পরিমাণ, নদী পার হওয়ার পর ভারতের ত্রিপুরা বড়ার, আমরা ভারতে পৌঁছে গেছে জেনে স্কুল কলেজের ছাত্ররা, জয় বাংলা ধনী দিতে দিতে, সাহাবরুমে বাজারে এসে পৌঁছালে দেখা মিলল আমার এলাকার কিছু লোকজন, যেমন- আমার কাকা অনিলচন্দ্র নাথ (বর্তমানে বীরমুক্তিযোদ্ধা), অমর দাশ (বর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধা), মিলন দাশ, অরবিন্দ দাশ, অসিত দাশ, মধুসূদন দাশ, আরও এক কাকা সুনীল চন্দ্র নাথ, ওদের কাছেই জানতে পারলাম, পাশেই নাকি একটা ট্রানজিট ক্যাম্প আছে পেলাডোন ক্যাম্প, সেইখানে নাকি ট্রেনিং দেওয়ার কোন ওস্তাদ নেই, তখন নিরুপায় না দেখেই আমরা বেশ কিছু লোক আগরতলা তেলিয়ামুড়ায় চলে আসি, ওখানে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর সেখান থেকে যখন মেজদা মানে স্বপন কুমার মার্গেনিটা আসাম রাজ্যে তাহার মামা বাড়িতে চলে গেলে আমি তখন একা হয়ে পরি, আমি আগরতলা তেলিয়ামুরা থেকে মিজরাম মনুবাজার হয়ে ৭ নং সরানার্থী ক্যাম্পে যাওয়া পর তখন সেখানে আশ্রয় নেই, পরের দিন ১৮ নং ব্যারাকে ফিরে গেলাম, ওখানে কিছুদিন থাকার পর, ওখান কার সিইও কর্নেল নন্দ লাল শর্মা সাথে দেখা হল, পরে দেখা হল সাতকানিয়ার আবু ছালেহ আর শেখ মনির আমাকে নানান কথা জিজ্ঞাসা কর, আমি উনাদের বলেছি প্যারাডোনা ক্যাম্প এক কোন ওস্তাদ না থাকার কারণে সেখানে কোন কেউ ট্রেনিং করতে পারছে না, তক্ষনাৎ একজন বাঙ্গালী ওস্তাদ কে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে ওরা তিন জন চলে গেলেন, আমি ক্যাম্পে রয়ে গেলাম ট্রেনিং করতে, প্রায় ১ মাস ১৫ দিনের মত অবস্থান করার পর ২০ দিনের ট্রেনিং য়ে রাইফেল, এস এল আর, এস এম জি গ্রেনেড ছোড়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, ট্রেনিং ক্যাম্পে থাকা এই মুহুর্তে কয়েকজন ওস্তাদের নাম মনে আছে তাদের নাম লিখছি মেজর তারা মেজর ভগরৎ সিং, লে বাজুয়া সিং, শিমুল ওস্তাদ, ওস্তাদ ধর্মপাল, বীর পাল ওস্তাদ, সুবেদার রাজু হালদার, আরও কয়েক জন বাঙ্গালী ওস্তাদ ছিল সুবেদার জলিল, সুবেদার রসিদ। যারা অর্গেনেজার ছিল, আবু ছালে, নজীর আহামেদ, নুরুল হক, ডাঃ পাঁচকড়ি।

ট্রেনিং শেষে ২৪ শে নভেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার দেশে ফেরার সময় আমরা ৮০ জনের একদল মুক্তিযোদ্ধাদের কে নিয়ে ভারতের মিলিশিয়া বাহিনীর কর্নেল

পূরুকায়স্থ এর অধীনে আমি এবং আমরা খাগড়াছড়ি জেলার রাঙ্গা পাহাড়ের স্থানে এসে ক্যাম্প করে, সেখানে থেকেই রাস্তা, ব্রীজ কালভার্ট মাইন্ড দিয়ে বিদ্বস' করি, ক্যাম্পে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর কর্নেল সাহেবের নির্দেশে আমাদের দলে থাকা ৩৮ জন মুক্তিযোদ্ধাদের কে ফটিকছড়ি এলাকার বাসিন্দা বলে তাদেরকে সাথে নিয়ে ফটিকছড়ি দাঁতমাড়া ইউনিয়ন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পৌঁছায়, পরে আমরা পুনরায় রাঙ্গাপাহাড় ক্যাম্পে ফিরে এসে অবস্তান করি। পরে কর্নেল নির্দেশে রাঙ্গামাটি জেলার মারিশ্যা থেকে মায়ানী পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, পৌঁছানোর পর হঠাৎ গুলিতে শব্দ শুনতে পায় বুঝতে পারলাম শত্রু বাহিনী আমাদের লঞ্চ আক্রমণ করেছে, আমরা ও তৎক্ষনাত পাল্টা গুলি চালিয়ে শত্রুবাহিনীকে পিছু হঠিয়ে পালিয়ে যায়, অন্ধকার পাহাড়ি জঙ্গলময় এলাকা হওয়ায় অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাদি জানা সম্ভব হয়নি। শত্রুবাহিনী সেই এলাকা ত্যাগ করে বহুদুর পালিয়ে গেছে নিশ্চিত জেনে আমরা ভোর হতে হতেই রাঙ্গামাটি সদরে চলে আসি, এর কয়েক দিন পর ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সুচনা হয়, সেখান থেকে রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম সড়ক হয়ে ফতেয়াবাদ দিয়ে চট্টগ্রাম গিয়ে আমরা চট্টগ্রাম সিটি কলেজে এসে জামায়েত হই, ওখানেই অস্ত্রাদি জমা দেই, সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, আঃসঃম আব্দুর রব, মেজর জলিল, সাবেক মেয়র এ বি এম মহিউদ্দীন চৌধুরী, সহ আরও অনেকেই। উপস্থিত ছিলেন, পরেরদিন বাড়িতে না এসে আমার মামা বীরমুক্তিযোদ্ধা সমীরণ নাথ সাতকানিয়া, বড়হাতিয়া মামার দেশে চলে যাই কারণ আমার সাথে রাঙ্গুনিয়ার কোন মুক্তিযোদ্ধা সংগে ছিল না, তাই একা আসতে সাহস পাইনি, তারপরও রেখে যাওয়া মা বাবা ভাই বোনের কোন খোজ খবর পাইনি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল আমিন (কাওসার)

আমি দুই নম্বর সেক্টরের (মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলে) একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধে গণ আন্দোলন থেকে আমি ছাত্র রাজনীতি সাথে জড়িত ছিলাম। আমার ছাত্র রাজনীতির হাতে খড়ি হয় দুজন ছাত্র নেতার হাতে। একজন ব্রাক্ষণবাড়ীয়া কলেজের তৎকালিন ছাত্র নেতা সাবেক এম.পি আঃ লতিফ ও আরেকজন ছাত্র নেতা সাবেক বাকসুর জি.এস মিজানুর রহমান খান। (মিজান ভাই) তিনি ৬৯ এর গণ আন্দোলনের ১১ দফার পক্ষে ছাত্রদের উজ্জিবিত করার জন্য এলাকায় তথা নবীনগরে চলে আসেন। আমি তখন পূর্ব পাক ছাত্রলীগের স্কুল শাখার সভাপতি। আমাদের এলাকাটি ছিল মুসলিম লীগ প্রভাবিত। এখানে মুসলিম ছাত্রলীগের প্রভাব ছিল অত্যাধিক। গুটি কয়েক ছেলে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে ছাত্রলীগ করতাম। তার মধ্যে শাহাজুল আলম, নারায়ন সাহা, ওয়াদুদ ভাই, হেলাল ভাই, মোতালেব, ইকবাল, বাবুল সহ হাতে গোনা কয়েকজন। ৬৯ সত্তরের গণআন্দোলনে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবী নিয়ে যা মিজান ভাইয়ের হাত থেকে প্রাপ্ত লিফলেটটি এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। আমরা স্বাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠি এবং পরবর্তী সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ি। ৭০ এর নির্বাচনে এম.এল.এ দেওয়ান আবুল আব্বাস ও এম.পি কাজী আকবর উদ্দিন সিদ্দিকের নির্বাচনের প্রচার কাজে

সরাসরি অংশগ্রহণ করি। এরই মধ্যে নির্বাচনী সভায় বঙ্গবন্ধু ব্রাহ্মনবাড়িয়া আসলে সার্কিট হাউজে আমরা সরাসরি দেখা করি যা আমাদের আরও উজ্জিবিত করে। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯ এর মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করেন, যা দেখে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা নানা ছলচাতুরী করে বাংঙ্গালীদের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত করে দেন। এতে সারা বাংলা গর্জে উঠে তার ঢেউ নবিনগরের মতো একটি মফস্বল শহরেও এসে লাগে। উত্তাল দিনগুলিতে আমরা মিছিল মিটিং করতে থাকি, আমাদের শ্লোগান ছিল বীর বাঙ্গালী অস্ত্রধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা। পিন্ডি না ঢাকা ঢাকা। এরই মধ্যে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষনে আমরা বুঝে গিয়েছি আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা। আমরা প্রস্তুত হতে থাকলাম। ইতিমধ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ২৩ শে মার্চ সারাদেশে পাতাকা দিবস পালনের ডাক আসলে আমার নেতৃত্বে অফিস পাড়া ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে নবীনগর পুলিশ ষ্টেশনে (থানা) প্রথম পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে জয় বাংলা বাহিনীর পতাকা যা পরে স্বাধীন বাংলার পতাকা হয় তা উত্তোলন করি । আমার সাথে ছিল শাহানওয়াজ মিলন। মিছিলকরে আমরা পতাকা নিয়ে যাই মিছিলে ছিল ইকবাল, মোজাহার, বাকী, দুলাল, রফিক, ফারুক, মতি, রহিম সহ আরো অনেকে। ২৫ শে মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর সারাদেশে ক্রাক ডাউন শুরু করলে ঢাকা থেকে আনেক শরনার্থী ও ই.পি.আর, বেঙ্গল রেজিমন্টের সৈনিকগণ পালিয়ে আসতে থাকে। আমরা হাইস্কুলে ক্যাম্প করে তাদেরকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করি এবং সৈনিকদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্তাঞ্চলে প্রেরণ করি। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ক্যাপ্টেন মাহাবুব, গাফফার ও আইনুদ্দিন এর নেতৃত্বে মুক্ত এলাকা ঘোষনা করা হয়েছিল ।

মার্চ, এপ্রিল, মে মাস পর্যন্ত ঢাকা থেকে আসতে থাকা যুবকদের সংগঠিত করে ও নিরাপত্তা দিয়ে সি.এন্ড.বি. রোড পার করে আগরতলা পাঠানোর ব্যবস্থা করি। এর মধ্যে মে মাসে নবীনগর পাক হানাদার বাহিনী স্থায়ী কাম্প স্থাপন করলে আমরা বিভিন্ন এলাকায় চলে যাই এবং যুবকদের সংগঠিত করে বাড়িখলা মিজান ভাইয়ের বাড়ীতে জড়ো করে ব্রিফিং দিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আগরতলা প্রেরণ করতে থাকি। আমি জুন মাসে মিজান ভাইকে বললাম ভাই আমি প্রশিক্ষণের জন্য আগারতলা

চলে যেতে চাই এবং সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব। তিনি দুইটি চিঠি লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিল একটি দেওয়া আবুল আব্বাস সাহেরে কাছে আর একটি ঝুনুদাস এর কাছে লিখা। আমি ৪ঠা জুলাই সকাল ১০টায় বাড়ীখলা থেকে রওনা দিয়ে অনেক প্রতিকুলতার মধ্যে দিয়ে মনিঅন্দ চৌধুরী বাড়ী হয়ে শাহনাওয়াজ চৌধুরীর সহায়তায় রাত ৮ টায় আগরতলায় পৌঁছি। কামান চৌমুহনী রাস্তায় হাটার পথে ঢাকা ফার্মগেইটের মিলন ও খোকন ভাইয়ের দেখা পাই। যাদেরকে জুন মাসে আমরা আগরতলা যেতে সাহায্য করেছিলাম। তারা আমাকে হোটেলে নিয়ে যায় এবং রাতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। পরদিন আমাকে কংগ্রেস ভবন থেকে বাংলাদেশের আইডি কার্ড (যা এখনো আমার কাছে আছে) সংগ্রহ করে নরসিংগড় যুক্যাম্পে যেতে বলেন। আমি সেইভাবে নরসিংগড় ক্যাম্পে গিয়ে ঝুনুদা কে চিঠি দিয়ে উনার তত্ত্বাবধানে ক্যাম্পে অবস্থান করি। ৪/৫ দিন পর আমার ছাত্র নেতা শাহাজুল আলম আমাদের ক্যাম্পে এলে আমি তাকে আমার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি আমাকে ঝুনুদাস থেকে আউট পাশ নিয়ে শহরে যাওয়া কথা বলে কলেজ টিলায় চলে যেতে বলেন। সেখানে ছাত্রলীগের কর্মীদের স্পেশাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান। সেই মোতাবেক আমি ১০ই জুলাই কলেজ টিলায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের (ছাত্রলীগের) বি.এল.এফ এর ট্রেনিং এর জন্য রিক্রুট করা হচ্ছে আমি ছোট এবং এস.এস.সি পরিক্ষার্থী ছিলাম বলে রিক্রুট করা হবে না বলে জানিয়ে দেন। এই অবস্থায় আমার হতাশা ও কান্নাকাটি দেখে তৎকালীন ছাত্র নেতা ডাকসুর জিএস আঃ কুদ্দুস মাখন ভাইয়ের বিশেষ সুপারিশে আমাকে রিক্রুট করা হয়। সেখান থেকে অন্যদের সাথে আমি মেঘালয়ের হাফলং মুজিব বাহিনীর (বি.এল. এফ) ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করি। সেটা ছিল ভারতীয় একটি সেনা ক্যাম্প। ১২/০৮/১৯৭১ থেকে ১৫/১০/১৯৭১ইং মোট ৬২ দিন ট্রেনিং গ্রহণ করি। আমার অস্ত্র প্রশিক্ষণ ছিল ৩০৩ ও ৭.৬২ রাইফেল এস.এল.আর, এল.এম.জি, ট্রেনইগান, টু ইঞ্চি মটার ও ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা আগতলায় মুজিব বাহীনির হেডকোর্য়াটারে ফিরে আসি। আমি শাহাজুল আলম ভাইয়ের গ্রুপে অন্তভুক্ত হয়ে ২০/১০/১৯৭১ ত্রিপুরার বক্সনগর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং রতনপুর গ্রামে একটি পরিত্যাক্ত বাড়ীতে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করি। আমাদের গ্রুপে ১৪ জন ছিল এর মধ্যে টু

আই সি ছিল আব্দুল কুদ্দুস। সহযোদ্ধা ছিল আঃ আওয়াল, হুমায়ন মামা, শাহানেওয়াজ ও আরো অনেকে।

আমরা ২টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি এর মধ্যে একট ইব্রাহীমপুর এলাকা জুগিদ্বারা ও নবীনগর থানা মুক্ত করার যুদ্ধ। জুগিদ্বারার ব্রীজ ভাঙ্গা এবং মুক্তি যোদ্ধাদের পাহাড়া থাকায় পাক পাকহানার বাহিনী নবীনগর থেকে দক্ষিন দিকে যেতে পারে না। তাই তারা মুরিয়া হয়ে উঠে যে কোন উপায়ে পারাপাড়ের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে নভেম্বর মাসে একদিন ভোর রাতে পাকহানাদার বাহিনী আশে পাশে বাড়ীঘর পুড়িয়ে গুলা গুলি করে ভাঙ্গা ব্রীজ পর্যন্ত এসে পজিশন নেয়। এর মধ্যে সুবেদার গিয়াস উস্তাদের নেতৃত্বে প্রথমে তাদের এম্ববুস করা হয়। আমরা আশে পাশে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেয়ে দ্রুত যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে আসি ও ব্রীজের দক্ষিণ পারে বাশ বাজার সহ ইব্রাহিমপুর গ্রামে পজিশন নিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করি। সারাদিন প্রচন্ড গোলাগুলির পর পাক হানাদার বাহিনী সন্ধায় পিছু হটে। আমরাও যার যার ক্যাম্পে চলে যাই। সর্বশেষ আমি যে যুদ্ধটা করি সেটা হলো নবীনগর থানা পাকহানদার বাহিনী মুক্ত করণ যুদ্ধ। এর মধ্যে রসুল্লাবাদ বাজার ও শিবপুর বাজারে আশে পাশের বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডারদের নিয়ে ২টি মিটিং হয় নবীনগর আক্রমন করার ব্যাপারে। সিদ্ধান্ত হয় দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর দিক থেকে মুক্তি বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপভাগ হয়ে আক্রমন চালাবে। পূর্ব দিকে নদী থাকায় তিন দিক থেকে আক্রমনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সুবেদার মজিদ ও বি.এল.এফ এর কমান্ডার আব্দুল লতিফ ভাইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমরা ১০ই ডিসেম্বর দক্ষিণ দিক দিয়ে এসে আলিয়াবাদ গ্রামের তায়েব আলী বেপারী বাড়ীতে সমাবেত হয়ে অন্যান্য গ্রুপের সাথে মাঝিকাড়াড় দিক থেকে আক্রমন চালাই। উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে বিভিন্ন গ্রুপ আক্রমন করে অগ্রসর হয়ে পাক হানাদার বাহিনী কে থানা ও ডাকবাংলা মুক্ত করে হাইস্কুলের দুতলায় ব্যাংকারে পাঠানো হয়। স্কুলের ছাদে ও দু'তলায় পাকহানাদাররা শক্ত ঘাটি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১২ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর সাথে আমাদের প্রচন্ড যুদ্ধ চলে। আমরা মাঝিকাড়া খালের দক্ষিণ পাড় থেকে প্রচন্ড আক্রমন চালাই। আমার অবস্থান ছিল খাদ্য গুদামের পাশে। ঐদিন বিকাল ৪টায় যুদ্ধের গতি কমে আসলে আমার কমান্ডার আলম ভাই আমাকে পজিশন থেকে উঠিয়ে বলে চল আমরা পশ্চিম দিক দিয়ে

ঘুরে নবীনগর যাই। আমরা মাঝিকাড়া গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় করিম চেয়ারম্যানের বাড়ীতে এসে শহীদ সালামকে মৃতবস্থায় দেখতে পাই এই যুদ্ধে সেই প্রথম শহীদ। তার সহযোদ্ধা আমাদেরকে জানালো সালাম চেয়ারে বসে এল.এম.জি. চালাতে ছিল এক পর্যায়ে জানালা ভেদ করে একটি গুলি এসে তার নিম্মাংশে লাগে এবং সে মৃতুর কোলে ঢলে পরে। আমরা তখন মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়ার জন্য আলিয়াবাদ খবর দিয়ে কান্দিঘুরে নবীনগের যাই। তখন নবীনগর স্কুল ক্যাম্প ছাড়া সব এলাকা মুক্ত। আমার যাওয়ার পথে উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে দেখা পাই জিকরুল ভাইয়ের টু.আই.সি শাহজাহান, আদালত প্রাঙ্গনে বাঞ্ছারামপুর বি.এল.এল এর কমান্ডার মনিরুল হক ভেলানগরের মুখলেছ ভাই সিইওর বাংলায় সুবেদার মজিদ ভাই ও কামালউদ্দিন সুধন মিয়াকে, বড় বাজারে যাওয়ার পথে মিজান ভাই, জামিল, মনসুর ভাই, থানার গেইটে আলী আজম গ্রুপের ইকবালসহ অনেকে সাথে দেখা হয়। ১৩ ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। স্যারেন্ডারে সময় প্রার্থনা করে। ১৪ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় একজন ক্যাপ্টেন ও মিলিশিয়া সহ ১২ জন পাক হানাদার বাহনী বি.এস.এফ ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্বসর্ম্পণ করেন পরে তাদেরকে বি.এস.এফ নিয়ে যায়। এর পর সমগ্র নবীনগর থানা সদর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে যায়। আমরা মাছবাজারে দু'তলায় একটি পরিত্যাক্ত বিল্ডিং এ, শহীদুল্লাহ ও লালুভাইয়ের গ্রুপ জমিদার বাড়ীতে এবং আলী আজম গ্রুপ থানার ভিতর ক্যাম্প করে। ১৯৭১ সনে ২০শে জানুযায়ী আমরা মুজিব বাহিনীর সদস্যরা জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজীবের নিকট ঢাকা এসে স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাধীন বাংলায় লেখাপড়ায় ফিরে যাই। জয় বাংলা ।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মাইনুল হোসেন

১৯৬৬সালের ৬ দফা আন্দোলনের আমি একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম, হাজার ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের আমি একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম, এ সময় আমি আমার ইউনিয়নে আমি ছাত্রলীগ গঠন করি এবং সেটার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম আমি। সত্তরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী সক্রিয় কর্মী ছিলাম, হাজার ৯৭১ সালের ৭ ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৮ মিনিটের ভাষণ আমি উদ্বুদ্ধ হয়ে পর্যায়ক্রমে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ভারতে যাই। ভারতে যাওয়ার পরে আমি ভারতের বাগমারা ক্যান্টনমেন্ট ক্যাম্পে এক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্রের জন্য মেলাঘর ক্যাম্পে আমরা অপেক্ষা করছিলাম, সম্ভবত সাতদিন পরে আমরা অস্ত্র পেয়ে গেলাম, অস্ত্র দেয়ার পর আমাদেরকে বর্ডারে সম্মুখ যুদ্ধের ট্রেনিং হিসেবে আমাদেরকে ব্যাংকারে ভেতরে প্রশিক্ষণ দিল আরো ১৫ দিনের। আমরা কমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর পাশ দিয়ে কুমিল্লা তে প্রবেশ করি। আমরা ছিলাম গেরিলা আমাদের বেসিক ট্রেনিং ছিল হিট অ্যান্ড রান, আঘাত করো এবং তোমরা চালিয়ে যাও। নিজে বাঁচতে হবে আবার আঘাত করতে হবে নিজে না বাচলে আঘাত করা যাবে না। আমরা এই ফরমুলা নিয়েই চলতে ছিলাম যেহেতু আমাদের অস্ত্র পর্যাপ্ত ছিল না। আমাদের কাছে অস্ত্রের মধ্য ছিল থার্টিসিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড,থ্রী নট থ্রী রাইফেল, স্টেনগান, এসএলআর,এলএমজি, টুইঞ্চ মর্টার, ইভেন ব্রিজ উড়ানোর জন্য যে ডিনামাইট সেই এক্সপ্লোসিভ এর ট্রেনিং ও আমাদের হয়েছে এবং তা আমাদের কাছে ছিল । আমার অস্ত্র ছিল এসএলআর। আমরা ছোট ছোট যুদ্ধ করতে করতে

অক্টোবরের ২৮ ও ২৯ তারিখে দুই দিন দুই রাত আমরা মুরাদনগর ও দেবিদ্দার থানার গোমতী নদীর উপরে একটা ব্রীজ ছিল আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সেটাকে ভেঙে ফেলেছি। যেহেতু ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট অনেক সুন্দর ছিল পাকিস্তানিদের তাই আমরা এই ব্রিজটা ভেঙে তাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করেছি। এজন্য আমরা দুই দিন দুই রাত ধরে যুদ্ধ করেছি, রাস্তার দুই পাশে পলাতক অবস্থায় থেকে আমরা যুদ্ধ করেছি। এই যুদ্ধে কতজন পাকিস্তানি আর্মি মারা গেছে তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার পাশের দুই জন মুক্তিযোদ্ধা মারা গিয়েছিল। একজন আমার বন্ধু আবুল বাশার আর একজন ছিল রমিজ উদ্দিন সে আর্মিতে ছিল। আমার বন্ধুকে সরানোর জন্য আমি কাধে নিয়ে উঠেছি তখন আমার পাশে থেকে একজন বলল আরে তোর পায়ে গুলি লেগেছে। তখন আমি লাশটাকে নিচে রেখে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার পা থেকে অনবরত রক্ত পরছে। গুলিটা প্রায় ঢুকে গেছে সামান্য একটু বাহিরে ছিল, আমার পাশের একজন মুক্তিযোদ্ধা আমার পা থেকে গুলিটা বের করতে সহযোগিতা করলো, গুলি বের করার পরে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল তোমার কাছে রুমাল আছে কিনা, আমি বললাম আছে, তখন সে পাশ থেকে দুবলা ঘাস নিয়ে যাবি আমার ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিল এবং রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। বাধার পরে সেখান থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে গ্রামের এক পল্লী চিকিৎসকের কাছে যাই তার নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ, গিয়ে তাকে বললাম দাদা এই অবস্থা আমি তো গুলি খাইছি এই জায়গাটা দেখুন, তিনি বললেন আমাদের কাছে তেমন কোন ওষুধ নাই, আমি বললাম দাদা আপনার কাছে যা আছে তাই দিয়ে দেন, তিনি ক্ষত স্থান দেখে বললেন এটা কি দিয়েছেন। আমি বললাম দূবলাঘাস চিবিয়ে এখানে লাগিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন এতেই সেরে যাবে। আমি বললাম না দাদা কিছু ওষুধ দেন তখন তিনি আমাকে কয়েক প্রকার ওষুধ দিলেন। ওষুধগুলো খাওয়ার পরে আস্তে আস্তে আমার ক্ষতটা শুকিয়ে আসছে, তখন আমি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলাম। এভাবে আমরা যুদ্ধের মাঝে দিন পার করতে থাকলাম, ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের করে সেই উল্লাসে আমরা নিজেরা কাতে বিদ্যমান থাকলাম। বঙ্গবন্ধু দেশে আসলেন আমরা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলাম।



যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল মান্নান

১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ পাকিস্তানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চালাতে থাকেন দমন ও নিপীড়ন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে মহামূল্যবান ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশনা দিলেন। আমাদের গ্রামে বছের মন্ডলের বাড়ীতে একটি ফোর ব্যান্ড রেডিও ছিল। আইয়ুব ও ইয়াহিয়া বিরোধী ৬ দফা ও ১১ দফা দাবীর পক্ষে গড়ে ওঠা দুর্বার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত আমরা এলাকার সিংহভাগ ছাত্র প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত বিবিসি, ভয়েজ অব আমেরিকা, আকাশ বানী কলিকাতা, চীন ইত্যাদি চ্যানেলের সংবাদ শুনতাম।

মার্চের ২৫ তারিখে মধ্য রাতে বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর। শুরু করল হত্যাযজ্ঞ ও নির্মম নির্যাতন। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ইপিআর এর ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হল সমগ্র বাংলাদেশে। চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামীলীগ

নেতা আব্দুল হান্নান ও আবুল কাশেম সন্দীপ বারবার পাঠ করতে থাকেন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এছাড়াও আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীগণ হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেশব্যাপী প্রেরণ করেন। ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে অস্ত্র বের করে শুরু করেন প্রতিরোধ যুদ্ধ। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা মুখে মুখে সংবাদ শুনলাম ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ঢাকা থেকে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে টাঙ্গাইল হয়ে মধুপুর পার হয়ে দিঘপাইত পর্যন্ত এসেছে। কিন্ত খাওয়ার অভাবে সবাই ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমরা এক বস্তা রেশনের আটা নিয়ে দু'তিন বাড়ীতে রুটি বানাতে দিলাম। সকালেই আমরা ১০/১২ জন ছাত্র রুটি ও অবশিষ্ট আটা নিয়ে রওয়ানা দিলাম। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল এসব উনাদের খাওয়াব এবং প্রয়োজনে ঐ যুদ্ধে আমরাও অংশগ্রহণ করব। দিগপাইত পৌঁছার আধা মাইল বাকি থাকতেই দেখা গেল এলাকাটি জনমানব শূন্য। লক্ষ্য করলাম টিনের ঘরগুলোতে বড় বড় ছিদ্র। আমরা রাস্তার পাশেই একটি টিউবওয়েল দেখে ওখানেই বসে পড়লাম। দেখলাম একজন কৃষক একটি গরু নিয়ে যাচ্ছে। আমরা উনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে কি কোন যুদ্ধ হচ্ছে? উনি বললেন এখন আর কোন যুদ্ধ হয় না। শুধুমাত্র পাক সৈন্যরা গাড়ী নিয়ে প্রতিদিন সিএনবি রাস্তা দিয়ে এদিক ওদিক যাতায়াত করেন। তখন আমাদেরও ক্ষুধা পেয়েছিল। তাই আমরা রুটি ও টিউবওয়েলের পানি খেয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলাম। এরপর যখন মানুষজনের দেখা পেলাম তখন অবশিষ্ট রুটি ও আটা তাঁদের দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। পূর্বের মতই প্রতিদিন সংবাদ শুনি ঐ রেডিওতে।

মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করার মৌখিক সংবাদের ভিত্তিতে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা ১৫ জন ছাত্র রাতের আঁধারে পালিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ গেলাম। সেখানে দু'দিন একটি মাটির মসজিদে থাকার পর রিক্রুট সংক্রান্ত কোন প্রকার সংবাদ না পেয়ে বয়োজৈষ্ঠ্যরা বাড়ী ফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্ত আমার ছোট ও দশম শ্রেণীর ছাত্র আমার পাশের বাড়ীর আলী হায়দার রয়ে গেল। আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। বাড়ী ফেরার কয়েকদিন পর মে মাসের ১৬ তারিখ গভীর রাত্রে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র কাজিম উদ্দিন ও দশম শ্রেণীর ছাত্র রেজাউল করিম (দুলাল)কে সাথে নিয়ে পালিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। তখন ছোট

ছোট নদীগুলোতে অল্প পানি ছিল যা পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যেত। ১৭ তারিখ দুপুরের পর পরই মহেন্দ্রগঞ্জ পৌঁছে গেলাম। একটু রেষ্ট নিয়ে সামান্য কিছু খাওয়ার পর পাহাড়ের উপর ডাক বাংলায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এর জন্য রিক্রুট করা হচ্ছে। তিনটি ইংরেজী ফর্মে পৃথক পৃথকভাবে নাম ঠিকানা লিখে আমাদের হাতে দিয়ে এ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামার পরই পূর্ব পাশের পাহাড়ের ঢালে অস্ত্র হাতে পাহাড়ারত ভারতীয় আর্মিদের দেখিয়ে তাদের নিকট রিপোর্ট করতে বলেন। সে অনুযায়ী গিয়ে তাদের নিকট রিপোর্ট করলাম। ফর্ম তিনটি উনাদের নিকট দেওয়ার সাথে সাথেই ঐ পাহাড়ের উপর মহেন্দ্রগঞ্জ অস্থায়ী ক্যাম্পে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। আমরাও যথারীতি ক্যাম্পে গিয়ে রিপোর্ট করলাম ভারতীয় সৈন্যদের নিকট। তখন সন্ধ্যা, অন্যান্য সকলের সাথে আমাদেরও খাবার দিলেন। বনপাতার ছাউনীযুক্ত অত্যন্ত নীচু বেড়াবিহীন ঘরে আমার ও কাজিমের সাথে নেওয়া মাত্র দু'টি চাদরের একটি বিছিয়ে ও অন্যটি তিনজনের গায়েব উপর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ফজরের নামাজের সময় বাঁশি বাজালেন ও সকলকে ফল-ইন করালেন। এক মগ করে চা ও একটি করে পরাটা খেতে দিলেন। খাবার খাওয়ার পর আমাদের একটি আর্মি ট্রাকে উঠালেন। কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়ী থেকে নামিয়ে মেইন রাস্তা ছেড়ে ধান খেতের আইল দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় দুপুরের পর পূরাখাসিয়া পৌঁছালাম। রাস্তার ধারেই জঙ্গলের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে নিয়ে গেলেন। ড্রামে রাখা খিচুড়ি এক মগ করে প্লেটে দেওয়া হল। খাওয়ার পর পূনরায় আমাদের ঐ ট্রাকে উঠিয়ে ১৫/২০ কিলোমিটার ভেতরে সিংগুয়াপাড়া অস্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। অত্যন্ত নীচু ও ছোট বনপাতার ছাউনী ও বেড়াযুক্ত একটি ঘরে অবস্থানরত পুলিশের হাবিলদার আয়েন উদ্দিন ক্যাম্প ইনচার্জ আমাদের দায়িত্ব বুঝে নিলেন। পাহাড়ের উপর উনার ঘরের দক্ষিণ পাশে অত্যন্ত ছোট একটি ফাঁকা মাঠের পরই অবস্থিত বনপাতার ছাউনীযুক্ত বেড়াবিহীন রান্নাঘরের পশ্চিম পাশেই পূর্ব-পশ্চিমে ২৫/৩০ হাত লম্বা নবনির্মিত টিনের ছাপরাঘর দেখলাম। পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর পাশে বনপাতার সাহায্যে বেড়া দেওয়ার কাজ তখনও চলছিল। আমরাও হাত লাগিয়ে দ্রুত বেড়ার কাজ শেষ করলাম। একই সাথে বিছানার জন্য বেশকিছু বনপাতা কেটে আনলাম। ঘরটির দক্ষিণ পাশ খোলা রাখা হয়েছে। সন্মুখেই অবস্থিত ঝরনা দিয়ে সবময় পানি প্রবাহিত হয়। ঐ পানি খাওয়াদাওয়া ও গোছলসহ সকল কাজে

ব্যবহার হত। বিকল্প কোন পানি এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ছোট্ট ঘরটিতে ওস্তাদ আয়েন উদ্দিন থাকতেন এবং তা ষ্টোররুম হিসেবে ব্যবহৃত হত। ঐ ঘরে একটা হারিকেন এবং দক্ষিণ দিকে খোলা আমাদের থাকার টিনের ছাপরাঘরেও একটি হারিকেন বাতি ঝুলিয়ে রাখা হত। সপ্তাহে একদিন প্রতিজনের জন্য এক টুকরা করে মাংসসহ রান্না করা তরকারী ভারতের আর্মিরা গাড়ীতে এসে দিয়ে যেতেন। এছাড়া প্রতিদিন শুধুমাত্র চাল ও ডাল নিজেরাই রান্না করে খেতাম। প্রতিদিনের রান্নার জন্য লাকড়ী বন জঙ্গলের ভেতর থেকে সংগ্রহ করতাম আমরা। একঘেয়েমী ডাল-ভাতের পরিবর্তনের জন্য জঙ্গল থেকে কলার মোচা, পাট শাক ও কাঁচা মরিচ সংগ্রহ করে আনতাম মাঝে মধ্যেই। সেদিন মনে হত অনেক দিন পর মায়ের হাতের রান্না করা খাবার পেট পুরে খেলাম। নিরব ঘাতক চিনাযোগ আর লজ্জাবতী গাছের কাঁটার সাথে ছিল আমাদের নিত্যদিনের বসবাস। ট্রেনিং এর সময় এসব কষ্টের প্রতি যেন দৃষ্টি দেওয়া বা খেয়াল করার কোন সুযোগই হত না। ওখানে যাওয়ার কয়েকদিন পর লক্ষ্য করলাম আমাদের পূর্বে যোগদানকৃত ও বয়োজৈষ্ঠ্য একজন সহযোগী আমাদের থাকার ঘরের সন্মুখে প্রবাহিত ঝরনার পাড় দিয়ে এদিক ওদিক পায়চারি করছেন খালি গায়ে গামছা পরিহিত অবস্থায়। বাম হাত দিয়ে পড়নের গামছাটি উচু করে ধরে রেখেছেন এমনভাবে, যেভাবে ধরে রাখে ছোট ছেলেদের মুসলমানী করানোর পর। আমি তখনও বুঝে উঠতে পারিনি যে প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে গিয়ে চিনাযোগ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর তার পরিহিত একমাত্র লুঙ্গিটি রক্তে ভিজে একাকার হয়ে গেছে এবং ঐ লুঙ্গি ঝরনার পানিতে ধূইয়ে শুকিয়ে দিয়ে একজনের নিকট থেকে গামছা নিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছেন। আর যেন গামছাটিতে কোন রক্তের দাগ না লাগে এজন্যই এমন শতর্কতা অবলম্বন করছেন। ক্ষতস্থান থেকে অনর্গল প্রবাহিত হচ্ছিল রক্ত। এর কিছুদিন পরেই রাতে হঠাৎই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অনুভব করছিলাম ডান পায়ের আঙ্গুলের নীচে ও গোড়ায় প্রচন্ড চুলকানী। প্রথমে পায়ের আঙ্গুল নাড়িয়ে চুলকানি উপসমের চেষ্টা করলাম কিন্ত কোন কাজ হচ্ছিল না। তখন ভাবলাম কোন ময়লা আটকে আছে তাই বাম হাত দিয়ে পরিস্কার করতে গিয়ে অত্যন্ত নরম ও মোটা একটা কিছু আঁচ করলাম। সাথে সাথেই হাত দিয়ে জোরে ছাড়ানোর চেষ্টা করার সাথেই নরম ঐ বস্তুটি ছেড়ে গেল কিন্ত চুলকানিটা আরও বেড়ে গেল। তখন আরও বেশী করে চুলকানির জন্য যখন হাত বুলাই তখন পিচ্ছিল একটি কিছু অনুভূত হল। ভয়ে আমি দ্রুত ওদের ডেকে উঠালাম ও

ঘটনা বললাম। সাথে সাথেই ঘরের পারের সাথে ঝুলন্ত হারিকেন নামিয়ে নিয়ে আসল। দেখলাম বিছানো চাদরটা রক্তে ভিজে একাকার হয়ে গেছে। এক এক করে সবাই ঘুম থেকে জাগলেন গভীর রাতে। কোলাহল শুনে ক্যাম্প ইনচার্জ ওস্তাদ আয়েন উদ্দিন তার রুমের হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। আমাদের মধ্য থেকেই একজন কোন একটি গাছ বা ঘাসের পাতা এনে পানি দিয়ে পরিস্কার করে মুখে দিয়ে দাঁতে চিবিয়ে আমার পায়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। আর তখনই রক্ত ঝরা একদম বন্ধ হয়ে গেল। ওখানে সবাই বলাবলি করছিলেন চিনাযোগ কামড়ালে ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, প্রতিষেধক হিসেবে দাঁতে চিবানো এ গাছ ক্ষতস্থানে না লাগানো পর্যন্ত। উপজাতি লোকেদের নিকট থেকেই এ ব্যবস্থা জেনেছেন মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ। আমরা ৩০/৩৫ জন তুরা পাহাড়ে উচ্চতর ট্রেনিং এর জন্য অপেক্ষমান ছিলাম। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ হাবিলদার আয়েন উদ্দিন আমাদের হালকা ট্রেনিং করাতেন বুলেট ছাড়া রাইফেল দিয়ে। আবার আমাদের মধে যারা পূর্বেই এসেছেন তারা কয়েকজনকে একত্র করে অস্ত্র পরিচালনা দেখাতেন ও মুখে বলতেন। এছাড়াও প্রতিদিন সকালে দু'জন করে বিএসএফ সদস্য আসতেন এবং তিন কিলোমিটার করে রান করাতেন পাহাড়ের রাস্তায়।

উল্লেখ্য যে, তুরা পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রথম বেস ও প্রথম উইং এর ট্রেনিং চলমান থাকার কারণেই সিংগুয়াপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত আস্থায়ী ও অপেক্ষমান ক্যাম্পেই অবস্থান করে আমাদের হালকা ট্রেনিং করতে হয়। অবশেষে তুরা ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রথম বেস এর প্রথম উইং এর ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর ১৫ জুন তারিখ হতে ৪ দিনের জঙ্গল ট্রেনিংসহ মোট ২৮ দিন ট্রেনিং করানো হয়। এর মধ্যে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয় ৪ দিনের জঙ্গল ট্রেনিং। উইং কমান্ডার ছিলেন মাসুম খান ও ডেপুটি উইং কমান্ডার ছিলেন রেজাউল করিম। ট্রেনিং করিয়েছেন সুবেদার পিএন দেব (বাঙ্গালী), পাঞ্জাবী কেএল দাস এবং একজন শিখ সৈন্য ছিলেন। রকেট লান্সার, টু-ইঞ্চ মোয়াটার, এলএমজি, এসএলআর, রাইফেল, ও গ্রেনেড চার্জ করার ট্রেনিং দেওয়া হয়। ট্রেনিং শেষে ১২ তারিখে কসম প্যারেড করার পর আমাদের মাইনাকা চর নিয়ে যাওয়া হয়। টাঙ্গাইল থেকে কাদের সিদ্দিকী উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেশ কিছু সংখ্যক মুক্তিবাহিনী, অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানোর জন্য হাফিজ নামক এক গাইডকে

ভারতে পাঠান। এসবের সমন্বয়ক হিসেবে কর্মরত সুবেদার হারিজ সাবের নিকট কাদের সিদ্দিকীর বার্তা পৌঁছান। তাই ১২ তারিখেই কিছু অস্ত্র, গোলাবারুদ, চিনি ও দুধবার্লিসহ ৪৯ জন মুক্তিবাহিনীর সদস্য তিনটি নৌকাযোগে টাঙ্গাইল যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়। মাইনকাচর বাজারের দক্ষিণে ছোট্ট একটি নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত একটি চরে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে, অনেক রাজাকার সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা সবসময় নদীর পাড়ে পাহাড়া দেয়। তাই কোন অবস্থাতেই নৌকা নদীপাড়ে ভিরানো যাবে না। এছাড়াও বাহাদুরাবাদ ও বালাসীঘাট পাক বাহিনীর ঘাঁটি থেকে রাতে খুব পাওয়ারফুল সার্চলাইট নদীর মাঝে ধরে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে। তাই অতি সতর্কতার সাথে ঘাট দু'টি অতিক্রম করতে হবে। খাওয়ার পর পরই আমরা তিনটি নৌকাযোগে যাত্রা শুরু করলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই একটি নৌকার এক ছেলে ডাইরীয়ায় আক্রান্ত হয় এবং ক্রমেই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে ওর চিকিৎসার প্রয়োজনে ঐ নৌকাটি ভারত ফেরত পাঠানো হয়। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নদীর একদম মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হতে হতে ঐ বিপজ্জনক ঘাট দু'টির একদম কাছাকাছি পৌঁছার পর হঠাৎই আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার ও হালকা ঝড়োহাওয়ার সময়ই আমরা বিপদজ্জনক স্থানটি অতিক্রম করি। কিন্তু ঝড়ের কবলে পড়ে অন্য নৌকাটি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরের দিন আছরের নামাজের পর কাজিপুর থানার ৮নং চরগিরিশ ইউনিয়নের জোরবাড়ী গ্রামের পূর্বে একটি পাটক্ষেতের মাঝে নৌকা ভিরানো হয়। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম।

আমাদের নিজ এলাকা বিধায় খোঁজ করছিলাম একজন পরিচিত মানুষ। হঠাৎই নজরে আসল একটি ছোট নৌকা নিয়ে আমাদের অবস্থানের ৩০/৪০ গজ উত্তর পাশ দিয়ে বাড়ীর দিকে যাচ্ছে একটি ছেলে। আমি ছেলেটিকে ডেকে নৌকাসহ কাছে নিয়ে আসলাম। ছেলেটি আমার পরিচিত ও বিশ্বস্ত। ওকে বললাম আমরা নৌকায় বেশ কয়েকজন লোক আছি, আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। তুমি বাবাকে কিছু বলবে না, মা'কে চুপিচুপি বলবে আমাদের জন্য গাছ থেকে যেন পেয়ারা পেড়ে দেয়, তার সাথে কাঠাল ও মুড়ি যেন দেয়। দ্রুতই গিয়ে মা'কে বলার সাথে সাথেই এক ঝাপি পেয়ারা, দু'টি কাঠাল ও এক টিন মুড়ি দেয়। ছেলেটি এসব নিয়ে আসার সাথে সাথেই আমরা সকলেই মিলেমিশে খেলাম। ছেলেটি চলে

যাওয়ার পর পরই আমরা পাশের গ্রাম গুয়াখড়া গিয়ে গাজী সরকার ও রিয়াজ উদ্দিন মেম্বারের বাড়ীর ঘাটে নৌকা ভিড়ালাম। রিয়াজ মেম্বারের ছেলে সেকশন কমান্ডার আমজাদকে নামিয়ে দিয়ে কিছু পূর্বে গিয়ে আমরা অবস্থান করতে থাকলাম। অতি দ্রুত খাবার রান্না হয়ে গেল। আমাদের ডেকে নৌকা বাড়ীর ঘাঁটে নিয়ে আসলেন এবং সকলকে নামতে নির্দেশ দিলেন। আমরা নৌকা থেকে নামার পর উদ্ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক হাটাহাটি করতে থাকলাম। মনে হচ্ছিল কতদিন পর যেন মাটিতে পা রাখলাম। খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু করে রান্না করে খাওয়ালেন। মনে হচ্ছিল দু'মাস পর অনেক তৃপ্তি সহকারে আমরা খাবার খেলাম। খাওয়ার পর পরই সকলেই নৌকায় উঠে আত্মগোপনে গেলাম। এরপর ফজরের নামাজের সময় আমরা যমুনা নদীর মধ্য দিয়ে পাক বাহিনীর সৈন্যদের ঘাঁটি জগন্নাথগঞ্জ ঘাট অতিক্রম করলাম। এরপর নদীর পূর্ব পাড়ে নৌকা ভিড়িয়ে আমাদের সাথে থাকা গাইড হাফিজকে নামিয়ে দিয়ে ভুঞাপুর দ্রুত গিয়ে আমাদের সংবাদ জানানোর জন্য বলি। নদীর শ্রোত প্রবল থাকার কারণে পায়ে হেঁটে হাফিজের ভুঞাপুর পৌঁছানোর পূর্বেই আমরা পৌঁছে যাই। নদী থেকে পাড়ে উঠে পাট ক্ষেতের পাশ দিয়ে ভূঞাপুরের উত্তর পশ্চিম পাশের রাস্তার অত্যন্ত কাছাকাছি যাওয়া মাত্র ঐ রাস্তায় পাহাড়ারত কালো প্যান্ট ও ফুল হাতা শার্ট পরিহিত কয়েকজন আমাদের হ্যান্ডস আপ করার জন্য চিৎকার করতে থাকেন। রাজাকার ভেবে সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরে আমাদের কমান্ডার অস্ত্র হাতে পজিশন নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। নৌকার ছইয়ের এপাশে ওপাশে যে যার মত পজিশন নেই এবং আমরাও তাদের হ্যান্ডস আপ করার জন্য বলতে থাকি। এমনই উৎকণ্ঠার মধ্যেই তাদের নিকট পৌঁছে গেলেন গাইড হাফিজ। ওর নিকট আমাদের সংবাদ জানার পর পরই তারা অস্ত্র নামিয়ে আমাদের ওদের কাছে যাওয়ার ইশারা করলেন। আমরা যাওয়ার পর এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন অনেকটা সময় পর্যন্ত। আমাদের নিয়ে গেলেন ছোট একটি বাড়িতে অবস্থিত সেকশন কমান্ডার হাকিম ভাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। ওখানে দুপুরের খাবার খাওয়ার পর রেষ্ট করি।

এরপর বিকেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় এক দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে গোবিন্দাসী ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে। ওখানেই আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা

করা হয়। এর দক্ষিণ পাশ সংলগ্ন গোবিন্দাসী বাজার। আর ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের পূর্ব পাশে একটি পুকুর এবং এর পূর্ব পাশেই গোবিন্দাসী উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত। আমাদেরসহ সকল মুক্তিবাহিনীর থাকা খাওয়ার জন্য অনেকগুলো স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত ছিল। আমাদের কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হল। জুলাই মাসের ১৪ তারিখে ওখানে অবস্থানের পর হতে প্রতিদিন আমরা নির্দিষ্ট কয়েকজন ওদের রাইফেল ট্রেনিংসহ বিভিন্ন পজিশন সম্পর্কে ধারণা দেই। ইতিমধ্যে অর্থাৎ আগষ্ট মাসের ০৭ তারিখে ভূঞাপুরের নিকটস্থ মাটিকাটার সিরাজকান্দি চরে দু'টি বড় লঞ্চসহ বিশাল আকৃতির একটি কার্গো স্টীমার এসে ভিড়ে। আমাদের সাথে ছিল আমজাদ ও মজিবর। কমন্ডারের নির্দেশে মজিবর জালি নিয়ে যায় মাছ ধরতে, আর আমজাদ যায় ঘাস কাটতে।পাকিস্তানি সৈন্যদের নৌকা দিয়ে স্টীমার থেকে পাড়ে নেমে হাটাহাটি করতে দেখে। ওরা আমজাদ ও মজিবরের নিকট মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান জানতে চায়। ওরা বলেছেন আমরা চিনি না, আমরা দেখি নাই ইত্যাদি। কথাবার্তার এক পর্যায়ে পাক সেনারা আমজাদকে উর্দু ভাষায় জিজ্ঞেস করেন এখানে মুরগী পাওয়া যাবে না?আমজাদ বলে জরুর মিলেগা। তখন আমজাদকে ১০০ টাকা দেয়। পরের দিন সকালেই মুরগী এনে দিয়ে ঘাস কাটার কথা বলে মজিবরকে সাথে নিয়ে ক্যাম্পে চলে যায়। পরের দিন আমজাদ ঘাস কেটে দুপুরের সময় পাক সেনাদের নিকট গিয়ে কথা বলতে থাকে। এদিকে মজিবরও জালি আর খালই নিয়ে ভিজা কাপড়ে ওখানে যায়। দুপুরের দিকে খাবারের সময় ইচ্ছা করেই পাকিস্তানি বাহিনীর নিকট রেকি করার প্ল্যান নিয়ে যায়। কথাবার্তার এক পর্যায়ে খাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে খাওয়ার জন্য কার্গো স্টীমারে উঠে। মুরগীর মাংস ও ভুনা খিচুড়ি খাওয়ার পর ঘুরে ঘুরে দেখে সবকিছু নিশ্চিত হয়। কার্গো স্টীমারে ছিল ত্রিফল দিয়ে ঢাকা বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও দুটি লঞ্চে ছিল ৪২ জন পাক হানাদার বাহিনীর সৈন্য। ক্যাম্পে ফেরার সময় পরের দিন খুব সকালে দুধ এনে দেওয়ার জন্য ১০০ টাকা দেয় আমজাদকে এবং এটাও বলেন যে, আমরা আগামী দিনই দুপুরে খাবার খাওয়ার পর চলে যাব। আমরা বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ঐদিন ১০ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে দুপুরের পর আমরা হাবীব কমন্ডারের নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জন মুক্তিবাহিনীর সদস্য তাদের উপর আক্রমণ করি।আমাদের সাথে ছিলেন কোম্পানি কমান্ডার লুৎফর রহমান (নোদা), ভাটপিয়ার হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুল বাছেত, আমি

মান্নান, ইপিআর হাবিলদার ওলি ভাই, আমজাদ, আক্তার, মজিবর, আলী হায়দার, কাজিম, দুলালসহ আরও অনেকেই। মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণের ফলে হালকা প্রতিরোধ গড়ার একটু পরই ভয়ে পালিয়ে যায় ৪২ জন দুর্ধর্ষ পাক বাহিনীর সৈন্যরা। তখন সন্ধ্যা, একটি লঞ্চ গেল সিরাজগঞ্জের দিকে আর একটি লঞ্চ গেল নগরবাড়ীর দিকে। নগরবাড়ীর দিকে যেটা যাচ্ছিল আমরা সেটির উপর আক্রমণ করি। পাক সেনারা পালিয়ে যাওয়ার পর একজন লোক নদীর ভেতর থেকে চিৎকার করে বলছিলেন আমি বাঙ্গালী গো আমাকে বাঁচান। তখন কোম্পানি কমান্ডার লুৎফর রহমান (নোদা) এলএমজি হাতে আমজাদ ও অন্য একজনকে নিয়ে ছোট একটি নৌকা নিয়ে উনাকে এনে পজিশনরত আমাদের সন্মুখেই মাটিতে বসালেন। উনার হাতে ছিল একটি বাতের চেইন, গায়ে পাঞ্জাবী, পড়নে লুঙ্গী, মূখে পাকা দাঁড়ি এবং বেটে মানুষ। সে স্টীমারের স্বারেং এবং বাড়ী চট্টগ্রাম। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে বললেন বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উত্তর বঙ্গ বর্ডার এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাদের নিকট গোয়েন্দা সংস্থার খবর ছিল যে, আগামী ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিবাহিনী ব্যপকভাবে আক্রমণ চালাবে। তাই চট্টগ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উত্তর বঙ্গ চেক দেওয়ার জন্য ৪২ জন পাক সৈন্য পাহাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং টিক্কা খান সরাসরি এটার দেখভাল করছিলেন। একারণেই আপনাদের আক্রমণের সাথে সাথেই টিক্কা খানকে জঙ্গী বিমান পাঠানোর অনুরোধ করেন। এর জবাবে টিক্কা খান বলেন জঙ্গী বিমানের ফুয়েল নেই, নেভী পাঠাচ্ছি। তখন সিদ্ধান্ত হল সমুদয় গোলাবারুদ নামিয়ে আমরা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব। গোলাবারুদ নামানোর জন্য আমাদের সাথে যোগ দেয় স্বেচ্ছাসেবক ও এলাকার লোকজন ১৩০/১৩৫ টি ছোট নৌকা নিয়ে। কার্গো স্টীমার থেকে গোলাবারুদ নামানো শুরু হয়। সেখানে ছিল ৩০ সের ওজনের কামানের বোমসহ টু-ইঞ্চ মোয়াটার, রকেট লান্সার ইত্যাদি ভারী অস্ত্রের গোলাবারুদ। গোলাবারুদ রাখা হয় ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, বাঁশঝার, কলার ছোপ ইত্যাদি স্থানে। একমাত্র টু-ইঞ্চ মোয়াটারের বোম বা সেল ব্যতীত আর কোন গোলাবারুদ ব্যবহারের অস্ত্র আমাদের হাতে ছিল না। আর তখন পর্যন্ত যে পরিমাণ গোলাবারুদ নামানো হয়েছে তা নিরাপদে ভারত পাঠানো বা বাংলাদেশেও নিরাপদে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না। তাই সিদ্ধান্ত হল এসব আর নামানোর প্রয়োজন নেই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে। নেভাল ফোর্স আসার সাথে সাথেই তারা

এসব দখলে নিয়ে নেবে। তাই আর সময় ক্ষেপণ না করে কোম্পানি কমান্ডার লুৎফর রহমান (নোদা) ভাই ছোট একটি নৌকায় এলএমজিসহ দু'জনকে নিয়ে স্টীমারের কাছে গেলেন। ওদের রেখে একাই উঠালেন স্টীমারে। পেট্রোলের ড্রাম খুলে কিছু কাপড়-চোপড়ে আগুন লাগিয়ে ছুড়ে মারলেন পেট্রোলের দিকে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে পেট্রোল এবং ফুটতে থাকে গোলাবারুদ বিকট শব্দে। লুৎফর ভাই নৌকা না উঠে পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে সাতরিয়ে পারে ওঠেন। অগ্নি স্ফুলিংঙ্গের মত গোলাবারুদ এসে পড়তে থাকে আমাদের আগে-পিছে ও ডানে-বামে। আমরা নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য পানিতে ভরা ধানক্ষেত, পাটক্ষেতসহ বিভিন্ন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য দৌড়াতে থাকি।এটারই নাম টাঙ্গাইলে ভূঞাপুরের নিকটস্থ সিরাজকান্দি চরের ভয়াবহ স্টীমার অপারেশন। ওদের এর চেয়ে বড় কোন ক্ষতি ৭১এ বাংলাদেশের আর কোথাও হয়নি। ওখান থেকে একটা স্কুল ঘরে গিয়ে আমরা রাত্রি যাপন করলাম। ভোর হতে না হতেই পাকিস্তানি সৈন্যরা নদীর পারে উঠে আসে। পোড়াবাড়ী থেকে মাটিকাটা হয়ে ভূঞাপুরের দিকে উঁচু যে মাটির রাস্তা গেছে তাঁর উপর চারটি এলএমজি ফিট করে গ্রামবাসীদের ধরে এনে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা পাক বাহিনীর কাছাকাছি এসে একটা জঙ্গলের ভেতর অবস্থান নিলাম। অবস্থান নিলেও গ্রামবাসীদের কথা ভেবে কোন প্রকার গুলি করতে পারছিলাম না। বিকালে ওরাও চলে যায় আমরাও আত্মগোপনে চলে যাই।পরের দিন খুব ভোরে আমরা ঐ উঁচু মাটির রাস্তাটি বরাবর পজিশন নেই ২৫/৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা। একটু পরেই ওরা ইয়া আলী, ইয়া আলী বলতে বলতে নদীর দিক থেকে আমাদের দিকে আসতে থাকে। আমাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হন ।এরপর বিকাল ২ টার দিকে স্থল ও বিমান হামলার মুখে পিছু হটে আমরা সন্ধ্যার পর ভূঞাপুর চলে যাই। কাদের সিদ্দিকী আমাদের তাদের সাথে থাকতে বলেন। কিন্তু প্রয়াত কোম্পানি কমান্ডার লুৎফর রহমান নোদা) ভাই বললেন সরিষাবাড়ীতে অনেক রাজাকার সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা মানুষের উপর অনেক অত্যাচার করছে বিধায় আমরা সেখানে যাব। সরিষাবাড়ী, জামালপুর ও বাহাদুরাবাদ ঘাট আমাদের দখলে নেব।

আমরা রাত্রে গিয়ে সরিষাবাড়ীর পশ্চিমে চরের ভেতর এক স্কুল ঘরে পৌঁছাই। পরিকল্পনা মাফিক দুটি নৌকায় দু'টি গ্রুপ পাঠানো হয় অপারেশন স্পটে। একটি বাউসী ব্রীজ উড়িয়ে দেবার জন্য এবং আমাদের পাঠানো হয় কান্দারপাড়া

বাজারে। আমরা এন্টি ট্যাংক মাইন রেল লাইনের স্লিপারের নীচে ফিট করে খাদ্য ও গোলাবারুদ বহনকারী সার্টেল ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। কিন্তু রাতে কোন ট্রেন না আসায় ভোরে মাইন উঠিয় আমরা ক্যাম্পে চলে যাই এবং ওরাও ফেরত আসে। সন্ধ্যার সময় কথা হলো আগামীকালই এ্যাটাক করতে হবে। আমাদের আগষ্ট মাসের ২৬ তারিখে পাঠানো হলো কান্দারপাড়া বাজারের আশপাশে পজিশন নেওয়ার জন্য। একদল গেল সরিষাবাড়ীর আলিয়া মাদ্রাসার রাজাকার ক্যাম্পে এবং অন্য দল বাউসী ব্রিজে। আমরা কান্দারপাড়া বাজার হতে পশ্চিমে রেল লাইনের দিকে মুখ করে পজিশন নিয়ছিলাম।রেল লাইন আর আমাদের মাঝে দূরত্ব ছিল মাত্র ৩০গজ। কোম্পানি কমান্ডার ফজলুর রহমানসহ ৭ জন আমাদের পজিশনের ৩০/৩৫ গজ উত্তরে, এমনই দূরত্বে আমাদের দক্ষিণে বছির ডাক্তারের বাড়ীর পাশে অবস্থান নেয় ৬ জন। আর রেল লাইনের পশ্চিমে সফিউল্লাহ তরফদারের বাড়ীর পেছনে মাটির ও সুউচ্চ ওয়াপদা সড়কে পজিশন নেয় তৎকালীন ইপিআর সদস্য কালুর নেতৃত্বে ৮জন মুক্তিবাহিনীর সদস্য। অবস্থানটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে পাক বাহিনীর সৈন্যরা রেল লাইন এবং ওয়াপদা উভয় রাস্তা ধরেই আসতে পারে। যার মোকাবিলা করার লক্ষ্যেই এমন পজিশন সাজানো হয়েছিল। আমাদের সাথে রাশিয়ান এলএমজি হাতে ছিল আমজাদ। আমরা- ছয়জন তাঁর আধীনেই ছিলাম। আমার ডানে ছিল বেলাল, এরপর ইউনুস, আমজাদ, জামাল ও হাবীব ভাই। পাকিস্তানি সৈন্যরা রেল লাইন দিয়ে যখন আপনাদের সামনাসামনি এসে পড়ে তখন আমজাদ ফায়ার ওপেন করলে তিনজন পাক সেনা রেল লাইনের উপর লুটে পড়ে ছটফট করতে থাকে। বাকীরা রেল লাইনের ঢালে গাছের মধ্যে অবস্থান নিয়ে বুঝার চেষ্টা করছিল, গুলি কোন দিক থেকে আসছে। আমি ও বেলাল গুলি করে দু'জনকে হত্যা করি। তাঁদের নিথর দেহ রেললাইনের ঢাল গড়িয়ে নীচের দিকে আসে। ওরা নিস্তেজ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমার রাইফেলের ম্যাগাজিনের বুলেট শেষ হয়ে যায়। কোমরে বাঁধা গামছায় বুলেট ছিল যা বের করে চার্জারসহ বুলেট রাইফেলের ম্যাগজিনে বসিয়ে প্রেশার দিচ্ছি। সাথে সাথেই পাক বাহিনীর ব্রিটিশ এলএমজির ব্রাশ ফায়ারে আমার ডান হাত ও বেলালের বাম পা ঝাঁজরা হয়ে যায়। হাড় মাংস উড়িয়ে নিয়ে আশপাশে ছড়িয় ছিটিয়ে পড়ে। হাতে শুধুমাত্র একটু চামড়া ও দুটি রগ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আমি যতই হাত উঠানোর চেষ্টা করছি। হাত আর উঠে না। এদিকে বেলাল

চিৎকার দিয়ে পেছন দিকে পড়ে যায়। আমরা দুজন একে অপরের রক্তে একাকার হয়ে গেলাম।এদিকে পাক বাহিনীর সৈন্যদের এলএমজি'র ব্রাশ ফায়ারে আমজাদের রাশিয়ান এলএমজি'র ব্যারেলের অগ্রভাগ ফেটে গুলি মাথার ডান পাশের চামরা উঠিয়ে নিয়ে ডান কান ছিদ্র করে পেছনের দিকে বেরিয়ে বুলেট। ওর ফায়ার বন্ধ দেখে তাকিয়ে দেখলাম কান ও কপালের হাত লাগিয়ে এনে রক্তমাখা হাতটি শুধুমাত্র নিজে নিজেই দেখছেন আবার মুছছেন। ওর এলএমজিতে ফায়ার হচ্ছেনা। তখন সে চিৎকার করে অনর্গল বলতে থাকে আলফা কোম্পানি ডান দিক থেকে এডভান্স, বিটা কোম্পানি বাম দিক থেকে এডভান্স। এদিকে গুরুতর ভাবে আহত বেলাল আস্তে আস্তে মাটিতে গড়িয়ে পূর্ব দিকের ধানের বীজ তলার মধ্যে গেল আর দক্ষিণ পাশে পজিশনরত আর কেউ ছিল না। তখন ভাবলাম আমার আর বেঁচে ফেরা হল না। তাই প্রথমেই কালেমা পড়ে নিলাম। তখন আমার হৃদয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার সাহস সঞ্চারিত হল। কোমরে বাঁধা গামছাটা খুলে বাঁ হাত দিয়ে ঐ রগ আর সামান্য চামড়া মোড়ালাম। দাঁতে কামড় দিয়ে কোনরকমে গিট দিলাম। যেখানে হাড় মাংস কিছুই নেই কিভাবে তা আটকানো যায়। পরে রাইফেলের বেল্টের ভেতর দিয়ে বাঁ হাত প্রবেশ করিয়ে ডান হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে কনুয়ের উপর ভর দিয় ক্রলিং করে পাটক্ষেত পর্যন্ত গেলাম। বৃষ্টির মত বুলেট এসে আমার আমার ডান বাম ও উপর দিয়ে আমাকে অতিক্রম করছে। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মনে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে পাটক্ষেত অতিক্রম করার চেষ্টা করি কিন্তু রাইফেলের ব্যারেলের অগ্রভাগ আটকে যায় পাটগাছের সাথে। বাম হাত দিয়ে রাইফেলের ব্যারেল ছাড়ানোর চেষ্টা করার এক পর্যায়ে আমার ডান হাতের ঝুলন্ত কব্জি বাম হাত থেকে ছুটে গিয়ে পাট গাছের সাথে পেঁচিয়ে যায়। তখন রাইফেলটি কোনরকমে বুকের সাথে ঠেকিয়ে রেখে পাটগাছের সাথে পেছিয়ে যাওয়া হাতটি কোনরকমে ছাড়িয়ে এনে পূনরায় বাম হাত রাইফেল বেল্টের ভেতর প্রবেশ করিয়ে ডান হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে বুকের সাথে চেপে রেখে এ্যাংগেল করে পাটক্ষেত অতিক্রম করি। পানিভর্তি ছোট খালের উত্তর পাড়েই রাইফেল ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ইউনুস। আমি তার নিকট আমার রাইফেলটি দিয়ে পূর্বদিকে কিছুদূর যেতেই চরপাড়ার রাস্তায় বড় একটি শিমুল গাছের গোড়ায় উত্তর দিকে মুখ করে ঠেস দিয়ে বসে পড়ি। তখন আনুমানিক সময় দুপুর ১২ টা। এরপর বিকাল ৬টার দিকে আমাকে নিয়ে আসা হয় শিমুল গাছেটির নিকট। আমি তখন বুঝতে

পারলাম একটি জলচৌকির উপর শুয়ে আছি। আমার পরনে অন্য একটি লুঙ্গী এবং একটি চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। দেখতি পারছি একটি বাঁশের এপাশ ওপাশ ধরে দু'জন সহযোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখতে পারলেও কিছু বলতে পারছিলাম না। পরে আমার সহযোদ্ধারা কিছুদূর পায়ে হেঁটে ও কিছুদুর নৌকায় আমাকে বাড়ী পৌঁছায়। পরে জানতে পারলাম পাক সেনারা যখন চলে যায় তখন ছোট ছোট কয়েকজন ছেলে আমাকে শিমুল গাছের গোড়ায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পাশের পলিশা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আতাউর রহমান তালুকদারকে সংবাদ দেয়। তখন উনারা কয়েকজন একটি ছোট নৌকা নিয়ে এসে নৌকায় উঠিয়ে বাঁশ ঝাঁড়ে লুকিয়ে থাকেন। এরপর পাক সৈন্য ও অন্যান্য মানুষজন চলে যাওয়ার পর পাশের গ্রাম আদাচাকীর নেওয়াজ মেম্বারের বাড়ী নিয়ে পড়নের রক্তমাখা সব কাপড়চোপড় কাঁচি দিয়ে কেটে বন্যার পানিতে ভাসিয়ে দেয়। এরপর অন্য একটি লুঙ্গী আমাকে পড়িয়ে একটি জলচৌকির উপর শুইয়ে স্মৃতিবিজড়িত সেই শিমুল গাছেটির নীচে নিয়ে নামানোর পর পরই আমার জ্ঞান ফেরে। দুপুর ১২টা হতে বিকাল ৬টা পর্যন্ত এই ছয় ঘন্টা আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম।

আমাকে বাড়ী নেওয়ার অব্যবহিত পর পরই সংবাদ আসে যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে চেচিয়াবাঁধা গ্রামের বারিক মৌলভী বেলালকে পাক বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয়। এরপর তাঁরা গুরুতরভাবে আহত বেলালের পা ধরে টেনে হিঁছড়ে রেল লাইনের উপর নিয়ে বেয়নটের দিয়ে খুঁচিয় মাথার খুলি উপড়ে ফেলে মগজ বের করে ফেলেছে ও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সর্বাংঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। এ সংবাদ পেয়ে আমাকে বাঁচানোর জন্য নৌকায় উঠিয়ে পাশের গ্রামের একটি বাড়ীর পেছনে কলার ছোপ ও বাঁশ ঝাঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখে।প্রাথমিক চিকিৎসা দেন আমার অধ্যয়নস্থল পোগলদিঘা উচ্চ বিদ্যালয়ের আছির স্যার। গ্রাম্য ডাক্তার হলেও তার সুখ্যাতি ছিল অনেক। আমার সেবা করতেন আমাদের পাট ব্যবসার সাথে জড়িত চান মিয়া ও মফিজ সরকার। প্রতিদিন ছোট নৌকায় আছির ডাক্তারকে নিয়ে ইঞ্জেকশন দিতেন ও খাওয়ার ঔষধপত্র দিতেন। এসব চিকিৎসা অব্যাহত থাকলেও প্লাস্টার ও ড্রেসিং করা সম্ভব হয়নি। এসংবাদ পেয়ে আমার বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী কলিম উদ্দিন মাষ্টার অন্য রণাঙ্গন থেকে দ্রুত বাড়ী আসেন। কোম্পানি কমান্ডার ফজলুর রহমান ও মফিজ সরকার প্রথমে সামগঞ্জ কালিবাড়ী প্রাথমিক হাসপাতালে। একজন কম্পাউন্ডার ছিল ওখানে। উনি দেখার

সাথে সাথেই ভারতের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। আর কালবিলম্ব না করে আমাকে মহেন্দ্রগঞ্জ প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যান। খুলে দেখার সাথে সাথেই একটি জীপ গাড়ীতে উঠানোর পর আমার বড় ভাই সাথে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেন। পরে সবাই উনাকে অনেক বুঝিয়ে ফেরত পাঠান। এরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় তুরা পাহাড়ের অস্থায়ী সামরিক হাসপাতালে। কয়েকদিন ওখানে রাখার পর নিয়ে যাওয়া হয় গুয়াহাটি সামরিক হাসপাতালে। সেখানে প্রায় দু'মাস রাখার পর নিয়ে যাওয়া হয় বারাকপুর সামরিক হাসপাতালে, এরপর ঞ্জনামকুম সামরিক হাসপাতাল হয়ে লক্ষ্মৌ সামরিক হাসপাতালে সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ চিকিৎসা প্রদান শেষে ২২ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে দানাপুর সামরিক হাসপাতাল হয়ে যশোর ৮ নং সেক্টর সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। একই দিন ২০/- টাকা ভ্রমণ ভাতা প্রদান পূর্বক ১০দিনের ছুটি শেষে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করা উদ্দেশ্যে গমনাদেশ প্রদান করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ বর্বর পাক বাহিনীর সৈন্যরা ভেঙ্গে ফেলায় নৌপথে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ীস্থ বয়ড়া রেল ষ্টেশনে নেমে ৫ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটেই বাড়ী যাই। বাড়ীসহ এলাকার হাজারও মানুষের চোখে ঝঁড়ে আনন্দের অশ্রু।

১৯৭২ সালে প্রয়াত রাষ্ট্রদূত কোম্পানি কমান্ডার ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আমাদের সহযোদ্ধা শহীদ বেলালের স্মরণে একটি শহীদ মিনার করি।সেই তখন থেকেই এর নিকটস্থ আমাদের অধ্যয়নস্থল ও আইয়ূব ও ইয়াহিয়া বিরোধী আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান পোগলদিঘা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশা শ্রেণীর সর্বস্তরের জনসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছিলেন শহীদ মিনারের বেদীতে। আর আজ একাত্তরের পাক বাহিনীর দোষর বারিক মৌলভীর অপকর্ম ঢেকে ফেলার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বর্তমানে সংবেদনশীল ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ পূর্বক শহীদ মিনার অবরুদ্ধ করে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বন্ধ রেখে শহীদের স্মৃতিচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা করছে।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আঃ গাফ্ফার কুতুবী

আমি মূলতঃ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা ছাত্র, একই সংঙ্গে বগুড়া মিশন নাইট হাই স্কুল থেকে এসএসসি ও নাইট কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করি।মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় আলীম পাশ করে ফাজিল এ অধ্যায়ন করি ও এইসএসসি পরিক্ষা দেই।মাদ্রাসায় ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করে বিফল হই।তবে ছাত্রলীগ এর সাথে সংযুক্ত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমি আমার গ্রামে চলে যাই (বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহূদা থানার অন্তর্গত কাপাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রাম) একেবারে সীমান্ত ঘেষা গ্রাম। যুবকদের একত্রিত করে ইপিআর ক্যাম্প স্থাপন করি ও স্বরনার্থীদের সার্বিক সহযোগীতা করতে থাকি। অসংখ্য স্বরণার্থী এই কুতুবপুর সীমান্ত দিয়েভারত প্রবেশ করে।যাদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগীতা আমরা করেছি এর নেতৃত্ব দিতাম আমি। সাথে ছিল সাইফুল বিশ্বাস, লিয়াকত আলী বিশ্বাস, লিয়াকত আলী, জালাল উদ্দিন বিশ্বাস, ওবেদুল মৌলানা, সুজাউদ্দিন, সহিদ বিশ্বাস।পরবর্তীতে ভারতে ডুমপুকুর ক্যাম্পে চলে যাই।প্রশিক্ষণ নেই সেই ক্যাম্পে থেকে। তৎকালীন এম,এস,এ এ্যাডঃ আলী আমাকে বি,এল,এফ এর প্রশিক্ষণের জন্য নিবাচন করেন এবং উত্তর প্রদেশ এর দেরাদুনে প্রশিক্ষণের জন্য চলে যাই। টাঙ্গুয়া ক্যাম্পের আমি ২য় ব্যাচ। প্রশিক্ষণ শেষ করে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে চলে আসি।জনাব এ্যাড আঃ বারী এবং জনাব তোফায়েল আহম্মেদ আমাকে মেহেরপুর মহকুমার দায়িত্ব দিয়ে সীমান্তে পাঠিয়ে

দেন। আমি লোকজন (ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও স্থানীয় ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) নিয়ে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার বর্তমান মুজিবনগর থানার অর্ন্তগত আনন্দবাস গ্রামের সীমান্ত (ভারতীয় সীমান্ত) কাগমারী ও কাথলী কুতুবপুর গ্রামে ভারত সীমান্ত কাগজীপাড়া ক্যাম্প গড়ে তুলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদান, অস্ত্র সংগ্রহ ও জনমত তৈরীর কাজে লেগে যাই। জনাব মোফাজ্জেল হোসেন (মোফাজ্জল মাষ্টার) কে গাংনী থানার দায়িত্ব দিই। সমগ্র মেহেরপুর মহকুমাতে জনমত তৈরী,করিডোর প্রতিষ্টা ও মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ সহ সম্মুখ যুদ্ধে ও আমি অংশগ্রহণ করি।বাগোয়ান যুদ্ধ, ভাবরপাড়া প্রতিরোধ যুদ্ধ, বিডিআর সেনা ও বিএলএফ (মুজিব বাহিনী) এক সাথে করে থাকি। চুয়াডাঙ্গা মহকুমার আমার নিজ এলাকা ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের দায়িত্ব ও আমাকে, তোফায়েল আহমেদ ও এ্যাড আঃ বারি ভাই প্রদান করেন। ১৯৭১ এর ডিসেম্বরের ৫ তারিখ এমরা মেহেরপুর শহরে ঢুকে পড়ি, ৬ই ডিসেম্বর মেহেরপুর মুক্ত দিবস পালন করি।মেহেরপুর শহরের একটা পরিত্যাক্ত বাড়িতে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করে অবস্থান করে গেরিলা পুলিশ সেনা বাহিনীর সাথে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে গ্রানেড, বোম্ব, ককটেল সরানোর কাজে সকলে সম্পৃক্ত হই। অস্ত্র জমা (ঢাকা ষ্টেডিয়াম) দেয়ার পর আমার নিজ এলাকায় হাইস্কুল, মাদ্রাসা,হাট ও পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠা করি।বর্তমান কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুতুবপুর সীমান্ত হাট, কুতুবপুর মুন্সিপুর নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বাক্ষর বহন করে চলছে। আর ৭৫ এর পর পোষ্ট অফিসটা স্থানান্তর হয়েছে তবে একই গ্রামে আছে। ১৯৭৩ সালে অর্থনীতিতে অনার্স করি এবং ফাজেল পাশ করি ১৯৭২ সালে। ১৯৭৫ সালে পট পরিবর্তনের পর দেশ ত্যাগ করি। ১৯৭৯ সালে দেশে ফিরি আমি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সরকার চাকুরী দেয়। ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ করি। বর্তমানে অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী-এর সাথে আছি ও তার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুন নাহার

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। সারাদেশের মতো যশোর শহরও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মিছিলে জনসমুদ্রের ঢেউ। শ্লোগানে মুখরিত রাজপথ। ৩ মার্চ একটি মিছিল যশোরের জেলা স্কুলের পাশ হয়ে এবং অন্য একটি মিছিল স্টেশনের পাশ হয়ে এসে টেলিফোন ভবনের সামনে দিয়ে লালদিঘির পাড়ে যাবার সময় পুলিশের গুলিতে চারুবালা শহীদ হলে মিছিল আরো প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শ্লোগান দিতে দিতে ডিসি অফিস ঘেরাও করা হয়। সেই মিছিলে শামসুন্নাহার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গোবরা ক্যাম্পে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শামসুন নাহার বাংলা ১৩৫২ সালের ১৩কার্তিক কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সৈয়দ শফিউদ্দিন। মা বেগম রোকেয়া গৃহিণী ছিলেন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে শামসুন নাহার। সবার বড়। বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে রেঙ্গুনে যুদ্ধ করেছেন। তিনি গল্প, কবিতা লিখতেন এবং গান করতেন। পরিবারে সবাই মিলে দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। ফলে বাড়িতে একটি রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল। পৈত্রিক নিবাস মাগুরা জেলার শালিখা থানার পাঁচকাহনিয়া গ্রামে। নানারা খুব প্রভাবশালী ছিলেন। মাগুরার গোবরা পুকুর জায়গাটির নাম হয়েছে দাদা সৈয়দ আব্দুল বারীর গরুর গোবর রাখার পুকুরকে কেন্দ্র করে। চাচা, ফুফুরা লেখাপড়া জানতেন এবং তাঁরা সাহিত্যমনা ছিলেন। তিনি লেখাপড়ায় প্রথম হাতেখড়ি নেন

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট প্রাইমারি স্কুলে। পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে চুয়াডাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। স্কুল পালানো অভ্যাস ছিল বলে মা মারতেন। নিজেদের গ্রামে হরিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু'বছর পড়েন তিনি। পরে বাবার মামাবাড়ি যশোরে চলে আসেন এবং সেবাসংঘ গার্লস হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৬৯ সালে নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন ছাত্রীনেত্রী সালেহা বেগম ও রওশন জাহান সাথীর প্রেরণায় গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। যেদিন তিনি ছাত্রলীগে যোগদান করেন সেদিন ছাত্রলীগের রবিউল আলম, আব্দুল হাই, খয়রাত হোসেন প্রমুখ ছাত্রনেতা উপস্থিত ছিলেন। সে-সময়ে তিনি মেয়েদের ৬ দফা ও ১১ দফা সম্পর্কে বুঝিয়ে স্কুল ও কলেজ প্রশাসনের নানা বাধা অতিক্রম করে মিছিলে নিয়ে আসতেন। এছাড়াও তিনি পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোটিভেশন করে মহিলাদের বিভিন্ন সভা সমাবেশে নিয়ে আসতেন। যশোর এসবিতে তার নাম থাকায় বাড়িতে অসহযোগিতা শুরু হয়। বাবা লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করে দেন। সদা বকাবকি শুরু করেন। দাদি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকি দেন। এভাবে চলতে থাকলে তিনি টিউশনি শুরু করেন এবং দাদার বাড়ি ছেড়ে প্রায়ই সালেহা আপার বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া করেন। এমনকি বাড়ির অন্যান্য শরিক তাঁকে 'বাজারের মেয়ে'-জাতীয় অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকলে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাকে বোঝাতেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে পৈত্রিক বাড়ি শালিখা থানায় আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেটি জামাতের এলাকা বলে প্রচুর অপবাদ সইতে হয় তাঁকে। ৭ মার্চ রেসকোর্সের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বেতারে প্রচার না হলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে যশোরবাসী। ৮ মার্চ সকালে বেতারে রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচার করার পর পুরোদমে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। নানা ভয় পেয়ে তাঁকে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য করেন। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরুর পর বাড়িতে অনেক মানুষ আশ্রয় নেন। তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করেন। তাদের এলাকাটি ছিল নকশাল এরিয়া। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি তৎপর হয়ে পড়ে। তাঁর সম্পর্কিত খালাতো ভাই আবুল বাসার পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। তিনি শামসুন্নাহারকে

তাঁদের পার্টির পক্ষে কাজ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। আবুল বাসার তাঁকে পার্টির অনেক বইপত্র দিয়ে যান। সেই সাথে একটি দায়িত্ব দেন স্থানীয় জোতদার আবুল হোসেনের গতিবিধি লক্ষ করে খবর আনার জন্য। তিনি শুরু করেন কাজ। ইতোমধ্যে এলাকায় রাজাকার তৈরি হয়ে গেছে। রাজাকারের ভয়ে মা মেয়েকে বাড়িতে না রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আবুল বাসারের উপর নির্ভর করে মে মাসে তাঁকে পাঠিয়ে দেন হরিশপুর গ্রামে বাসারদের বাড়িতে। জুন মাসের একদিন রাজাকাররা গ্রাম ঘিরে ফেলে। হরিশপুর স্কুলের শিক্ষক আব্দুর রশিদকে নিয়ে ঘরোয়া মিটিং বসে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় তাঁদের ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার, যাতে তাঁরা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং দেশে এসেও যুদ্ধ করতে পারেন। পরে দশজনের একটি দল গঠন করা হয়, যার মধ্যে তিনি একাই মেয়ে তিনদিন পায়ে হেঁটে বনগাঁ এসে পৌঁছান জুলাই মাসে। সেখানে মুজিব বাহিনীর ক্যাম্পে যান। সেই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন আলী হোসেন মণি, আব্দুস সালাম, রফিকুজ্জামান। এ ক্যাম্পে দুই মাস নার্সিংয়ের ট্রেনিং নেন তিনি। যে-সব মুক্তিযোদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়তো তাঁরা প্রথমে এই ক্যাম্পে ওঠতো। পরে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হতো। তোফায়েল আহমেদ সেই ক্যাম্প পরিদর্শনে এলে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে গোবরা ক্যাম্পে পাঠানো হয়। গোবরা ক্যাম্পে বিভিন্ন দল ছিল। প্রশিক্ষণ দিতেন ভারতীয়রা। প্রতিদিন সকালে পিটি প্যারেড। করে বিকেল থেকে সন্ধ্যা এমনকি রাত পর্যন্ত ক্লাশ হতো। সেখানে রাজনীতি, দেশ, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, প্রাথমিক চিকিৎসা, তথ্য সংগ্রহ, ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন দেয়া, তাৎক্ষণিক চিকিৎসাসহ অনেক বিষয়ের উপর ক্লাস হতো। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যাচে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করার জন্য অন্যান্য হাসপাতালে যেতে হতো। ক্যাম্পে শুনতে পান যে একটি মেয়ে ছেলে সেজে যুদ্ধ করছে (শিরিন বানু মিতিল)। তাঁকে সবাই মিলে গাড়িতে করে দেখতে যান। এছাড়া আমেরিকা পাকিস্তানের সমর্থনে সপ্তম নৌবহর পাঠালে তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয় কলকাতায়। তিনি সেই মিছিলে যোগদান করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দে শামসুন নাহার আত্মহারা হয়ে ওঠেন। ১৭ ডিসেম্বর যশোরে ফিরে আসেন। বাড়ির সবাই তাঁকে জীবিত ফিরে পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। স্বাধীন বাংলায় এসে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করেন নিজেকে। ১৯৭২ সালে এস. এস. সি

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইচ.এস.সি-তে ভর্তি হন যশোর মহিলা কলেজে। আন্দোলনের সহযোদ্ধারা অনেকেই দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য জাসদে যোগ দেন। তিনি দো-টানার মধ্যে পড়েন কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা তাঁকে ছাত্রলীগেই থেকে যেতে বাধ্য করে। তিনি খাজুরা, কেশবপুর, নড়াইল, মনিরামপুর, শার্শা প্রমুখ স্থানে গিয়ে স্কুল, কলেজে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছাত্রলীগের পক্ষে সভা করেন। ১৯৭৪ সালে এইচ.এস.সি. পাস করে মাইকেল মধুসূদন কলেজে ডিগ্রিতে ভর্তি হন। ১৯৭৮ সালে তিনি এম.এম কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। কয়েকজন সমমনা সঙ্গী নিয়ে গড়ে তোলেন ‘রবিবাসরীয় সাহিত্য পরিষদ’ নামের এক প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন। তিনি তাঁর সমাজকল্যাণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে প্রতি রোববার সন্ধ্যায় সাহিত্যের আসর বসতো। গানের স্কুল ও নাটকের দলও ছিল। সংসারের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে পড়লে তিনি চাকরির চেষ্টা করেন এবং বি.আই.ডি.এস-এর রিসার্চ স্টাফ হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। কিছুদিন পরে চাকরি ছেড়ে আয়শা সর্দারের সেবাসংঘ সমিতির তত্ত্বাবধানে নীলক্ষেতে বাবুপুরা বস্তিতে বয়স্ক শিক্ষা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে টানা পাঁচ বছর কাজ করেন। ১৯৮৫ সালে বি.এড. ক্লাসে ভর্তি হন। ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পরিচিত ও মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আবুল হাসনাতের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জননী। ১৯৯৬ সালে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে 'সপ্তডিঙ্গা' নামে একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন গড়ে তোলেন। যার মূল কার্যক্রম হলো নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেয়া। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেন। তিনি বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রকল্পে স্থানীয় পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

পনেরো বছর বয়সের একজন কিশোরীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের কথা তেমন ভাল বোঝার কথা নয়। অথচ দুঃসময়ে তাঁকে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। সময়ের স্রোতে ঐ কিশোরীর মনের অবচেতনে নেওয়া সিদ্ধান্তই হয়ে গেল ইতিহাসের অংশ। ১৯৫৭ সালে নাহার-এর আব্বা ছিলেন ইপিআর সদস্য।

১৯৬৬ সালে তাঁর পোস্টিং ছিল যশোর। তিনি যশোর শহরে বাসা নিলেন। নাহার যশোর শহরে সেবা সংখ গার্লস হাই স্কুলে ক্লাশ সেভেনে ভর্তি হন। তাঁর বাবা ১৯৬৮ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। নাহার পড়ালেখা করার জন্য থেকে খান যশোর শহরে তাঁর আব্বার মামা বাড়ি। শুরু হয় নাহার-এর নতুন জীবন। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা পেশ করেছেন। বাঙালি জাতি সে দাফির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। দেশে চলছে দুর্বার আন্দোলন। নাহার তখন সেবা সংঘ গার্লস্ হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। যোগ দেন ছাত্র লীগে। নাহারের দাদা বাড়ি বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তাঁরা মেয়েদের পর্দা ছন্দ করতেন। মেয়েরা পর্দার মধ্যে স্কুলে যাবে, ক্লাস করবে, ক্লাস শেষে বাসায় চলে আসবে। কিন্তু নাহার একটু অন্য রকম হওয়াতে সব সময়ে একটা মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হতো। এরপরও বিভিন্ন উপায়ে নিয়মিতই মিটিং-মিছিল এবং দলের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের জন্য একটি খুব দুঃখের দিন। এই দিনে ভোলায় একটি প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় হয়। অনেক মানুষ মারা যায়, গৃহহারা হয়। মানুষের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দল বেঁছে নাহার তখন যশোর শহরের বাড়ি বাড়ি যেয়ে ত্রাণ সাহায্য চান। যশোর শহরে প্রাণ সংগ্রহ কাজটি সমন্বয় করেন রবিউল আলম। এলো ১৯৭০-এর নির্বাচন। রাজনীতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এবং অভিজ্ঞতার জন্য নাহার ভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হন। একসময়ে লেখাপড়ার কারণে নাহার চলে আসেন যশোর শহরে। এস.এস.সি. পরীক্ষা সামনে। এজন্য টেস্ট পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার ফিস জমা দেওয়া ইত্যাদি। পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হলো ২৪ এপ্রিল ১৯৭১। পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি গণআন্দোলনে অংশগ্রহণও বাদ যায়নি। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের ভুল সিদ্ধান্তে সকল স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হলো। শুরু হলো বাঙালির আন্দোলন স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে মোড় নেওয়া। এরই মধ্যে ২রা মার্চ যশোর শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল হচ্ছে। টেলিফোন ভবনের সামনে গুলি হয়েছে। একজন শিশু মারা গেছে। যশোর শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। শিশুর লাশ নিয়ে মিছিল হলো। আস্তে আস্তে যশোরে শুরু হলো সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। গোপনে মাহার ও আরও কয়েকজন মমতাজ বেগম

মম, সাথি, সালেহা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। দেশের অবস্থা ক্রমেই অস্থিতিশীল। দাদার নির্দেশে নাহার তাঁর গ্রামের বাড়ি শালিখা থানার পাঁচকাহুনিয়া গ্রামে চলে গেলেন। এর মধ্যে চলে আসে সেই কালরাত। ২৫শে মার্চ কাল রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর হায়েনার হিংস্রতা নেমে আসে। বহু বাঙালি নিহত হন। যারা বেঁচে রইলেন, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রওয়ানা হলেন গ্রামের উদ্দেশ্যে। মানুষের কাছে পূর্ব পাকিস্তান আর নিরাপদ থাকলো না। আশ্রয়ের জন্য শুরু করলো ভারত যাওয়া। ২৬ মার্চ সকাল ১১টার দিকে যশোর শহর থেকে অনেক মানুষ নাহারদের বাড়ি এলো। তখন নাহারদের বাড়িতে গম উঠেছে। এত মানুষের ঘুমানোর জায়গা নেই। তাদের রান্না করে খাওয়ানো হলো। কিন্তু ঘুমানোর জায়গার অভাব কাজেই পুরুষেরা ঘুমালো গমের খড়ের উপরে মেয়েরা ঘুমালো ঘরের ভিতর। পরদিন সকালে যার যার নিজের আত্মীয় স্বজনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো। নাহার-এর আব্বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর চাকরি থেকে ইতিমধ্যে অবসরে গেছেন। অবলম্বনের জন্য দোকান করেছেন। তাঁর উপরে অনেক চাপ আসতে থাকলো। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। দোকানের সব জিনিস বাড়িতে নিয়ে এলেন। বাক্সে করে পুঁতে রাখলেন মাটির নিচে। এরপর বাড়ি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। নাহার-এর মা তখন অন্তঃসত্ত্বা। নাহারদের এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি খুব শক্তিশালী ছিল। চিত্রা নদীর দুই পাড়ে এই দুই পার্টির অবস্থান ছিল খুবই দৃঢ়। একদিকে যেমন পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি মারছে। অপরদিকে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মানুষ মারছে শ্রেণী শত্রু খতম করার নামে। এলাকায় অনেকে জানতো নাহার ছাত্র রাজনীতি করেন। এজন্য পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি দু-পক্ষই তাকে দলে ভেড়ানোর জন্য মরিয়া। আর নাহার এসএসসি পরীক্ষা নিচ্ছেন। হঠাৎ করে একদিন ভাঙ্গ নামের একজন বাম গোপন ধারার রাজনীতিক, যিনি পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান, নাহারদের বাড়ি এলেন সরাসরি নাহার-এর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। নাহারকে তিনি বোঝাতে লাগলেন তাদের পার্টির গুরুত্ব। ১৫/১৬ বছরের একজন মেয়ের ঘরে এভাবে একজন পুরষের ঢুকে যাওয়াকে সমাজের মানুষ প্রীতির চোখে দেখে না। এমন কি নাহার-এর জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

একইভাবে আবুল বাসার নামে তাঁদের এক আত্মীয় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান। একদিন নাহারদের বাড়ি এসে তাঁকে দলে যোগদানের জন্য বোঝাতে লাগলেন। বাসার যশোর এম এম কলেজে এইচএসসি পড়ছিল। এখানেও তাঁর রেজাল্ট খুব ভালো। সে নাহারকে পার্টির বই দিলো পড়ার জন্য। পাশাপাশি সে একটি ডিউটিও দিলো। ঐ গ্রামের জোতদার আবু মুনসী ও বিশে খাঁ তাঁরা বাসারদের শ্রেণী শত্রুর তালিকায় রয়েছেন। নাহারের দায়িত্ব হলো এদের গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে আবুল বাসারকে জানানো। নাহার এই দুই ব্যক্তির বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতে থাকলেন। ঐ সময়ে এই পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কথা কেউ না শুনলে তাদেরও এরা মেরে ফেলতো। নাহারদের বাড়িতে এভাবে এদের দু'জনের চলাফেরায় তাঁর চাচারা ভয় পেয়ে গেলেন। অবশেষে নাহারদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এমন কি নাহারদের ঘরের কোন জিনিস যদি অন্য কারো বারান্দায় রাখা হতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা এনে নাহারদের ঘরে রেখে যেতো। কমিউনিস্ট পার্টির ছেলেমেয়েরা যে নাহারদের বাড়িতে ঘোরাফেরা করছে তা গ্রাম ছাড়িয়ে আরও দূরের মানুষ জেনে গেলো। ফলে আবু মুনসী ও বিশেখার বাড়িতে নাহার গেলে তাঁরা তাঁকে একটু ভয়ের চোখে দেখতো। নাহারও কারও সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে চাইলে ভুল তথ্য দিতো। অপরদিকে তখন পাকিস্তান আর্মি ও রাজাকারদের অত্যাচারতো ছিলই। দিনকে দিন অবস্থার অবনতি হতে শুরু হলো। এই ৭/৮ বছর বয়সের ভাই হয়ে পড়ে উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁর মা বাড়িতে উৎপাদিত কাঁচা তরকারি, ফল ইত্যাদি ভাইয়ের হাতে দিতেন। ভাই সেগুলো বাজারে বিক্রি করে যে টাকা পেতো তাই দিয়ে বা আটা কিনে আনতো। এগুলো দিয়ে কোন রকমে সংসার চলছিল। এর মধ্যে খবর এলো নাহারদের এসএসসি পরীক্ষা হবে। কিন্তু নাহার মিলিটারি শাসনে পরীক্ষা দিবে না জানালো। মে মাসের দিকে তাঁদের বাড়িতে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও রাজাকারদের অত্যাচার আরও বেড়ে চলেছে। নাহারের মা নাহারকে বাড়িতে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। তুলে দিলেন আত্মীয় আবুল বাসারের হাতে। বললেন, "বাবা, তুমি থাকলে আর আল্লাহ থাকলো, আমার মেয়েটাকে দেখে রেখো।" নাহার বাসারের সাথে পাশের গ্রাম হরিশপুরে গিয়ে উঠল। ৪/৫ দিন পর এক রাতে

বাসার এসে নাহারকে জানালো যে পরদিন নৌকায় করে আর্মস আনতে যেতে হবে। খুব ভোরে প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে বলে বাসার চলে গেল এ-সময়টাতে গ্রামের প্রতিটি যুবক ছেলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিচ্ছে। যারা যোগ দিতে অপারগতা জানিয়েছে তাদের প্রকাশ্যে মেরে ফেলা হয়েছে। সে- জন্য গ্রামের অধিকাংশ যুবক ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। কথা মতো নাহার খুব ভোরে প্রস্তুতি নিয়ে বসে রইল। কিন্তু বাসার এলো একটু দেরি করে তাঁর মুখটা খুবই বিষন্ন, নাহার এর কারণ জানতে চাইলে বাসার জানালো, রাজাকাররা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। তাই আর্মস আনতে যাওয়া নিরাপদ নয়। সবাইকে এখন আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যেতে হবে বাসার চায় নাহার ঐ গ্রামের আরও ১০/১২ জন ছেলের সাথে ভারত চলে যাক নাহার যেহেতু ছাত্রলীগ কর্মী, পরিচয় দিলে তারা নাহারকে গ্রহণ করবে কিছুক্ষণ পর ১০/১২ জনের সেই দলের সাথে হেঁটে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল নাহার। আর, রাজাকার কর্তৃক নিজ গ্রাম অবরুদ্ধ থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নাহার তাঁর মার সাথে দেখা করে যেতে পারল না। বারোবাজার হয়ে কালিগঞ্জের উপর দিয়ে গরীবপুরের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করল নাহার ও তাঁর দল। ৩ থেকে ৪ দিন হাঁটল। প্রথম রাতে আন্দোলপোতা গ্রামে ফুপাতো ভাই-এর শ্বশুর বাড়ি থাকল তাঁরা। পরের দিন। কালিগঞ্জের প্রধান রাস্তাটি পার হওয়ার সময় একটি সমস্যা হলো। আগের একটি দল রাস্তা পার হওয়ার সময় পাকিস্তানি টহলদার বাহিনীর চোখে পড়ে। তাদের গুলি করে মারা হয়েছে। এরপর নাহার-রা সন্ত্রস্ত মনে রাস্তা পার হলো তাঁদের ভাগ্য ভালো যে তখন আশপাশে কোন টহল বাহিনী ছিল না সবাই নির্বিঘ্নে পার হলো ২য় দিন গরীবপুর বর্ডারে একজনের বাড়িতে রাত কাটাল সবাই। এভাবে ৩/4 সিন হেঁটে তাঁরা বনগাঁ পৌঁছে। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে রওশান আলী সাহেবের সাথে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে রবিউল আলমের পরিবারের সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু সেখানে জায়গা হবে না বিধায় তাঁকে মুজিব বাহিনীর কোরিডোরে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। সাথের ছেলেরা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রশিক্ষণ নিতে চলে গেলো।

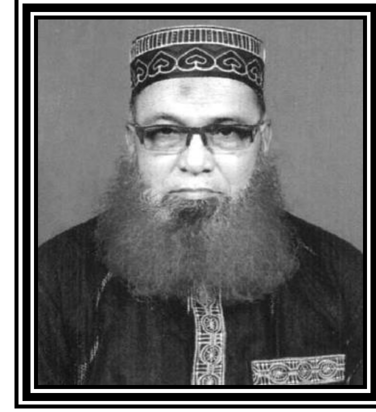
এরপর শুরু হলো মুজিব বাহিনী কোরিডোর জীবন। প্রথম দিকে আলী হোসেন

মনি ছিলেন দায়িত্বে এর কিছুদিন পর এলেন আব্দুস সালাম এর পর এলেন শাহ রফিকুজ্জামান। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যারা বিশ্রামের জন্য আসতো তাঁরাই এখানে থাকতো। এরপর ভারতের অভ্যন্তরে গিয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ শেষ করে এসে এখানে রাত কাটিয়ে মন সংযোগপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতো। নাহার এখানে রান্না করতেন। যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা আহত হতেন, বা অসুস্থ হতেন তাদের সেবা করতেন। কাপড় ধুয়ে দিতেন, রান্না করে খাওয়াতেন। এমনি একজন মুক্তিযোদ্ধা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কোরিডোরে এলেন। তাঁর গায়ে সে কি জ্বর। নাহার তাঁর মাথায় পানি দিয়ে, শরীর মুছে দিয়ে, পথ্য তৈরি ক'রে খাওয়ালেন। তিনি খুব শীঘ্র আরোগ্য লাভ করলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, নাহার-এর সেবার জন্য তিনি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন তিনি আরও বললেন, নাহার যখন তাঁর সেবা করছিল তখন নাকি তাঁর মায়ের কথা খুব করে মনে পড়ছিল। মুক্তিযুদ্ধের অনেক নেতা এই কোরিডোরে আসতেন, সভা করতেন, প্রয়োজনীয় তথ্য দিতেন। আবার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করতেন। এই কোরিডোরেই পরিচয় হয় খন্দকার আবুল হাসনাতের সাথে। ক্রমে সেই পরিচয় রূপ নেয় জীবন- বাস্তবতায়। একবার তোফায়েল আহমেদ বললেন যে তিনি বাংলাদেশের কই মাছ খাবেন । বাংলাদেশ থেকে বড় বড় কই মাছ আনা হলো। কে রান্না করবেন। নাহার তো এতবড় রান্না এর আগে আর করেন নি। কাউকে না পেয়ে সাহসে বুক বাঁধলেন। অপূর্ব স্বাদের একটি তরকারি হলে তোফায়েল সাহেব খেয়ে প্রশংসা করলেন। এ সময় কলকাতার পার্কসার্কাসের নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে মমতাজ বেগম মম দায়িত্ব নেন নারী মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে বের করার। তিনি বিভিন্ন ক্যাম্পে যেয়ে যেয়ে নারী মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে বের করে এনে এই ক্যাম্পে ভর্তি করতেন। নাহারও মাঝে মাঝে এই কাজে অংশ নিতেন মুজিব বাহিনীর কোরিডোরে দুই মাস থাকার পর নাহারকে এ-কাম্পে স্থানান্তর করা হয়। এখানে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জীবন পদ্ধতি ছিল আনন্দমুখর। প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে নাস্তা তৈরির জন্য রুটি সেঁকা হতো। এরপর নাস্তা সেরে প্যারেড ও পিটি। রাইফেল চালনাও শেখানো হতো। এরপর দুপুরের খাওয়া। বিকলে চলতো তাত্ত্বিক ক্লাশ। এখানে নার্সিং শেখানো হতো। কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে

হয় তা শেখানোরও ব্যবস্থা ছিল। দেশ-বিদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও শেখানো হতো।

এখানে সকলে খুব মজাও করতেন। একবার পাইলী নামের একজন সারাক্ষণ মনমরা হয়ে রইলেন। তিনি তাঁর বাবাকে মেরে ফেলতে দেখেছেন। তাঁদের বাড়ি রাজশাহী শহরে। তিনি মেডিকেলের ছাত্রী। ২৫ মার্চ রাতে তাঁদের বাড়ি থেকে তাঁর বাবাকে পাক আর্মিরা ধরে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। বাড়ির সামনে রাস্তায় তাঁ বাবার মৃতদেহ পড়েছিলো। কিন্তু দাফন করবেন সে ক্ষমতা ছিল না কারো। এই দুঃখে সবসময় তাঁকে ম্রিয়মাণ করে রাখতো। সঙ্গী মেয়েরা তাকে একটু একটু আনন্দ দেয়ার চেষ্ট করতেন যেন সেই দুঃখময় স্মৃতি থেকে বের হয়ে আসতে পারেন। ধীরে ধীরে ক্যাম্পে মেয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকলো। এক পর্যায়ে ঘরের মধ্যে আর জায়গা হচ্ছিল না। প্রশাসন থেকে সিদ্ধান্ত হলো ছাদে তাঁবু টাঙিয়ে সেখানে মেয়েদের রাখা হবে। কে কে সেখানে যাবে। অবশেষে ৫/৬ জন অর্থাৎ নাহার, নাজমা, মাজেদা, আম্বিয়া, বহ্নিশিখা, খুলনার একজন এবং আরও একজন মেয়ে মহাআনন্দে রাজি হলেন। ছাদে তাঁবু টাঙিয়ে থাকা শুরু হলো। ক্যাম্পের আশপাশে ছিল ধোপা বাড়ি তারা শেষ রাতে কাপড় কাঁচার কাজ শুরু করতো। আশপাশে আরও ছিল মুসলিম পরিবার। এসব বাড়ির যুবক ছেলেরা যৌবনের স্বাভাবিক কৌতূহলে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাতো ক্যাম্পেন দিকে । এক ভোরে হঠাৎ একধরনের শব্দ হতে থাকলে মনে হচ্ছিল কে যেন তাঁবুর পাশ দিয়ে হাঁটছে। ভোরে দেখা গেলো খুব জোরে বাতাস বইছে। এ-সময়ে এ-ক্যাম্পে আসতেন শাহীন সামাদ, আপেল মাহমুদ প্রমুখ। তাঁরা সকলকে গান শোনাতেন। এভাবে কেটে যেত ক্যাম্প জীবন নাহারদের প্রথম ব্যাচ আগরতলা সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলো। নাহার ২য় ব্যাচে যাবো বলে সিদ্ধান্ত হলো। এর মধ্যে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ যশোর অঞ্চল মুক্ত হলো। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৭ম নৌবহর এসে ভারত মহাসাগরে অবস্থান নিলো। ভারত ও রাশিয়া বাংলাদেশকে সমর্থন করছিল। নাহাররা ক্যাম্পের পক্ষ থেকে ৭ম নৌবহরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। মিছিল করলো। রয়টার্স বিল্ডিং-এর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হলো। পরে আস্তে আস্তে দেশের অন্যান্য অঞ্চল মুক্ত হলো। এগিয়ে এলো পরম

আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিক্ষণ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সমাপ্ত হলো ১ মাসের মুক্তিযুদ্ধ। দেশ ও মানুষ পেলো নতুন পতাকা ও স্বাধীনতা।



বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ জহুর-ই-আলম

০৭ ই মার্চ বাঙ্গালী জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন, ১৯৭১ সালের ০৭ ই মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সূচনা রচনা করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেছিলেন,"তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল,প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো" তোমাদের কাছে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা সব কিছুই আছে, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা তা বন্ধ করে দেবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি গেরিলা যুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ডাকে সাড়া দিয়ে আমি কুমিল্লা ময়নামতি সার্ভে ইনষ্টিটিউটে সার্ভে ডিপ্লোমা থেকে অধ্যায়নরত অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। আমাদের গ্রামের আমি, এ.কে.এম ইদরিস আলী, আব্দুল লতিফ, আব্দুর রাজ্জাক সর্দার, বড়খড়ির অজিত মন্ডল, সুধীর কুমার বিশ্বাস, আবু জাফর মোল্যা, পাথরার আব্দুর রাজ্জাক খান এবং নলদাহ সুশান্ত কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দুলাল মন্দির পার হইয়া সুবিতপুর গ্রামে আব্দুর রহমানের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। ২০ শে জুন ১৯৭১ রানাঘাট ইয়ৎ ক্যাম্পে ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পর মরহুম জননেতা

এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান এম.পি.এ এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ৩০ শে জুন তারিখ পর্যন্ত রানাঘাট ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্পে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। রানাঘাট হতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে কল্যাণী হেড কোয়ার্টারের মাধ্যমে বিহার প্রদেশের বিরভূম জেলার চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠান। সেখানে মাসাধিকাল উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ (এফ.এফ. গেরিলা) করি। চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ শেষে আমাদেরকে কল্যাণের মাধ্যমে বয়রা বর্ডার ক্যাম্পে সম্পৃক্ত করেন। সেখানে অবস্থানকালে ৫/৭ মাইল দূরে কাশিপুর হয়ে প্রতিনিয়ত ছুটিপুর ঘাটিতে সেলিং করা, পাক সেনাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য এ্যাম্বশ করা হতো। কাশিপুর যুদ্ধে ভারতীয় সেনা সদস্যদের সহযোগিতায় আমি আমার গ্রুপসহ যুদ্ধ করি এবং এ যুদ্ধে ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ পাক বাহিনী টুইস মর্টারের গুলিতে আহত হয়ে পুকুর পাড়ে শহীদ হন। আমরা উনার জানাযা ও দাফন কার্য পুকুর পাড়ে সম্পন্ন করি। ৭/৮ দিন পর বয়রা ক্যাম্প থেকে আমাকে গ্রুপ কমান্ডার করে (৫৫) পঞ্চান্ন জন সহযোদ্ধার মধ্যে আমার নামে এস.এম.জি, ও অন্যান্য সহযোদ্ধাদের নামে যথাক্রমে এল.এম.জি, এস.এল.আর, থ্রিনটথ্রি (৩০৩) রাইফেলস, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ ইস্যু করে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। আমি যুদ্ধকালীণ কমান্ডার হিসেবে বাংলাদেশে ঢোকার পথে দুলাল মন্দির নামক স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর চলতি গাড়ি লক্ষ করে এলোপাতাড়ি গোলাগুলি শুরু করি। এতে পাক হানাদার বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা গোলাগুলি করে। আর আমরা পিছু হোটে আখ ক্ষেতে পজিশন নেই। পাক হানাদারদের গুলিতে আমার সহযোদ্ধা মোহাম্মদ কওসার আলী শহীদ হন এবং অপর সহযোদ্ধা মাগুরা সদর উপজেলার তৎকালীণ হাজরাপুর বর্তমানে রাঘবদাইড় ইউনিয়নের মো: আবু বক্কার সিদ্দিক আহত হন।

সেখান থেকে আসার পথে সুইতলা মল্লিকপুরে রাজাকারদের সাথে সংঘর্ষ হয়। এরপর আমি আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে ধনেশ্বরগাতী গ্রামে নগেন মাস্টারের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি। পরের দিন ধনেশ্বরগাতী কুটি বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করি। ৩/৪ দিন অবস্থান করার পর গজদুব্বা গ্রামে রাজাকারদের সাথে সংঘর্ষ হয়।

শ্রীপুর থানা দখল : ৫ আগস্ট ১৯৭১ আমার গ্রুপসহ শ্রীপুর আঞ্চলিক বাহিনীর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়ার বাহিনীতে এসে যোগদান করি। শ্রীপুর বাহিনীর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়া ও উপ-অধিনায়ক মোল্লা নবুয়ত আলীর নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করি এবং শ্রীপুর বাহিনীর সাথে শ্রীপুর থানা দখল করি। সেখানে ৩৪ টি রাইফেলস ও ১৫০০ গুলি উদ্ধার করা হয়।

সাথে যুদ্ধ : সেখান হতে ৩রা সেপ্টেম্বর আমার পূর্ববর্তী ক্যাম্প ধনেশ্বরগাতী কুটিবাড়ি ফিরে আসি। ৫ সেপ্টেম্বর লক্ষীপুর বাজার আক্রমণ করি এবং রাজাকারদের হটিয়ে দেই। ১২ সেপ্টেম্বর আড়ুয়াপাড়া বাজারে রাজাকার ও দুস্কৃতিদের সাথে সংঘর্ষ ঘটার পর একজন দুস্কৃতিকারী আমার গ্রুপের গুলিতে নিহত হন।

তালখড়ি যুদ্ধ : ১৩ সেপ্টেম্বর শালিখা থানার তালখড়ি নামক গ্রামে আমি আমার সঙ্গীদের ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে পাক হানাদারদের সাথে যুদ্ধ করার সময় ০৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

ইছাখাদার যুদ্ধ : ২৬ সেপ্টেম্বর আমার নেতৃত্বে ইছাখাদা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধে আমার নিজ গ্রামের সহযোদ্ধা মো: আব্দুল লতিফ, মো: আব্দুর রাজ্জাক, মো: এ.কে.এম ইদ্রিস আলী এবং তৎকালীণ হাজরাপুর বর্তমানে রাঘবদাইড় ইউনিয়নের মাঝাইল গ্রামের আমার গ্রুপের অপর সহযোদ্ধা মো: আবু বক্কার সিদ্দিক, মো: আব্দুস সত্তার কৃতিত্বপূর্ণ সম্মুখ যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে পুলের কাছে (০৭) সাত জন রাজাকার নিহত হয়।

হাওড়ের যুদ্ধ : ৬ ই অক্টোবর আমি আমার গ্রুপ সহ হাওড়ে যাওয়ার পথে পাক হানাদার বাহিনীর গাড়ি লক্ষ করে গোলাবর্ষণ করে সেখান থেকে সরে পড়ি।

বিনোদপুরের যুদ্ধ : ৮ ই অক্টোবর অধিনায়ক আকবর হোসেন মিয়ার নেতৃত্বে আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিনোদপুরে রেঞ্জার পুলিশ ও রাজাকারদের সাথে তুমুল যুদ্ধ করি। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মুকুল শহীদ এবং গোলাম মোস্তফা গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়া ০৪ জন রাজাকার মারা যান।

কাজলীর যুদ্ধ : ১০ ই অক্টোবর আকবর হোসেন মিয়ার নেতৃত্বে আমি আমার গ্রুপের সহযোদ্ধাদের নিয়ে কাজলী ঘাটে যুদ্ধ করি। পাকিস্তানি বাহিনী নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের উপর আক্রমণ করি। বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য

ও রাজাকার হতাহত হয়

টিকারী বাজারের যুদ্ধ : ১৬ অক্টোবর টিকারী বাজারে আমার নেতৃত্বে পাক হানাদার ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে (০১) এক জন পাক সেনা নিহত হয়।

পুনরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কুটি বাড়ি ফিরে আসা : ২০ অক্টোবর আমার গ্রুপের (৫৫) পঞ্চান্ন জন সহযোদ্ধা কুটিবাড়ি ক্যাম্পে অবস্থান করেন। পরের দিন ২১ তারিখে আমি ২২ জনকে সাথে করে তিতারখাঁ পাড়া গ্রামের আলি আহম্মদের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি।

জাগলা ব্রিজে যুদ্ধ : ২১ তারিখে আলি আহম্মেদের বাড়ীতে অবস্থানরত অবস্থায় ঐ দিন জানতে পারলাম যশোর হইতে জাগলা ব্রিজরে উপর দিয়ে পাক সেনারা বিভিন্ন মালামাল নিয়ে তাদের বিভিন্ন গন্তব্যে এই পথে যাতায়াত করে। কারণ পাকসেনাদের যশোর খুলনা মহাসড়কে চলাচলের একমাত্র রুট বা গন্তব্য পথ, এ জায়গা দিয়ে তাদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসদ (মালামাল / অস্ত্র ও গোলাবারুদ) আসত।

২২ অক্টোবর আমি আমার গ্রুপের সকল সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিকেল বেলা নৌকাযোগে জাগলা ব্রিজের উত্তরে রাস্তার পূর্ব পাশে পুকুড়পাড়ে অবস্থান নিই এবং ব্রিজের বর্ডার ভাঙ্গতে শুরু করি যেন পাক বাহিনীদের জীপ গাড়ি সে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে না পারে সে লক্ষ্যে ব্রিজের বর্ডার ভাঙ্গতে শুরু করি। পূর্বেই এখানে রাজাকারদের ক্যাম্প ছিল, রাজাকার মারফত সংবাদ পেয়ে পাকসেনারা ব্রিজে এসে ব্রিজের দক্ষিণপাশে অবস্থান নিয়ে আমাদেরকে লক্ষ করে গোলাগুলি শুরু করলে আমরা ব্রিজের উত্তরে রাস্তার পূর্ব পাশে পুকুর পাড়ে অবস্থান নিই এবং রাজাকার ও পাকসেনাদেরকে লক্ষ করে পাল্টা গোলাগুলি শুরু করি এতে ওখানে তুমুল আকারে রনক্ষেত্র তৈরি হয়, আমরা সুকৌশলে তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করি। পরবর্তীতে আমরা আত্মরক্ষার্থে সেখান থেকে সরে পড়ি। পরের দিন সকালবেলা আমরা জানতে পারলাম এ যুদ্ধে ০১ এক জন পাক সেনা ও ০২ দুই জন রাজাকার মারা গেছে।

বরইচারার যুদ্ধ : অক্টোবর মাসের শেষের দিকে মাগুরা শালিখা সীমান্তে আসবা-বরইচারা নামক স্থানে আব্দুল লতিফ, আব্দুর রাজ্জাক, এ.কে.এম.ইদ্রিস আলী, মোঃ আবু বক্কার সিদ্দিক, মফিজ মোল্লা, আনোয়ারুল ইসলাম ওরফে নফশের,

আবু জাফর সহ আমার গ্রুপের ২০/২৫ জন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে ০৩ নং গ্রুপ কমান্ডার, বি.এম.তকব্বর যুদ্ধকালীন (এফ.এফ) কমান্ডার জে,বি,নং- ৪৮৩৬৯ মাগুরা সদর থানা মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথ ভাবে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করি। ঐ যুদ্ধে ০৩ জন রাজাকার মারা যায়। আর বাকি রাজাকাররা পালিয়ে যায়।

শ্রীপুর বাহিনীর সাথে আমার বাহিনী নিয়ে

বরিশাটের (ইটখোলায়) যুদ্ধ : ৭ ই নভেম্বর শ্রীপুর বাহিনীর সাথে বরিশাটের গাংনালিয়া ও ইটের ভাটায় রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ করি। এবং দীর্ঘ সময় শ্রীপুর বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় যুদ্ধ করি।

শ্রীপুরের নাকোল বাজারের যুদ্ধ : ২৪ নভেম্বর আমি আমার সহযোদ্ধাদের নিয়ে আকবর হোসেন মিয়া ও মোল্লা নবুয়ত আলীর নেতৃত্বে নাকোল বাজারে অবস্থান করি। পাকিস্তানি সেনারা ক্যানালের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা আক্রমণ করি এতে পাক সেনাদের গাড়ি ক্যানালের নিচে পড়ে যায়। একজন কর্ণেল সহ (০৭) সাত জন সেনা নিহত হয়।

পুনরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কুটি বাড়ি ফিরে আসা : এরপর ২৫ নভেম্বর শ্রীপুর বাহিনী থেকে আমি আমার পূর্বের ক্যাম্প ধনেশ্বরগাতী কুটিবাড়ী চলে আসি।

কুচিয়ামোড়া বাজার আক্রমণঃ ৪ ডিসেম্বর কুচিয়ামোড়া বাজার আক্রমণ করে রাজাকারদের হটিয়ে দিই।

সহযোদ্ধাদের সাথে বেরইল গ্রামে অবস্থান : ৬ ডিসেম্বর সহযোদ্ধাদের নিয়ে বেরইল গ্রামে অবস্থান করি। মিত্র বাহিনী মাগুরাতে বিমান হামলা চালায়, আনসার ক্যাম্পের পাশে পেট্রোল ডিপো, পি.টি.আই এবং ভায়নাতে বোমা বর্ষণ করে। পেট্রোল ডিপোতে আগুন দেয়। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা বেলনগর হয়ে কামারখালী চলে যায়। যাওয়ার পথে ক্যানেলের ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়। মর্টারসেল মারতে মারতে পিছু হটতে থাকে। মিত্র বাহিনীর একটি ক্যাম্প বিধ্বস্ত হয়। ট্রাকে অবস্থানরত ০৭ জনের মধ্যে ০২ জন শহীদ হয় এবং ০৫ জন গুরুতর আহত হয়।

মাগুরা শহর শত্রু মুক্ত : ৭ ডিসেম্বর মাগুরা মুক্ত হয়, আমরা বিজয় উল্লাস করতে থাকি। নৌকা পাল তুলে দেরে পাল তুলে দে ....গানটি গাইতে গাইতে মাগুরাতে প্রবেশ করি, চারদিকে বিজয় উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে।

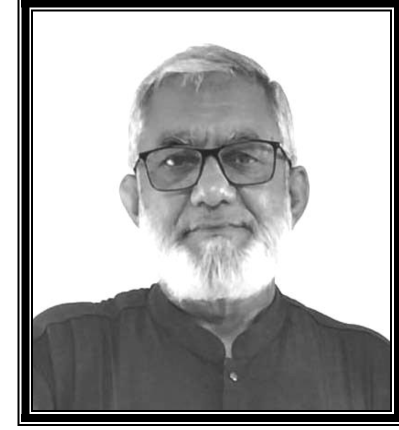
বিজয় উল্লাস : ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। বিশ্বের সেরা যোদ্ধা পাকিস্তানি বাহিনী

মিত্র বাহিনী, মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ০২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ০৯ মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাই লাল সবুজের পতাকা, পাই স্বাধীনতা। এরপর আমি আমার গ্রুপের কোন সহযোদ্ধাদের বাড়িতে যেতে না দিয়ে মরহুম জননেতা আসাদুজ্জামান এম.পি. এর অনুমতিক্রমে কাটাখালী মিলঘরে ক্যাম্প করি। পরবর্তীতে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ হলে মাগুরা নোমানী ময়দানে মিলিশিয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিই।

২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবদি পর্যন্ত

মাগুরার মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা : ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মাগুরা সদর উপজেলা কমান্ডের কোন সময় আহবায়ক এবং উপজেলা কমান্ডার হিসেবে বার বার নির্বাচিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছি।

নতুন প্রজন্মের জন্য আমার উপদেশ হচ্ছে তারা যেন এই দেশকে ভালোবাসে।



যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আহসান আলী খান

আমি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাজী মো. আহসান আলী খান (অবঃ)। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আর্মিতে কোর অব ইঞ্জিনিয়ারে নবীন সৈনিক হিসাবে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে, হোল্ডিং কোম্পানিতে ছিলাম। আমার হোল্ডিং নাম্বার ৪৬১৫, আমরা ৭৫ জন ছিলাম (ইঞ্জিনিয়ার, আর্টিলারী, আরমাড, সিগনাল ও এমওডিসি) প্রতিদিন রুটিন অনুসারে সকল কাজে অংশগ্রহণ করতাম। হোল্ডিং কোম্পানির হাবিলদার মেজর ছিল নুর মহাম্মদ (পাঞ্জাবী), প্লাটুন ও সেকশন কমান্ডার ছিল নায়েক রমজান আলী (পাঠান), নায়েক আনারগুল (পাঠান), ল্যান্স নায়েক আব্দুল মালেক (বাঙালি) দেশের অবস্থা ভালো না, সব সময় হরতাল কারফিউ থাকতো। সেনানিবাসে থাকলেও বাহিরের সংবাদ সব সময় রাখতাম। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দক্ষিণ পাশে বায়েজিদ বোস্তামী মাজার ও বাজার। আমি জাফর (ফরিদপুর), হারুন (কুমিল্লা), আজিজ (বগুড়া) ও আলী আহম্মেদ (নোয়াখালী) একই সাথে থাকতাম। বাঙালি ওস্তাদ মালেক প্রায় বলতেন দেশের অবস্থা ভালো না তাই আগামী ৭ই মার্চ ১৯৭১ ইং তারিখ রোজ রবিবার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জাতীর উদ্দ্যেশ্যে ভাষণ দেবেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষা করি। আমরা বাঙালি সৈনিকরা বেশ বুঝতে পারতাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা

আমাদের সাথে ভালো আচরণ করতো না। প্রায় সময় গন্ডোগোল হতো, এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হত। প্রায় সময় এর জন্য সাজা ভোগ করতাম। বাঙালিদের প্যাক ০৮ সবসময় ইট অথবা বালি ভরা থাকতো। আমাদের ব্যারাকটি ছিল একদম পাহাড় ঘেষা। পাশেই বড় ড্রেন ও কুয়া এবং একপাশে ফ্যামিলি কোয়াটার। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দরকার হলে ইবিআরসি অথবা সিনেমা হল ক্যান্টিনে যেতে হত। লাইন এলাকা হতে বাহির হতে হলে আমাদের জন্য গেইট পাস দরকার হতো। কিন্তু ওদের কিছুই লাগতো না। ৭ই মার্চ রবিবার সকাল হতে পুরো সেনানিবাস জুড়ে কেমন একটা থমথমে ভাব। হঠাৎ নির্দেশ জারি হয় যে, কোন বাঙালি রেডিও বা টেলিভিশন শুনবে না। সৈনিক লাইনে কারো রেডিও থাকার কথা না তবুও জোর করে সকলের কাববোর্ড চেক করা হল। আমরা বিকাল আড়াইটার দিকে লুকিয়ে ইবিআরসি এর ক্যান্টিনে গিয়ে, জানতে পারলাম টেলিভিশন চালানো বন্ধ।

চট্টগ্রাম রেডিও, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঢাকা রেডিও হতে রিলে করে শুনাবে। আমরা রেডিও শুনার জন্য অপেক্ষায়ই থাকলাম। রেডিওতে গানের মাঝে মাঝে কিছুক্ষনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। কিন্তু হঠাৎ গান বাজতে বাজতে রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। ব্যারাকে ফেরত আসার পথে আরপি চেক পোস্টে আমাদের আটকে দেয়। এর জন্য হাবিলদার মেজর সাজা দেয়। রাতে বিবিসি ও আকাশবানী কলকাতা হতে ঘোষণা দেয় পাক সরকার বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনানোর জন্য রাজি হয়েছে। আগামী ৮ই মার্চ সকাল ০৮:৩০ ঘটিকার সময় ভাষণ প্রচার করা হবে। ভাষণ শোনার জন্য আমরা বাঙালিরা অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিক মিলে ৫০ জন ইবিআরসি গ্যারিসন মসজিদ এলাকায় মাটি কাটার কাজে যাই। কাজের মাঝে বায়েজিদ বোস্তামী বাজার হতে মাইকে ঘোষণা দেয় যে এখন বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। ভাষণ শুরু হলে আমরা বাঙালিরা কাজ বন্ধ করে দাড়িয়ে যাই। এমন সময় ওস্তাদ আনারুল তেড়ে আসে। যখন বঙ্গবন্ধু বলেন যে "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, যার যা আছে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো" তখন আমরা সবাই এক সাথে গেতি বেলচা উঠিয়ে "জয় বাংলা" বলে শ্লোগান দেই। পাঞ্জাবী ওস্তাদ যারা ছিল সবাই তেড়ে আসে এবং উর্দুতে বলে

"তুম লোক শেখ বনগিয়া, জয় বাংলা মাত বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ বাতাও, তুম লোক হুসমে আজাও" কাজের শেষে ব্যারাকে আসার পর দেখি যত পাঞ্জাবী সৈনিক ছিল সকলে যেন আমাদের নতুন ভাবে দেখছে। বুঝতে পারলাম যে তাদের কাছে অপরাধী। ৭ই মার্চ ভাষণের পর হতে আমরা নতুন জীবনের খোঁজ পাই।

যে সকল বাঙালি সৈনিকরা ফ্যামিলিসহ সেনানিবাসের বাহিরে বসবাস করতেন তারা সেনানিবাসে এসে বলে যে বাহিরের অবস্থা মোটেও ভালো না। টাইগার পাস, নিউমার্কেট সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাঙালিরা কারফিউ না মেনে মিছিল সমাবেশ করছে। পাঞ্জাবীরা তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে, অনেক বাঙালিদের তারা মেরে ফেলেছে। এই অবস্থায় আমাদের করার কিছুই ছিল না। কারণ বাঙালি সৈনিকরা বাহিরে ডিউটিতে যেতে পারতো না। ২৩ই মার্চ হঠাৎ তিনটি হেলিকাপ্টার ইবিআরসি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে নামে। পরে জানতে পারি যে, ইবিআরসি সেন্টার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে এরেস্ট করে ঢাকাতে নেওয়া হয়। ২৫শে মার্চ সেনানিবাসের সব উঁচু পাহাড়ের উপর ভারি অস্ত্র বসানো হয়। প্রতিটি অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইবিআরসিতে ট্রেনিংরত বাঙালি সৈনিক ব্যারাক, হোল্ডিং কোম্পানির ও ফ্যামিলি কোয়াটার এর দিকে। অবস্থা দেখে আমাদের দম বন্ধ হওয়ার পথে। সকল গেইট বন্ধ। তখন আমরা আল্লাহকে স্মরণ করছি। আমরা বাঙালিরা মনে মনে চিন্তা করলাম যে সুযোগ পেলে ব্যারাক ছেড়ে পাহাড়ের ঐপারে চলে যাবো। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা বেলা রোলকল প্যারেডে রেজিস্টার অনুযায়ী নাম ডাকা হয়। সকল সৈনিক উপস্থিত হওয়াতে কোন প্রকার সমস্যা হয় নাই। সিএইচএম প্রতিদিনের ন্যায় অর্ডার শুনাই। হঠাৎ কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া প্যারেডে উপস্থিত হওয়ায় সিএইচএম একটু ঘাবড়ে যায়। কোম্পানি কমান্ডারকে প্যারেড হ্যান্ডওভার করার পর একপাশে সরে দাড়াই। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া সকলের মনের অবস্থা জানতে চায়। আমরা একসাথে আওয়াজ করে বলি যে, "ভালো আছি স্যার"। তিনি বলেন যে "খুব মন দিয়ে শুনবে গত ৭ই মার্চ হতে আমরা বাঙালিরা কিন্তু সব চোখে চোখে আছি। সেনানিবাসের সব উঁচু পাহাড়ে ভারি অস্ত্র লে আউট আছে, অতএব সতর্ক থাকবে, খোদা হাফেজ"। এবং প্যারেড শেষ করার আদেশ দিয়ে চলে যান। পরে

সিএইচএম বেশ কড়া ভাষায় বলে যে, "ক্যাপ্টেন সাব যো কুছ বাতাইয়া মুঝে মালুম নেহি, মেরি বাথ ধ্যানসে শুনলো প্যারেড খতমছে কোই আদমি বাহার নেহি জাওগি, আপনা বেডপর যা কর আরাম কর গি, আপনা কামরামে কোই বাতি নেহি জালেগি, মেরি বাথ বর খেলাপ হোনেসে সারেকো বহুত সাজা মিলেগি"। আমরা লক্ষ করি যে সিএইচএম এর চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ের ছাপ ফুটে উঠে। প্যারেড শেষে যে যার রুমে চলে যাই। বার বার ভূঁইয়া সাহেবের কথা মনে পরছিল। ভারি অস্ত্রের কথা কি বুঝাতে চেয়েছিল! অন্যদিন আমাদের সৈনিক লাইনে বাঙালি পাঞ্জাবী মিলে ডিউটি পড়তো, কিন্তু আজ উল্টো। রাত আনুমানিক এগারোটার দিকে দেখি যে, সিএইচএম ও লাইন ডিউটির পাঞ্জাবী সৈনিকরা অস্ত্র হতে ডিউটি করছে। আমরা কিন্তু তখন কোন কিছুই অনুভব করতে পারি না,শুধু মনে হচ্ছিলো বাঙালি সৈনিকদের বাদ দিয়ে এসব করার কারণ কি? একসময় বুঝতে পারলাম যে লাইন ডিউটি প্রহরি বাহির হতে সব দরজার সিটকিনি আটকিয়ে দেয়। তখন মোটামুটি বন্দি বলে সবাই ধরে নিলাম আমরা। কিছুক্ষণ পরে ইলেকট্রিক মেইন সুইচ অফ হয়ে যায়। তখন মনে হয় এবার বুঝি আমাদের উপর কোন বিপদ নেমে আসবে। ২৫শে মার্চ রাত বারোটা বাজার কয়েক সেকেন্ড পরই, ইবিআরসি কোয়াটার গার্ড রুম হতে হোল্ড হ্যান্ডস আপ আওয়াজ আসে এবং সাথে সাথে গুলির আওয়াজ আসে। তখন "বাবাগো মাগো চিৎকার" করে উঠে বাঙালিরা। পাহাড়ের উপর রাখা অস্ত্রগুলোর ফায়ার শুরু হয়। তখন আমরা ঝটপট যার যার রুমের পিছনের জানালার কাচ ভেঙে গ্রিল টেনে বাঁকা করে রুম হতে বাহির হয়ে মৃত্যুকে ভয় না করে গোলাগুলির ভিতরেই পাহাড়ের ঐপারে চলে যাই। তখন সিএইচএম নুর মোহাম্মদ চিৎকার করে বলে "ইন্ডিয়ানে এটাককিয়া শের মাত উঠাও, সো জাও"। পাহাড় এর উপর হতে যতদুর নজর যায় বন্দুকের ব্যারেলের আগুনের ফুলকি আর ফুলকি। আমাদের ব্যারাক সহ সব বাঙালি ব্যারাকগুলি আগুন ধরে যায়, ধারণা করি যে যারা বাহির হতে পারে নাই সবাই পুড়ে মারা গেছে। ব্যারাক হতে বাহির হওয়ার সময় আমার পরনে হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা খালি পায়ে, পাহাড়ের নিচে একটু আড়ে সবাই একত্রিত হই। ওস্তাদ মালেক একটা হিসাব করে হোল্ডিং কোম্পানির অর্ধেক বাহির হতে পারেনি। মর্টারের গোলা পাহাড় এর মধ্যে পড়তে শুরু করে। আমরা অন্ধকারে পাহাড় এর কোন দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছিলাম না। অনেক দূর হতে

ফজরের আযান শোনা যাচ্ছিলো।

রাস্তায় অনেক বাঙালি আহত সৈনিকদের সাথে দেখা হয়। অনেকেই আহত, শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। পাহাড়ী কাঁটা, লতা-পাতায় আমাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। আযানের পরেই মাইকে প্রচার হয় যে, সেনানিবাস হতে যে সকল বাঙালি সৈনিক ভাইরা বাহির হয়ে পাহাড় এর ভিতর পথ হারিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন সবাই ভাটিয়ারী দিকে চলে আসেন। ২৬শে মার্চ পূর্ব আকাশ পরিষ্কার হলে দিক ঠিক করে হাটা শুরু করি। রাস্তায় আওয়ামীলীগ এর উদ্ধার কর্মীর সাহায্যে সমতল ভূমিতে আসি। সেখানে প্রথমিক চিকিৎসা ব্যাবস্থা থাকায় আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা নেই। উপস্থিত আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীরা যথেষ্ট সাহায্য করে এবং বলে যে, আপনারা আল্লাহর মেহেরবানীতে মৃত্যুর হাত থেকে ফেরত এসেছেন। তখনো পাক বাহিনী সেনানিবাস এলাকা হতে বাহির হয়ে অন্য জাইগায় যায়নি। জানতে পারলাম অপারেশন সার্চ লাইট ঘোষণা করে সারাদেশে নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করেছে। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আমি, জাফর ও আজিজ সহ ভাটিয়ারী বাজার থেকে সাগরের দিকে একটা পুকুর পাড়ে যাই। উভয়ের মধ্যে আলোচনা করি দেশের যে অবস্থা আমরা দেশের বাড়ি যেতে পারবো না, তাই সিদ্ধান্ত নেই যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা বাড়ি যাবো না। পাড়ার লোকজন জানতে চায়, আপনারা কিভাবে সেনানিবাস হতে বাহিরে আসলেন? যারা আসতে পারে নাই তাদের কি অবস্থা? আমরা যতটুকু জানি যে, বাঙালিদের ব্যারাকগুলোতে গুলি করে ঘুমন্ত অবস্থাই মেরে ফেলে। হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হয় যে, যে সকল সৈনিক ভাইয়েরা সেনানিবাস হতে এসেছেন সবাই রাস্তার পাশে অপেক্ষা করেন। আওয়ামী লীগের সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা বাস ট্রাক নিয়ে সকলকে একত্র করার ব্যাবস্থা নিয়েছে। মনে অনেক সাহস পেলাম। এমন সময় একটি দশ বারো বছরের ছেলে ছুটে আসে এবং বলে "কাকু আপনাদের সারাদিন খাওয়া হয়নাই, আমরা হিন্দু যদি ইচ্ছা করেন আসেন আমাদের বাড়িতে খাবেন"। সত্যি বলতে কি সারাদিন না খাওয়া, ভাত সামনে পেয়ে আনন্দে চোখ বেয়ে পানি পড়ে এবং আত্মীয় স্বজন এর চেহারা ভেসে ওঠে। খাওয়ার পর রাস্তার ধারে আসি, বাংলাদেশ এর মানচিত্র খচিত পতাকা লাগানো তিনটি মানুষ ভর্তি ট্রাক আসে। ট্রাকে উঠে বসার পর কোথায় যে গেলাম আমি জানি না। মাইক এ

ঘোষণা আসে যে, কুমিল্লা সেনানিবাস হতে পাক আর্মি আসছে চিটাগাং ধ্বংস করার জন্য। ২৬শে মার্চ শুক্রবার বিকালে ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূইয়ার নেতৃত্বে কুমিল্লা টিবি হাসপাতালে যাই। সেখানে তিনি ব্রিফিং দেয় যে, কুমিল্লা সেনানিবাস হতে ৫৩ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকাবাল সফি মুভ করেছে সাথে আছে ২৪ ফ্রন্টিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ডিটাচমেন্ট, ৮৮ মর্টার ব্যাটারী সাথে আসছে। পাকিস্তানি বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন সুবিদের অধিনে কুমিরায় ফাঁদ পাতা হয়। স্থানীয় জনগণ, সেনাবাহিনী সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, ছাত্রজনতা, নিয়ে বাম দিকে সমুদ্র ডানদিকে পাহাড় ও ঘন গাছ, মাঝখানে চট্টগ্রাম এর রাস্তা। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০০ জন। জনগণ ছিল কয়েক শত। অপেক্ষায় থাকি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার দিকে পাক আর্মির কনভয় আমাদের ফাঁদ এলাকায় আসে। তারা গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ব্যারিকেট সরাতে থাকে। আমাদের ফায়ার রেঞ্জে আসলেই ফায়ার শুরু করি। তারা এদিক ওদিক পালানোর চেষ্টা করে। যেদিকে যায় সেইদিকেই জনগণ এর কাছে বাধা পায় এবং যার কাছে যা ছিলো তাই দিয়ে আঘাত করে। শেষে পাক বাহিনী পালাতে বাধ্য হয়। পাক বাহিনীর প্রায় ১৫০ জন মারা যায়। আমাদের শহীদ হয় ১৪ জন। বিরাট এই শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে আমাদের মনে ছিল ক্ষোভ ও আবেগ। আপারেশন শেষে আমরা গাড়িতে চট্টগ্রামের দিকে যাই এবং হাজী ক্যাম্পে বাকি রাতটুকু কাটাই। সারারাত বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের ফায়ারের শব্দ আসে। সকাল বেলা হাজী ক্যাম্পে একজন বিহারীকে পাওয়া যায়। পাবলিক তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ২৭শে মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ইপিআর (সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) নিজের পরিচয় দিয়ে সবার সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, জাতি আজ বিপদের মধ্যে। পাক বাহিনী আপারেশন সার্চ লাইট ঘোষণা দিয়ে নিরস্ত্র জনগণের উপর আক্রমণ করে। আপনারা এখানে যারা আছেন সবার বাড়ি নিশ্চয়ই নদীর ওপারে।

গতকালের প্রতিরোধ আমাদের মনে অনেক সাহস যুগিয়েছে, আমরা কোন অস্ত্র নিয়ে আসতে পারি নাই। ইপিআর এর কিছু অস্ত্র আছে তাই দিয়ে আমাদের পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের কয়েকটি প্লাটুনে ভাগ করা হয়। আমি ১নং প্লাটুনে পড়ি। অস্ত্র সংগ্রহ করার পর গাড়িতে করে সিতাকুন্ডে আসি। ১নং

প্লাটুনের ৩নং সেকশন আমি, জাফর, আজিজ ও আরো সাত জন ছিলাম। আমরা রেললাইন ছেড়ে সাগরের কিনারা দিয়ে হাটা শুরু করি এবং হঠাৎ ফায়ারের আওয়াজ শুনি, দেখি যে চারিকদিকে জনগণ ছুটাছুটি করছে। সেই সাথে আমরাও সাগরের দিকে দৌড়ে পানির কিনারায় আসি এবং হাত দিয়ে বালি সরিয়ে গর্ত করে পজিশনে যাই। কিছুক্ষন পরেই জোয়ার শুরু হলে পানির ধাক্কায় ভেসে কিনারার দিকে যাই। ভাসতে ভাসতে অনেক দূর যাই এবং কতক্ষণ এই অবস্থা ছিলাম বলতে পারবো না। চরে মরা গাছে আটকানো অবস্থায় গ্রামের লোকজন আমাদের সাহায্য করে। রাতে একটা প্রাইমারী স্কুলে আমরা অবস্থান করি। ২৮শে মার্চ গাড়ীতে অস্ত্রসহ মিরশরাই চেকপোস্টে আসলে আর্মি ও পুলিশের কিছু সদস্য আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে রাখে এবং রেজিস্টারে নাম লেখায়। অল্প সময়ে অনেক সৈনিক উপস্থিত হয়। ঘোষণা হয় যে, শুভপুর ব্রিজ মুক্ত করার জন্য, আমাদের করেরহাট দারোগা বাজার পাঠানো হয়। সেখানে সেনা, পুলিশ, মুজাহিদ, ছাত্র, ইপিআর ও সাধারণ জনগণ একত্রিত হয়। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং এ বলেন যে, আজ বিকাল ৩ ঘটিকার সময় ইপিআর এর মর্টার প্লাটুন হতে ফেনীর দিকে শুভপুর ব্রিজে এক রাউন্ড গোলা ফায়ার করা হবে। তখন সবাই আল্লাহু আকবর, জয় বাংলা বলে ফায়ার করতে করতে উপরের দিকে অগ্রসর হবে। আমরা ব্রিজের দারগা বাজার সাইডে সুবেদার মেজর ফকর উদ্দিন ইপিআর এর নির্দেশ অনুযায়ী পজিশন নেই। যথা সময়ে মর্টার এর এক রাউন্ড গোলা ফায়ার হয়। সাথে সাথে আল্লাহু আকবর ও জয় বাংলা আওয়াজ দিয়ে ফায়ার করতে করতে সামনে অগ্রসর হই। পাক সেনারা ব্রিজের এভাটমেন্ট এ পজিশন এবং আমরা নিচে পজিশন নেই। শত্রুর গুলি কানের পাশ দিয়ে মাথার চুল টাচ করে শো শো করে চলে যায়। আল্লাহর ইচ্ছাই শরীরে লাগে নাই। আল্লাহ যেন গুলির গতি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন। মৃত্যু, বড়ই ভয়ংকর, খুব কাছে থেকে দেখেছি, অনুভব করেছি, সব যুদ্ধই ছিল ভয়াবহ। সময় না হলে মৃত্যু হয় না। এই যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর ৭ জন ধরা পড়ে। জনগণ তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলে। আমাদের দুই জন মারা যায়। তারা হলেন নায়েক হাসেম ইপিআর ও লুৎফর ইপিআর। তাদের করেরহাট বাজারে করব দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সবাই করেরহাট স্কুলের মাঠে (দারোগা বাজার ও রামগড় রাস্তার মাঝে) একত্রিত হয়।

রাতে খাবার পর সুবিদ আলী ভূইয়া বলেন যে, এই স্থান নিরাপদ না। যেকোন সময় আক্রমণ হতে পারে তাই আমরা রাতটুকু অন্য জায়গায় কাটাবো। আমরা কয়েকজন একটা ট্রাকে করে রামগড় রোডে গেলাম। যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ইপিআর চেকপোস্টে গাড়ি থামায় এবং বলে যে, সামনে আর গাড়ি যাবে না। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ি এবং বাকি রাত ওই ক্যাম্পেই থাকি। রামগড় ইপিআর ক্যাম্প কমান্ডার ওয়ারলেস এর মাধ্যমে সিনিয়রকে আমাদের কথা জানায় পরবর্তী আদেশ এর জন্য। ২৯ মার্চ সকালের নাস্তার পর পরই করেরহাটের দিক হতে ৭/৮ টা চাঁদের গাড়ী আসে। ওই গাড়ীতে আমরা বসি। লেঃ অলি আহমেদ এর নির্দেশে রামগড় চা বাগানে কিছুক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করার পর রামগড় থানা মাঠে এসে থামে। ওইখানে সমস্ত সৈনিক ফলিন হই। তালিকা সহ অস্ত্র গোলাবারুদের হিসাব করা হয়। মোট জনবলকে তিনটি প্লাটুনে ভাগ করা হয়। আমি ১ নং প্লাটুনে পড়ি। প্লাটুন কমান্ডার ছিল বাহাদুর। আমাদের সেকশনের ডিউটি পড়ে রামগড় হতে হেকো, কয়লা শহীদ বাজার, দাত মারা বাজার পর্যন্ত। গাড়িতে করে টহল দেই। যে সকল জনগণ বাড়ি ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য তাদের মালামাল যেন সন্ত্রাসীরা কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য আমরা ডিউটি করতাম। আমি ওই সেকশনে টুআইসির দায়িত্ব পালন করি। দুইদিন টহল ডিউটি করার পর আমরা চেঞ্জ হই। পরবর্তিতে আমাদের দায়িত্ব পড়ে রামগড় থানার নিচে ফেনী নদীতে জনগণ কে পারাপারে সাহায্য করা। এই রকম চলতে থাকে। ৫ এপ্রিল সকালে মাঠে মেজর জিয়ার নির্দেশে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান অষ্টম ব্যাটালিয়ান এর একটি কোম্পানী নিয়ে পানি পথ মহালছড়ি-রাঙ্গামাটি নিরাপদ রাখার জন্য। বিকাল বেলা অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ ৭-৮টা চাঁদ এর গাড়ী করে রামগড় থেকে পাতাছড়া, গুইমারা, বড় পিলাক, সিন্ধুকছড়ি, ধুমনিঘাট ও পংক্ষিমুড়া হয়ে মহালছড়ি থানায় আসি। মাহালছড়ি থানায় আসার পর আমরা আদেশ পেলাম এলএমজি ও এমজির গুলি বেল্টে লোড করার জন্য। রাতের খাওয়ার কোন ব্যাবস্থা হলো না কোন রকম রাত কাটাই। ৬ এপ্রিল সকালে থানাতে রান্নার ব্যাবস্থা হয়। খাওয়ার পর নদী ঘাটে কয়েকটি লঞ্চ ও দেশী ইঞ্জিনচালিত বোট-এ করে মহালছড়ি ও রাঙ্গামাটি পানি পথ নিরাপদ রাখার জন্য বাহির হই। অনেক রাতে হঠাৎ লঞ্চ থেমে যায়। সারেং বলে যে সামনে রাঙ্গামাটি জলজান ঘাট পাক সেনারা ডিউটিতে আছে। তখন ক্যাপ্টেন

খালেকুজ্জামান এর নির্দেশে লঞ্চ পিছনে ঘুরিয়ে চাকমা রাজার ঘাটে থামে। নিরাপত্তার জন্য ডিউটি দিয়ে বাকিরা রেস্ট করে। ৭ এপ্রিল শনিবার ভোরবেলা সবাই জেগে লঞ্চে বসে হাত মুখ ধুই। আমার পাশেই ইপিআর এর একজন সৈনিক ব্রিটিশ এলএমজি নিয়ে বসা ছিল, লক্ষ করলাম হাত মুখ ধোলাই করলো না। লঞ্চে বসেই বা হাত দিয়ে পানি নাড়াচাড়া করছিল। এবং মাঝে মাঝে হাত ভিজিয়ে চোখে মুখে পানি দিচ্ছিল এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব চিন্তিত। এমন সময় বেশ দূরে ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে। প্রথমে মনে হল ইঞ্জিনচালিত বোট। ক্যাপ্টেন সাহেব ও সারেং ভালো করে দেখে এবং বুঝতে পারে যে পাক বাহিনীর একটা লঞ্চ। সাথে সাথে আমরা লঞ্চ ছেড়ে দিয়ে পাড়ে পজিশনে যাই। পাকিস্তানি লঞ্চটি আমাদের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে যায়। সেখান থেকে আমাদের লঞ্চ লক্ষ করে রকেট ফায়ার করে। ফলে আমাদের লঞ্চটি ডুবে যায়। কোন প্রতিউত্তর না পাওয়ায় পাক সেনারা ফিরে যায়। সবাইকে একত্রিত করার পর ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে, সেদিন রাতে লঞ্চ নিয়ে ফেরত আসাতে পাক বাহিনী চারিদিকে টহল জোরদার করে। দুপুরের পর দুইটি মাছ ধরা জেলে নৌকা ব্যবস্থা করি। নৌকার মাঝিরা ছিল সবাই সিলেটি। তাদের মাছ ধরা সাহায্য করি এবং চারিদিকে খেয়াল করে রাঙ্গামাটির দিকে যেতে থাকি। পাক বাহিনীর একটি স্পীডবোর্ড আমাদের নৌকার দিকে আসতে দেখে মাঝি ইশারায় বুঝায় পতাকা দেখিয়ে “পাকিস্তান, পাকিস্তান হায়”। তারা কাছে না এসে অন্যদিকে চলে যায়। আমাদের বহনকারী নৌকা রাঙ্গামাটির দিকে চলতে থাকে। বিকালে পাক বাহিনীর তিনটি স্পীডবোট আমাদের নৌকা থামায় এবং কাছে এসে চেক করার জন্য একজন পাক সেনা আমাদের নৌকায় আসে। মাঝি তাকে বুঝায় যে “হাম পাকিস্তান হেই” সাথে পাকিস্তানি পতাকা দেখায়। অন্য বোট থেকে একজন হাবিলদার বলে “ঠিক হেয় তুম জাও, জয় বাংলা মুক্তি দেখা তো মুঝে বাতাইয়ে, তুম মুসলিম, ম্যায় মুসলিম, তুম মেরা দোস্ত হেয়”। আমারা পাটাতনের নিচে থেকে সব কিছু অনুভব করছিলাম এবং প্রস্তুত ছিলাম। সবাই যদি নৌকায় উঠে তাহলে আক্রমণ করবো। পাক সেনারা চলে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে, দুইবার বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছি এবার আমাদের নৌকা ছেড়ে দিতে হবে। আমরা সন্ধ্যার আগে নানিয়ার চর রাঙ্গামাটি নদীর মাঝপথে অবস্থিত বুড়ির হাট টিলায় অবস্থান নেই। বুড়ির হাট টিলার তিন দিকে পানি একদিকে নালা তারপর

হলো জঙ্গল। সারা রাত জোঁক ও মশার সাথে যুদ্ধ করতে হয়। ৮ এপ্রিল ভোরবেলায় ক্যাপ্টেন সাহেব বলেন যে "এই টিলায় থাকতে হবে, সকলে সতর্ক অবস্থায় থাকবে এবং চারিদিকে লক্ষ রাখবে শত্রু এর চোখ হতে বাঁচার জন্য বেশি চলাফেরা করা যাবে না, গাছের নিচে ঝোপ ঝাড়ের পাশে অবস্থান করবে"। আনুমানিক বেলা দুইটা তিনটার দিকে পাকিস্তান সেনার কমান্ডো ব্যাটেলিয়ান এর দুই কোম্পানী সৈনিক সাতটা স্পীডবোড ও দুইটি লঞ্চ নিয়ে বোট বুড়ির হাট এর দিকে আসতে থাকে। আমাদের অবস্থান টের পেয়ে তারা অতর্কিত আক্রমণ করে। পাক সেনাদের লঞ্চে তিন ইঞ্চি মর্টার বসানো ছিল। এক সময় আমাদের অবস্থানের উপর মর্টার সেল ফেলা শুরু করে। ছোট টিলায় আমাদের অবস্থা হয়েছিল খই মুড়ি ভাজার মত। শেষে ক্যাপ্টেন অর্ডার দেয় পিছনে নিরাপদ এ অবস্থান নিতে। আমরা যারা রাইফেল ম্যান ছিলাম সবাই নালা পার হয়ে অবস্থান নেই। ইপিআর এর এলএমজি ম্যান মুন্সি আব্দুর রউফ (বীরশ্রেষ্ঠ) ফায়ার দিয়ে পাক সেনার সাতটা স্পীডবোর্ড অকেজো করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে তারা পিছনে চলে যায় এবং পুনরায় মর্টার সেল ফেলা শুরু করে। হঠাৎ একটি সেল মুন্সি আব্দুর রউফ এর গানের উপর পড়ে এবং সাথে সাথে ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। একা কভারিং ফায়ার দিয়ে এবং নিজের জীবন দিয়ে সকলের প্রাণ রক্ষা করেন। তার দেহের শত শত টুকরোগুলো একত্রিত করে বুড়ির হাটে সমাহিত করা হয়। মুন্সি আব্দুর রউফ আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যার যার অস্ত্রসহ বন, জঙ্গল, পাহাড়, টিলা, ঝরনা পার হয়ে পায়ে হেটে নয়নছড়ি পৌঁছাই। চাকমাদের সাহায্যে দেশি নৌকা করে মহালছড়ি থানায় পৌঁছাই ভোর রাতে। ৯ এপ্রিল আমরা কয়েকজন মাহালছড়ি থানার কোত ভেঙে কিছু গুলি নিয়ে রামগড় আসার জন্য প্রস্তুত হই। ১০ এপ্রিল আমরা রামগড় থানায় পৌঁছাই। ক্যাম্প কমান্ডার লেঃ অলি আমাদের সব বিষয়ে অবগত হয়ে বলেন যে পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে সন্ধ্যার কিছু আগে ফলিন এর আদেশ আসে সবাই একত্রিত হলে আদেশ শুনানো হয় যে, গত ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলা বিশাল আমবাগানে সৈয়দ নজরুলকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করে, তাজউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুনসুর ও কামরুজ্জামান কে নিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছে। কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী কে প্রধান সেনাপতি করে যুদ্ধ পরিচালনা

করার জন্য দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী নিয়ে এক নম্বর সেক্টর গঠন করে। ১নং সেক্টর কমান্ডার হিসাবে মেজর জিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া আদেশ দেন যে, করের হাট রামগড় সড়কে রোড ব্লকের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সতর্ক ব্যাবস্থা নিতে হবে। ৩নং সেকশন কমান্ডার মোজাম্মেলের সাথে আমি সেকশন টুআইসি রামগড় চা বাগানে অবস্থান নেই। ২৪ এপ্রিল আনুমানিক একটা দেড়টার দিকে চা বাগানের উপর সেলিং শুরু হয়। ভাবগতি দেখে কমান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক পাশে ফেনী নদী পার হয়ে ভারতের সাব্রুম এলাকায় প্রবেশ করার সময় ভারতীয় বাহিনী বাধা দেয় এবং ফায়ার শুরু করে। তখন আমরা বাধ্য হয়ে অস্ত্রসহ হাত উঠিয়ে আওয়াজ করতে থাকি, "জয় বাংলা, জয় বাংলা"। শেষে বন্ধু হিসাবে আমাদের গ্রহণ করে। প্রচন্ড সেলিং হচ্ছিলো। কিছু কিছু গোলা ভারতের মাটিতেও পরতে থাকে। তখন আমরাও ভারতীয় বিএসএফ একসাথে ফায়ার করতে থাকি। ফায়ার শেষে আমরা কোন দিকে যাবো কোন নির্দেশনা না পেয়ে সাবরুম বাজারে একটা চায়ের দোকানে বসেছিলাম। আনুমানিক রাত সাত ঘটিকার সময় মাইকে ঘোষণা হয় যে, "সকল বাঙালি সৈনিক বাজারে এদিক ওদিক আছেন সবাই পাকা রাস্তায় চলে আসেন" সকলে পাকা রাস্তায় আসার পর ভারতীয় বাহিনীর সেনাবাহিনীর শক্তিমান গাড়ী, লরি করে প্রায় ত্রিশ মিনিট চলার পর এক জায়গায় গাড়ী থামে। সেখানে অনেক চেনা জানা মানুষের সাথে দেখা হয়। জানতে পারলাম এটি এক নম্বর হেড়কোয়াটার, এলাকার নাম হরিণা। ২৫শে এপ্রিল সকালে আমরা সবাই ফলিন হই। সেক্টর এডজুটেন্ট আদেশ যে, আজ সন্ধ্যার ভিতর নিজেদের থাকার জন্য টিলা কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে ঘর তৈরি করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। ভারত সৈন্যের গেতি বেলচা দিয়ে কাজ শুরু। ২৬শে এপ্রিল সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া ক্যাম্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে আমার একটি স্পেশাল ভলেন্টিয়ার প্লাটুন দরকার, এই প্লাটুন ফেনী সোনাপুর যাবে একটি বিশেষ অপারেশনে। যদি ওই এলাকার কেউ থাকে তাহলে ভাল হয়। আমরা কয়েকজন লাইন হতে আগে আসলাম, মেজর জিয়ার নির্দেশ মোতাবেক তালিকা তৈরি করা হয়। অর্ডার হলে এই দল সি টাইপ অস্ত্র সহ রেডি থাকবে। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে যেন এরা মুভ করতে পারে। ২৭ এপ্রিল একজন

ক্যাপ্টেন (নাম মনে নাই) সাথে মেজর জিয়া সাহেব ব্রিফিং করেন যে, এই দল নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া ও ভারতের আমলী ঘাট বিএসএফ বিওপি তে যাবে। সেখান থেকে গাইড এর সাহয্যে বাংলাদেশে গাইড এর মাধ্যমে প্রবেশ করবে। আদেশ পাওয়ার পর বিকাল বেলা অস্ত্রসহ শক্তিমান লরিতে করে রাত আনুমানিক ৭টার দিকে আমলীঘাট বিওপি তে পৌঁছাই। খাওয়ার পরে দেখি যে মেজর জিয়া ও লেঃ অলি আমাদের একজন গাইড দিলেন এবং বললেন যে, এই দল ফেনী সোনাপুর গ্রামের একজন কুমিল্লা সেনানিবাসে বন্দি ডাক্তার ক্যাপ্টেন এর ফ্যামিলিকে উদ্ধার করতে। সেকশন কমান্ডার নায়েক বশির ইপিআর এর নেতৃত্বে চলা শুরু করলাম গাইড এর পিছনে। মেঘলা রাত রাস্তাঘাট কাদাময়, চলতে চলতে ভোরের আযান শুরু হয়। আমরা চলা বন্ধ করে নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিই। আকাশ পরিষ্কার হলে একটি টিনের খালি বাড়ির ভিতরে আমরা অবস্থান করি। গাইড বলে যে, এই গ্রামে কোন জনগণ নেই সবাই ভারতে চলে গিয়েছে। আমরা নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষা করে পাহারায় থাকি আনুমানিক আড়াইটার দিকে খাবারের ব্যাবস্থা হয়। সবাই খাবারের জন্য রেডি হই, এমন সময় সিএন্ডবি রোডের দিক হতে এলোপাতাড়ি ফায়ার শুরু হয়। আমরা খাওয়া ফেলে ওই স্থান ত্যাগ করি। ফেনী নদীর পাড়ে আড় দেখে অবস্থান নেই এবং দশ দিন ওই এলাকায় থাকি এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। কিভাবে টারগেটে পৌছানো যায়। আমাদের গাইড আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। ৬মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা ওই বাড়িতে পৌছাই এবং বাড়ির মালিক চাচা কে সবকিছু খুলে বলি। তিনি আমাদের খাওয়া থাকার ব্যাবস্থা করে। আমরা ওই রাতের মধ্যেই ছাদের উপর এলএমজি পোস্ট সহ নিচে ব্যাংকার তৈরি করি। ৮ মে পাক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার আমাদের পজিশনের উপর দিয়ে উড়ে যায়। এলএমজি বসানোর আগেই হেলিকপ্টারটি রেঞ্জের বাহিরে চলে যায়। পুনরায় আসবে এই আশায় এলএমজি তাক করে বসে থাকি। বিকাল বেলা গ্রামের কয়েকজন মুরুব্বি আসে এবং বাড়ির মালিক চাচার সাথে আলাপ করে, তারা বলে যে, মুক্তিযোদ্ধারা আসার পরেই পাকিস্তানি হেলিকপ্টার আমাদের এলাকায় আসে মনে হয়, তারা আবার আসবে। মনে রাখবেন আপনার ব্যাক্তিগত সুবিধার জন্য যেন আমরা অসুবিধায় না পড়ি। মুরুব্বিরা বিদায় হলে চাচা বলেন, "বাবাজিরা হোন হেতারা আইয়া একখানা অভিযোগ করচে বুজেন্নি, গা গেরামের ব্যাপার বুজেন্নি আন্নারা

অ্যার তুন জানগা আল্লাহ ভরসা হেতি যা করেন অ্যাঁয় নো চাই আমার ইন গেরামের ক্ষতি হয়"। তিনি আমাদের উপর ছেড়ে দিলেন যা করার তাই করেন। আমরা চাচাকে বুঝালাম গ্রামের লোক অনেক কিছু বলবে। চারিদিকে সংবাদ নিই কোন দিকে যাবো। ১২মে সকাল থেকে আকাশ অন্ধকার সাথে বৃষ্টি। আমরা সবাই ঘরে বসা, এমন সময় একটা ছেলে সংবাদ দেয় ফেনী দিক থেকে পাক সেনারা আসছে। আপনারা ঘেরা পড়েছেন। সাথে সাথে আমরা বাড়ির সকলকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যাই। হাটতে হাটতে সিএন্ডবি রোড ক্রস করার সময় আমাদের উপর ফায়ার আসে। আমাদের জানা ছিল সিএন্ডবি রোড মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। আমরা আওয়াজ করি জয় বাংলা বলে কিন্তু ফায়ার কিছুতেই থামে না। শেষে আমরা সামনে অগ্রসর না হয়ে পিছনে এসে আড় নিয়ে অপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ পরেই দূরে আর্টিলারী ফায়ার শুরু হয় ফেনীর দিক থেকে। তখন আমরা নিরাপদ মনে করে যাত্রা শুরু করি। কিছুক্ষণ হাটার পরেই সিএন্ডবি রোড ক্রস করার সময় আমরা ফায়ারের মধ্যে পড়ে যাই। তখন আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। ক্ষুদ্র অস্ত্রের সাথে টু ইঞ্চি মর্টার ফায়ার হচ্ছিলো। এই সময় আমার বাম পায়ে রানে সামনের দিক থেকে আসা গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়, সেই সাথে মর্টারের স্প্রিন্টার বা পায়ের গোড়ালী ও পিঠে লাগে। আহত অবস্থা জনগণ ও আমার সাথীরা আমাকে আমলীঘাট বিওপি তে নেয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়ার পর মেজর জিয়ার আদেশক্রমে আমি সহ কয়েকজন আহতকে আগরতলা জিবি (গোবিন্দ বল্লব) ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িতে হাসপাতালে পাঠায়। রাত বারোটার দিকে পৌছালে ওটি তে নিয়ে ক্ষতস্থান গুলো পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করার পর ওয়ার্ড এ নেওয়া হয়। আমরা যে ওয়ার্ড এ ছিলাম সেই ওয়ার্ড স্পেশাল মুক্তিযোদ্ধা ওয়ার্ড নামকরণ করা হয়। জিবি হাসপাতালে একমাস চিকিৎসা নেওয়ার পর ডিসচার্জ করলে ১নং সেক্টর হেড কোয়াটার হরিনা যাই। সেখানে এক সপ্তাহ থাকার পর পুনরায় ক্ষতস্থানে পুঁজ জমে এবং যন্ত্রনা শুরু হলে আগরতলা হেড কোয়াটার বিডিএফ আসি। পরের দিন জিবি হাসপাতালে আউট ডোর রুগী হিসাবে ক্ষতস্থান দেখাই। ডাক্তার ভৌমিক চৌধুরী বলেন যে, দুই দিন পর পর ড্রেসিং করাতে হবে এবং মেডিসিন খেতে হবে। কয়েকবার এইভাবে জিবি হাসপাতালে যাই। ১৫ই মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আগরতলা শরনার্থী শিবির পরিদর্শন করতে আসলে ওই দিন তিনি,

মুক্তিযোদ্ধা স্পেশাল ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। তিনি প্রতিটি রুগীর সাথে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা ছিলেন। এটা তখন ভিডিও হচ্ছিল। হেড কোয়াটার বিডিএফ এর অবস্থা ছিল ৯৩ বিএসএফ হেডকয়াটার এলাকায় (শাল বাগান ও গান্ধী গ্রাম) হেড কোয়াটার বিডিএফ সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী থাকতেন। ওইখানে একটি হাসপাতাল গঠন হয়। বিভিন্ন সেক্টর এর যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে নিহত ও আহতদের আনা হত। বিডিএফ হেড কোয়াটার ট্রানজিট হিসাবে ব্যাবহার হতো। আমরা আহতরা হালকা কাজ করতাম। মাঝে মাঝে খুব ব্যাথা করতো এবং এর ফাঁকেই দুই সপ্তাহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারী রেজিমেন্ট এর, মর্টার প্লাটুনে ৮২ এমএম মর্টার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এক সময় পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। তখন হেড কোয়াটার বিডিএফ হাসপাতালে ১৮-০৬-১৯৭১ তারিখ হতে ২০-১০-১৯৭১ পর্যন্ত চিকিৎসা নেই। বিডিএফ এডজুটেন্ট রোলকলে বলেন যে, আহত যারা এখানে আছে তারা সকলে যে যার সেক্টর তালিকাই নাম থাকবে। এই আদেশ হবার পর আমি আর সেক্টর হেড কোয়াটারে যাইনি। দেশ স্বাধীন হবার পর জেনারেল উসমানী সহ বিডিএফ হেড কোয়াটার এর সাথে কুমিল্লা হয়ে ঢাকা সেনানিবাসে আসি। কয়দিন থাকার পর আদেশ হয় সবাই এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি যেতে পারবে। ঢাকা হতে বাড়ি আসতে তিন দিন সময় লাগে। বাড়ি ফেরার পথে দেখি রাস্তাঘাট, গ্রামগঞ্জ সবকিছুই বিধ্বস্ত। গ্রামে আসলে সবাই দেখতে আসে এবং সবাই জানতে চায় কিভাবে গুলি লাগে এবং কিভাবে আমার চিকিৎসা হয় আমি কোথায় কিভাবে ছিলাম ইত্যাদি। এরপর আমি ২৯ বছর কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারস এ চাকুরীর মেয়াদ শেষ করে সিনিয়ার ওয়ারেন্ট অফিসার পদে অবসর গ্রহণ করি।



এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার বিজয় গাথা
- দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

উনিশশো একাত্তর সাল। দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। আমি তখন রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। ২৫ মার্চ'৭১ কাল রাত থেকে শুরু হলো পাকস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা। ওরা বিশ্বের জঘন্যতম নৃশংসতার নাম দিল "অপারেশন সার্চলাইট"। ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর চালালো বিনা বিচারে জ্বালাও, পোড়াও, নির্যাতন আর হত্যা। পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতার সংবাদ পেয়ে বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও শেষ বানী প্রদান করলেন। দেশ বাসীকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানালেন। জাতির পিতা বললেন–... আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ। দেশ কে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান জাতির পিতার স্বাধীনতা ঘোষণার লিফলেট অনুসারে । ২৫ মার্চ'৭১ এর পর আস্তে আস্তে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা সারা দেশের অধিকাংশ যায়গার ক্যাম্প করলো। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে হেরে যাওয়া জামায়াতে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা কর্মীরা পাকিস্তানের পক্ষ নিল। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের সহযোগিতার জন্য পীচ

কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে তুললো। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছু বিহারী যুবকদের "হিন্দুদের শায়েস্তা করতে হবে বলে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দিয়ে এদেশে নিয়ে এসে ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা সারা দেশে ধর পাকড় করতো। পুরুষদের উলঙ্গ করে হিন্দু মুসলমান পরীক্ষা করতো। পুরুষেদের বলতো কাপড়া তোলো, চার কলেমা বাতাও, "লোকজনদের হিন্দুদেরকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাস করতো" মালাউন কাহা হ্যায়?। মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে জিজ্ঞাসা করতো- মুক্তি কাহা হ্যায়, মুক্তি কিধার চে আয়া, কিধার মে য্যায়া, মালুম ন্যাহী। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় সারা দেশ ব্যপী জ্বালাও, পোড়াও, হত্যা, গন হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ করতে থাকলো। পাকিস্তানি বিহারী সৈন্যরা তাদের সাথে চাকরি করা বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে থাকলো। কিছু বাঙালি সৈন্য অস্ত্র নিয়ে অথবা খালি হাতে পালিয়ে এলেন। হানাদারেরা তাদেরই সাথী কিছু বাঙালি সৈনিক কে হত্যা করে ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগীতা করার জন্য জামায়াতে ইসলাম ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পীচ কিমিটি, রাজাকার বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে তোলে পীচ কিমিটির লোক ও রাজাকারেরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুদের বাড়িঘর চিনিয়ে দিত। পাকিস্তানি সৈন্যদের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে গ্রামের আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের বাড়ি চিনিয়ে দিতো। তারা চিনিয়ে দিত কোন বাড়ির লোক মুক্তিযুদ্ধে গেছে। তারা পাকি হানাদারদের তথ্য দিত, বাড়িঘর লুটতরাজ ও চাদাঁ বাজি করতো। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা হত্যা, গণ হত্যা, নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী জঘন্যতম কাজ করতো। তাদের এই নিষ্ঠুরতা দেখে জাতি স্বম্ভিত হয়ে পড়লো। প্রতিদিন পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসার কথা জানতাম বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে। তখন স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে চাকরি করা আমাদের এলাকার অধিকাংশ চাকুরীজীবী জীবন বাঁচাতে বাড়িতে বাড়িতে এসে অবস্থান নিলেন। তাঁদের কাছ থেকে ও অন্যান্যের কাছ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস ভয়াবহতার কথা জানতে পারলাম। উল্লাপাড়া থানার চড়িয়া ও কান সোনা ঘোষ পাড়া, সাথিঁয়া থানার ডেমড়া (বাউস গাড়ি রুপসী) ও করঞ্জা গন হত্যা হলো।

দেশের ভয়াবহ অবস্থা। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক এক রাতে এক এক গ্রাম ঘিরে রেখে ভোর থেকে গন হত্যা চালায়। এদেশীয় স্বাধীনতা বিরোধী সহযোগীদের দিয়ে লুটতরাজ চালায়। বাড়িঘর ও দোকানে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। ২৫ মার্চ কাল রাতের অপারেশন সার্চ লাইট এর পর থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুরা অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। বাঙালি সৈন্য, ই.পি.আর পুলিশ, আনসার ও অন্যান্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালায়। তার পর জাতির পিতার নির্দেশ অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ চালায়। বাঙালি সৈনিক, ই.পি.আর, আনসার ও অন্যান্য প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এদেশের অধিকাংশ কৃষক, শ্রমিক,ছাত্র ও অন্যান্য নারী-পুরুষ। পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঙালিদের কুলিয়ে উঠা সম্ভব হয় না। প্রশিক্ষণ অস্ত্র ও সহযোগিতার জন্য বাঙালি সৈন্য ও অন্যান্যরা ভারতে আশ্রয় নেয়। আমাদের গ্রামে করতোয়া নদী পাড় হয়ে আসতে হবে। নৌপথ ছাড়া গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা আসতে পারবেনা। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা খুব ভালো। আমাদের গ্রামের সর্বজনাব ডা. মোঃ জয়নুল আবেদিন সরকার (জতু ডাক্তার), ভাইস প্রিন্সিপাল মোঃ নুরুল হক সরকার কেমিষ্ট মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার, ডা.মোঃ খলিলুর রহমান ,মোঃ আব্দুল সরকার, মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন, মোঃ শাহ আলম মাষ্টার, মোঃ আব্দুল মজিদ সরকার, মোঃ আবুল কালাম, মোঃ আকবর আলী মোল্লা, মোঃ ইউনুস মাষ্টার,মোঃ আকবর আলী প্রামানিক সহ গ্রামের নেতৃস্থানীয় মুসলমান গণ মুসলমান যুবক ও সম্ভাব্য অন্যান্যদের ডেকে বললেন– " সারা দেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা আপনারা সবাই জানেন। সারা দেশের যেখানে যাই হোক সবাই দেখবেন আমাদের গ্রামের হিন্দুদের যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। হিন্দুরা আমাদের আমানত...। আমরা আমাদের গ্রামের হিন্দুদের রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সতর্ক থাকবো"। আমাদের গ্রামের একজন মানুষও পীচ কমিটির সদস্য, রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধী হয় নাই। সব মুসলমানেরা হিন্দুদের বিভিন্ন নিরাপত্তা দিয়ে ছিলেন। ডেমড়া গণহত্যা পর থেকে আমরা দিন রাত গ্রাম পাহাড়া শুরু করলাম। প্রতিবেশী মুসলমান যুবকেয়া আমাদের সহযোগিতার জন্য সাথে থাকলো। বড়দের নির্দেশে সর্ব মোঃ আব্দুল মজিদ, আবুল কালাম , গোলাম মাহবুব নান্নু, মোঃ আব্দুস ছাত্তার, মোঃ আনাইমোল্লা,

মো: ইমান আলী, মো: নজরুল ইসলাম, মো: লাল মিয়া. মো: শামসুল হক ও অন্যান্যরা রাত দিন পালা করে করে আমাদের সাথে থেকে পাহাড়া দিল। আমাদের পরিবার কয়েক দিন রাতে প্রতিবেশী মুসলমানদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ঘুমাতাম। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা এত ভালো যে,তাঁরা আমাদের জন্য ঘর ও বিছানা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বারান্দায় ঘুমাতেন। আমরা কয়েক দিন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আমাদের গ্রাম অপেক্ষা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বাচড়া গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকলাম। একাকী মনে মনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। মানুষের বাড়িতে আর কত দিন থাকা যায়। আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে আবার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলাম। আমাদের গ্রামের আমরা অন্যান্য যুবকেরা নিজেদের উদোগে রাত দিন পালা করে করে পাড়া পাহাড়া দিতে থাকলাম। আর মুক্তিযুদ্ধের যাওয়ার পথ খুঁজতে থাকলাম। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিক। দিনটি ছিল ৬ শ্রাবণ ১৩৭৮ ও ২৩ শে জুলাই'৭১ শুক্রবার। বর্ষাকাল। রাত ৮ টার দিকে দেখি আমাদের বাড়ি অদূরে পালেদের বিলে দুইটি ছই ওয়ালা নৌকা। নৌকা দেখে এগিয়ে গেলাম। বাচড়া গ্রামের আমার পরিচিত মো: আব্দুল ওহাব কে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাস করলাম। কী হবে? ওহাব বললো এম পি এ. জনাব মো: আব্দুর রহমান স্যার এলাকার ইচ্ছুকদের মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং জন্য ভারত নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বললাম তাহলে আমিও যাবো। আমি চলে এলাম বাড়িতে। গোপনে আমার জামা কাপড় গোছালাম তারপর আমার পড়ার খাতার একটি পৃষ্ঠা ছিড়ে মাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিরকুট লিখলাম। চিরকুট টি ছিল–"মা, প্রনাম নিও, বাবাকে আমার প্রনাম দিও। বড় দাদা, মেজদাদা, ও বৌদিকে প্রনাম দিও। ছোট ভাই বোনকে স্নেহাশিষ দিও। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলাম। তোমাদেরকে বলে গেলে যেতে দিতে না জন্য না বলে চলে গেলাম। অপরাধ ক্ষমা করিও। আশীর্বাদ করিও। আমি যেন বিজয়ী হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি। ইতি- তোমার ছেলে দেবেশ।" দিনটি ছিল আমাদের গ্রামের হাটবার। পিতৃদেব হাট থেকে ভালো মাছ এনেছেন, মাতৃদেবী রান্না করছেন। আর কিছু ক্ষণ পরেই আমাদের সবাইকে খেতে ডাকবেন। আমি বাড়ির কাউকে না বলে গোপনে নৌকায় গিয়ে বসলাম। রাত ৮-৩০ মি: এর দিকে শাহজাদপুরের রাজ্জাক ও এরশাদ ভাই সহ কয়েক জনকে সাথে নিয়ে একটা নৌকায় এম.পি.এ জনাব মো:

আব্দুর রহমান স্যার এলেন। এম.পি.এ স্যার কে দেখে আমি দেখা করার জন্য এগিয়ে গেলাম। সামনে দাড়িয়ে আদাব দিলাম। আমাকে দেখে স্যার বললেন– দেবেশ, তুমি কেন? এত ছোট মানুষকে তো মুক্তিযুদ্ধে নিবেনা। আমি অনুরোধ করলাম। এম.পি.এ স্যার বললেন-ঠিক আছে চলো। তারপর রতন কান্দি পালেদের বিলের ঘাট থেকে রাত ৯-০০ টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। মানসিক ভাবে ভগবান কে প্রনাম করলাম। শুরু হলো এক কিশোরের জীবন পন যুদ্ধে যাওয়া। আমরা সুজানগর সাত বাড়িয়া হয়ে পদ্মা নদী পাড় হয়ে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার চিলমারি ইউনিয়নের খারিজাথাক গ্রাম দিয়ে বাংলাদেশের বর্ডার অতিক্রম করলাম। আমরা ভারতের পশ্চিম বাংলার জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। একটি বি.এস.এফ ক্যাম্পে ঢুকলাম। প্রাতঃক্রিয়াদি করে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। এম.পি.এ স্যার ও আমাদের গাইডার কে একটি চেয়ারে বসতে দিলেন। আমাদের সবাই কে এক লাইনে দাড় করালেন। আমাদের গণনা করা হলো। আমরা হলাম ২২ জন। এম.পি.এ স্যার আমাদের সাথে মালদহ পর্যন্ত গেলেন। মালদহ বাজার থেকে মুড়ি ও কাঠাল কিনে আমাদের খাওয়ালেন তারপর আমাদের কে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষনের জন্য কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশে কলিকাতা চলে গেলেন। আমরা রাত ৯ টার দিকে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে পৌছালাম। তাঁরা আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পর দিন সকালে আমাদের সবাইকে ফলোইং করালেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে ট্রেনিং কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করলেন না। নিরুপায় হয়ে আমি আমার ওল্ড মালদহের পিশে মহাশয় বিশ্বানাথ ভট্টাচার্যের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তখন ভারতীয়রা বাংলাদেশের লোকদের কে জয় বাংলার লোক বলতো। ভারতের ট্রেন ও বাসে বাংলাদেশের লোকের কোন ভাড়া লাগতো না। বাস ও ট্রেনে ভাড়া চাইতে এলে " জয় বাংলা" বললেই বুঝতে পারতেন আমরা বাংলাদেশের শরণার্থী। কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে একটি বাসে কাছাকাছির একটি রেল স্টেশনে গেলাম। তার পর ট্রেন ধরলাম। বারসই রেলওয়ে জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদলাতে হলো। আমি স্টেশনে বসে আছি। আমার কাছে ট্রেনের টিকেট নাই। মোবাইল কোর্টের লোক আমাকে ধরে নিয়ে গেল। একটি রুমে বসালো।

যাদের ট্রেনের টিকেট নাই তাদের ম্যাজিস্ট্রেট এক এক করে ডেকে ডেকে জরিমানা করলো। পর্যায়ক্রমে আমার পালা এলো। আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম "জয় বাংলা"। ওনারা বুঝতে পারলেন আমি বাংলাদেশ থেকে গিয়েছি। আমাকে জরিমানা না করে ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী ট্রেনে উঠে ওল্ড মালদহ স্টেশনে নেমে পিসে মহাশয় শ্রী বিশ্ব নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে গেলাম। কয়েক দিন ওল্ড মালদহ, গাজল, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি আত্মীয় বাড়ি ঘুরলাম। আমার পিশে মহাশয়ের ভগ্নিপতি ছিলেন একটি শরণার্থী ক্যাম্পের ইনচার্জ। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন-" তুমি ছোট মানুষ তোমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে শরণার্থী ক্যাম্পে ভর্তি করে নিচ্ছি। তুমি রেশন, লারকি ও অন্যান্য সকল সুবিধা পাবে। আমি বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের জন্য ভারত এসে শরণার্থী শিবিরে বসে বসে খাবো ইহাতে সম্মত হতে পারলাম না। আবার ফিরে এলাম কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। আমাদের শাহজাদপুরের রবীন্দ্র নাথ বাগচী ও রতন কুমার দাসসহ কয়েক জনকে পেলাম। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন তুমি কাছের মালঞ্চ (কুরমাইল) ক্যাম্পের ইনচার্জ ৭ নং সেক্টরের উপদেষ্টা বেড়া-সাঁথিয়া নির্বাচনী এলাকার এম.এন. এ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যারের কাছে যাও। আমি তাঁদের পরামর্শে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যার এর কাছে গেলাম। আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে কামাপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি করার ব্যাবস্থা করলেন। কামাপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পের ভর্তি কর্তৃপক্ষকে আমাকে ভর্তি করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমার দেশ প্রেম, সাহসী মনোভাব ও অন্যান্য শুনে ভর্তি করলেন। প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের ফলইং করিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো, পিটি প্যারেড করানো হতো। কদিন কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার পর আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগচী, রতন কুমার দাস ও মো: নজরুল ইসলাম কে ট্রান্সফার করলো মালঞ্চ ট্রানজিট ক্যাম্পে, তারপর মালঞ্চ থেকে কুড়মাইল ট্রানজিট ক্যাম্পে। কুড়মাইল থেকে আমাদের কে আনা হলো পতিরাম ক্যাম্পে। পতিরাম ক্যাম্প থেকে এক যোগে ভারতীয় আর্মি লরিতে ২০/২২ জন কে নিয়ে আসা হলো দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা নামক ইন্ডিয়ান আর্মি

ট্রেনিং ক্যাম্পে। প্রশিক্ষণ শুরুর দিনে কো-অর্ডিনেটর প্রথমে ফলইন করিয়ে প্রশিক্ষনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন বিষয়ে বললেন। তারপর তিনি বললেন দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান ডি এস ভিলন স্যার আসবেন। ঠিক দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান শিখ সেনা ডি এস ভিলন স্যার এলেন। তিনি আমাদের সকল কে উদ্দেশ্য করে হিন্দিতে যা বললেন তার অর্থ হলো-"... আপনাদের কে স্যালুট। আপনারা বীর, আপনারা আপনাদের দেশ মাতাকে হানাদার মুক্ত করতে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আমরা আপনাদের জন্য তেমন কিছু করতে পারবো না। আমরা মানবিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিব। আপনাদের দেশকে আপনাদেরই স্বাধীন করতে হবে। আপনাদের জন্ম দাতা পিতা মাতাকে স্যালুট জানাচ্ছি। তাঁরা দেশের জন্য তাঁদের সন্তানদের কে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন...। পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প টি ছিল ভারতের শিলিগুড়ি মহকুমার ৭ নং সেক্টর অধীন। পানিঘাটা স্থান টি ছিল চারি দিকে পাহাড়ের মধ্যে। এই বনাঞ্চলে বনমানুষ, নকশাল ও অন্যান্য খারাপ মানুষের বসবাস ছিল। স্থানটি ছিল কার্শিয়ান পাহাড় হইতে নেমে আসা একটি ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শ্বের বনাঞ্চল। চাঁন মারি স্থানের বামপাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণার জল। ক্যাম্পে নিয়ে আমাদের তাবুর মধ্যে থাকার সিট করে দিল। আমাদের প্রত্যেক কে একটা মগ, একটা প্লেট, দুই টা প্যান্ট, ২টা গেঞ্জি, একটি মশারি, ও বিছানা পত্র দেওয়া হলো। ট্রেনিং শুরু হলো। আমাদের ২১ দিনের ট্রেনিং হলো। আমাদের কে থ্রিনট থ্রি রাইফেল, এল, এম,জি, এস,এল,আর, ষ্টেনগান, টুইঞ্চ মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ, এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার, ফাষ্ট এইড সহ অন্যান্য ট্রেনিং দিল। যুদ্ধে সহযোদ্ধা আহত হলে বা শহীদ হলে করণীয় সর্ম্পকে এবং ফাষ্ট এইড সর্ম্পকে ধারণা দিল। ভারতীয় কয়েক জন হিন্দু বিহারী ও শিখ সৈন্য প্রশিক্ষণ দিলেন আমাদের কোম্পানীর। আমাদের কোম্পানীর নাম ছিল ডেল্টা কোম্পানী। প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন শিখ সেনা ডি.এস. ভিলন। এফ.এফ ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিদায়ের পূর্বে শ্লেটে চক দিয়ে এফ.এফ নম্বর লিখে বুকের উপর ধরিয়ে ছবি তোলা হতো। কিন্তু আমাদের কোম্পানীর প্রশিক্ষণার্থীদের বিদায়ের পূর্বে কদিন ধরে বৃষ্টি হলো। আবহাওয়া জনিত কারণে আমাদের ছবি তুলতে পারলেন না। বিদায়ের সময়ে জানতে পারলাম আমার এফ.এফ নং-৪৭৪২। ট্রেনিং শেষে ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রাক যোগে

আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগচী, মো: নজরুল ইসলাম ও রতন কুমার দাস ও অন্যান্য প্রায় ৫০ জন কে নিয়ে আসা হলো ৭ নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার তরঙ্গপুরে। ইহা ছিল পশ্চিম বঙ্গের কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুর নামক স্থানে অবস্থিত। তরঙ্গপুর এনে সিরাজগঞ্জ জেলার ১০ জনের সমন্বয়ে একটি গেরিলা গ্রুপ করা হলো। আমাদের গ্রুপের গ্রুপ লিডার নিযুক্ত হলেন বেলুকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের এম.এ মান্নান। ডেপুটি লিডার নিযুক্ত হলেন শাহজাদপুর উপজেলার জামিরতা গ্রামের অধিবাসী বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী। আমাদের কে তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, রেশনিং ও পকেট মানি দেওয়া হলো। আমার নামে একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এক ম্যাগজিন গুলি, একটি হেলমেট ইস্যু করা হলো। অন্যান্য গোলা বারুদ, মাইন,গ্রেনেড ও এক্সপ্লোসিভ কমান্ডার স্যারের কাছে দিলেন। মৃত্যু যে হবেনা এমন কোন গ্যারান্টি ছিল না। তাই আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি ও যুদ্ধ জয়ের জন্য তরঙ্গপুর বাজার থেকে একখানা শ্রী শ্রী চন্ডী গ্রন্থ, একটি মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও একটি ৪ ব্যান্ডের রেডিও কিনলাম। তরঙ্গপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত বাসে এসে ট্রেনে উঠলাম। শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংসন ষ্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন বদলাতে হলো। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্লাট ফরমে গ্রুপের সকলের সাথে বসে আছি। দেখলাম আমাদের প্লাট ফরমের সামনের লাইনে একটা ফাঁকা ট্রেন দাড়িয়ে আছে। আমি টয়লেট করার জন্য ট্রেনের একটি বাথরুমে ঢুকলাম। এমন অবস্থায় ট্রেনটি সার্ট করলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াগুড়া করে বাথরুম থেকে বের হয়ে লাফ দিয়ে প্লাট ফরমের উপর নেমে পড়লাম। আমার হাটুতে ব্যাথা লাগলো। আজ ভাবি-তখন পকেটে কোন আইডি কার্ড ছিল না। আমার অপরিচিত জায়গা। ওখানকার একজন মানুষও আমাকে চেনে না। আমি মারা গেলে আমার সাথীরাও আমাকে খুঁজে পেতেন না। আমার লাশ কবর হতো কী দাহ হতো নিশ্চয়তা ছিল না। আমার বাবা-মা সারা জীবন আমার পথ প্রানে চেয়ে থাকবেন। আমার লাশ টাও পেতেন না। পরে ট্রেন বদলীয়ে আসাম গামী ট্রেনে উঠলাম। আসাম গামী ট্রেনে ধুপরী নামক ষ্টেশনে আমরা নামলাম। তারপর বাস যোগে মানিকার চর এলাম। রাত হয়ে যাবার কারণে রাতে মানিকার চর একটা ভাড়া বডিং এ থাকলাম। পরদিন সকালে মানিকার চর থেকে নদী পার হয়ে এলাম তদানীন্তন রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম

মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মুক্তাঞ্চলে স্থাপিত রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। রৌমারী ক্যাম্পে আমরা স্নান খাওয়া দাওয়া করলাম। আমাদের কমান্ডার স্যার সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তাঞ্চল যমুনার চড়ে পৌঁছানোর জন্য একটি বড় ছই ওয়ালা নৌকা ভাড়া করলেন। রৌমারী ক্যাম্প থেকে রাতের খাবার খেয়ে রাত ৯:০০ টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। ইহা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর'৭১। নৌকা বাহাদূরাবাদ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে আসতে হয়। আমরা জানতে পেরে ছিলাম। বাহাদূরাবাদ ঘাট অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা। ঐ ক্যাম্পের পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা ভয়ানক। তারা স্পীড বোট নিয়ে রাতে নদী টইল দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা পেলে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। আমাদের কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার নির্দেশ দিলেন-"আপনারা সবাই নৌকার ডওরার মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকুন। পাকিস্তানি হানাদারেরা ধরতে এলে আমরা ধরা দিব না। যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ করে শহীদ হবো কিন্তু ওদের হাতে ধরা দিব না"। রাত ২.০০ টার দিকে আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করতে থাকলাম। ওদের সার্চ লাইটের আলো এসে বার বার আমাদের নৌকাতে পড়ছিল। ভগবানের কৃপায়-ওরা আর স্পীড বোট নিয়ে ধরতে এলোনা। আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করলাম। আমাদের সাথে চিড়া গুড় ছিল। ভোরে মাঝিরা এক কাইসা খেতের মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দিল। আমরা নীচে নেমে খেতের মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করলাম। আমাদের সাথে থাকা চিড়া ও গুড় দিয়ে সকালের জলখাবার খেলাম। তার পর নৌকা আবার ছাড়লো। তখন কাজিপুর থানার অধিকাংশ এলাকা সহ বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে। কাজিপুর থানার সম্মুখ দিয়ে আমাদের নৌকা আসবে। দেখে শুনে খোঁজ নিয়ে থামিয়ে থামিয়ে ৪ দিন ভরে নৌকা এসে পৌছালো সিরাজগঞ্জ হানাদার মুক্তাঞ্চল যমুনার চরে। ইহা ছিল টাঙ্গাইল জেলার সিংগুলির চড়ের নিকটবর্তী। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা ছিল। মাঝিরা কোন রকমে ডালভাত অথবা খিচুরী রান্না করে আমাদের খাওয়াতো। এই ভাবে খেয়ে না খেয়ে চলছিলাম। পরদিন রাতে যমুনা নদীর এপাড়ে চলে এলাম। চলে এলাম বেলকুচি-কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকার এম.এন.এ জনাব মো: আব্দুল মোমিন তালুকদারের গ্রামের বাড়িতে। তিনি তখন

বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ভাই মোঃ রশিদ তালুকদার আমাদের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করলেন। অক্টোবর '৭১ মাসের মাঝা মাঝির আগ পর্যন্ত আমাদের গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা কম থাকায় সম্মূখ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত কমান্ডার স্যার নেননি। কমান্ডার স্যারের কাছে জানলাম জনাব মোঃ আমির ভুলু এর গ্রুপ আমাদের এই এলাকাতেই আছেন। আমরা পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও তাদের দোসরদের আতঙ্কে রাখার জন্য গেরিলা কার্যক্রম "হিট এন্ড রান" চালাতাম। পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার ক্যাম্পের নিকট বর্তী গিয়ে ২/৪ টা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের আকাশ মুখি ফাঁকা গুলি ছুড়ে চলে আসতাম। পাকিস্তানি দালাল, পীচ কমিটির লোক ও অন্যান্যরা আমাদের অবস্থানের কথা জানতে পারতো। আমরা দিনের বেলা স্কুলে বা কারো বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ছিল দুইটি পক্ষ। একটি স্বাধীনতার পক্ষে। অন্যটি স্বাধীনতার বিপক্ষে। স্বাধীনতার বিপক্ষের পীচ কমিটির সদস্য,রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্যরা। স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে এসে বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজি করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়ী দাতা বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করতো। হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতারা ছিল ওদের বড় টার্গেট। হিন্দু নারী পুরুষকে ধরে নিয়ে যেত। নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা করতো। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারাও পাকিস্তানি হানাদার পক্ষ ত্যাগ ও তাদের সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ ভাবে অত্যাচারী পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকারদের হত্যা করতো। গণহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী কাজে সরাসরি জড়িত কোন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যকে ধরতে পারলে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে বিচার করার পরিকল্পনা ছিল। যে কারণে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে সাহসী একজন কে জল্লাদ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। আমাদের গ্রুপের জল্লাদ হিসেবে মনোনীত ছিলেন দৌলতপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক। আমরা এমন কোন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ধরতে পারি নাই। আমরা কখনো কাউকে মারি নাই। আমাদের গ্রুপের নীতি ছিল- "আমরা আমাদের দেশী কোনো ভাই কে হত্যা করব না। বুঝিয়ে তাদের কে স্বাধীনতার পক্ষে আনবো" যে কারণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কোন স্বাধীনতা বিরোধীকে ধরি নাই, অত্যাচার বা

হত্যা করি নাই। আমরা নিজেরা বা তাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে বিভিন্ন ভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বাধীনতার পক্ষে আনার চেষ্টা করতাম। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্কে থাকতাম। যে কোন সময় পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের আক্রমন করতে পারে। আমাদের থাকা খাবার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা আজ এ শেল্টারে কাল সে শেল্টারে থাকতাম। কোন শেল্টারেই একাধিক দিন থাকতাম না। কোন কোন দিন শেল্টারের অভাবে সারারাত চিড়া গুড় খেয়ে রাত্রি জেগে স্কুলের বেঞ্চে শুয়ে থাকতে হতো। কি যে অমানবীয় কষ্ট। আমাদের শেল্টার পালা ক্রমে আমরা দু'জন করে করে পাহাড়া দিতাম। প্রতি রাতে কমান্ডার স্যার আমাদের পাশ ওয়ার্ড দিতেন। আমরা রাতে বিভিন্ন রাজাকারদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বুঝাতাম। সকালে আমরা অস্ত্রে ফুল থ্রু মারতাম, পরিষ্কার করতাম ও অস্ত্রে তেল দিতাম। তখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। তবুও স্বাধীনতা বিরোধীদের ভয়ে অনেকে আমাদের কে শেল্টার বা খাবার দিতে সাহস পেতেন না। কারণ অধিকাংশ গ্রামেই ছিল পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকার। তারা খোঁজ জানলে পার্শ্ববর্তী আর্মি বা রাজাকার ক্যাম্পে সংবাদ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিবে, বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে হত্যা করবে ও অত্যাচার চালাবে এই ছিল তাদের ভয়। আমাদের সাথে সব সময় চিড়া গুড় থাকতো। স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ায়ে আমাদের সাথে নিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবার কারণে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী পাগল প্রায় হয়ে গিয়ে ছিলেন। একটি অবুঝ কিশোর ছেলের পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! আমাকে খুঁজে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ও রাজাকারদের আলটিমেটামে গণহত্যার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গোটা পরিবার বাড়িঘর সবফেলে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে ভারতের আসামের মানিকার চড় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। কোথাও আক্রমণের পূর্বে আমরা রেকী করে দেখতাম। "জয় বাংলা" ছিল আমাদের রণাঙ্গনের প্রধান ধ্বনি। আমি যুদ্ধ শুরুর পূর্ব ভগবান এর নাম নেওয়ার পরই "জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করতাম। যুদ্ধ চলাকালিন সময়েও আমরা মাজে মধ্যে "জয় বাংলা ধ্বনি দিতাম। "জয় বাংলা" রণ ধ্বনি আমাদের সাহস বাড়িয়ে দিত। তারপর আক্রমণ করতাম। আমি আমার গ্রুপ কমান্ডার ও রণাঙ্গণের সাথিদের বলে রেখেছিলাম-" আমি রণাঙ্গণে

মারা গেলে, তরঙ্গপুর বাজার থেকে কেনা জাতীয় পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে আমার দেহ নদীতে দিয়ে দিবেন" মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে আমি মারা গেলে তখন বাংলাদেশে লাশ নিয়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করার কোন লোক ছিল না। আমি পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকারদের বিরুদ্ধে চারটি ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ করে বিজয় হয়েছি।

ধীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা জামিরতা হাই স্কুলে ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়েছিলাম। ১৪ ডিসেম্বর'৭১ শাহজাদপুর থানা হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসন গড়ে উঠে। মোঃ আব্দুল বাকি মির্জা শাহজাদপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক ও থানা প্রশাসক মনোনীত হন। তিনি সিও (ডেভ) অফিসে বসতেন। শাহজাদপুর থেকে সারা উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত খরচ বহন করতেন। ১৯ ডিসেম্বর ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট ও সেনা বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান এর কাছ থেকে জোর করে ক্ষমতা কেড়ে নেয় জুল ফিকার আলী ভুট্টো। তিনি ৮ জানুয়ারী'৭২ আমাদের জাতির পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। জাতির পিতা ঐ দিনই লাহোর থেকে সকালে বিমানে যাত্রা করে বিকালে অবরতরণ করেন ইংল্যান্ডের হিথ্রো বিমান বন্দরে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বাঙালিদের জাতির পিতাকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে সংবর্ধনা দেন। জাতির পিতা ১০ জানুয়ারী ব্রিটিশের বিশেষ বিমান যোগে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাংলাদেশে আসার পথে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রনে ভারতে যাত্রা বিরতি করেন। তার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে আসলেন। ১২ জানুয়ারী জাতির পিতা প্রথমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং পরক্ষণেই রাষ্ট্রপতি পদের ইস্তেফা দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথা চালু করে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে দেশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। জাতির পিতা আমাদেরকে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের গ্রুপ ২৪ জানুয়ারী'৭২ রবিবার সিরাজগঞ্জ সদরস্থ ইব্রাহিম বিহারীর বাসায় অস্ত্র জমা নেওয়ার ক্যাম্পে অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করলাম। সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের পুণর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্প করা হলো। আমি ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি না হয়ে বাড়িতে চলে এলাম। কয়েক দিন পর রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ

সান্যাল এর কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণীর অটোপাশের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে লেখা পড়া শুরু করলাম।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খোরশেদ আলম

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় আমার পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল আলী এমএফ তখন ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী থানায় কর্মরত ছিলেন। তিনি মার্চের ১০ তারিখে এসে আমাকে পাবনা থেকে বালিয়াডাঙ্গী থানায় নিয়ে গেলেন, সেখানে যাওয়ার পর আমি ঠাকুরগাঁও-এ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে যে সমস্ত মিছিল মিটিং হতো সেগুলোতে যোগদান করতাম। ২৫ শে মার্চ ঢাকাতে যখন নিরীহ বাঙালির উপরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করার পরে ২৭ তারিখে ঠাকুরগাঁও-এ অনেক বড় মিটিং মিছিল হলো এবং ২৮ তারিখে সেখানে একটা ইপিআরের উইং হেডকোয়ার্টার ছিল তারা বিদ্রোহ করলো, বালিয়াডাঙ্গী থানায় থানা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার ছিলেন সিরাজুল হক তার বাড়ি ছিল নওগাঁ শহরে উকিল পাড়ায়, তাকে আহ্বায়ক করে থানা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হলো। আমি সেই কমিটির সর্বকনিষ্ঠ একজন সদস্য ছিলাম। এপ্রিল মাসের ১ তারিখে আমাকে ভারতে পাঠানো হলো সেখানকার স্থানীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য, আমি এবং ওয়াপদা তে চাকরি করতেন কুমিল্লার এক ভদ্রলোক আব্দুস সাত্তার ও ভজন সিং নামের একজন মিলে ভারতের তদানিন্তন পশ্চিম দিনাজপুর, বর্তমান উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর গেলাম।

সেখানে স্থানীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ হলো বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতাদের খুঁজতে গিয়ে এডভোকেট মোঃ সোলায়মান নামের একজন সিপিএম নেতার বাড়িতে গেলাম তার মাধ্যমে সব নেতাদের সাথে ওখানে আমাদের আলাপ-আলোচনা হলো। আমরা একদিন সেখানে থাকলাম তারা আমাদের সকল সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। আমরা পরদিন আবার ফিরে চলে আসলাম। এপ্রিল মাসের **১৩** তারিখে সৈয়দপুরে বাঙ্গালীদের অবরোধ ভেঙে যখন পাকিস্তান বাহিনী বেরিয়ে আসলো ট্যাংক সহ তখন দুই ট্রাক ইপিআর বালিয়াডাঙ্গী থানায় আসলো রাত্রী যাপনের জন্য তারা যাবার সময় আমাদের থানা ত্যাগ করার জন্য পরামর্শ দিয়ে গেল। পরের দিন আমরা আমাদের পরিবারের সকলে কান্তিভিটা নামক একটা সীমান্ত এলাকার একটা গ্রাম আছে সেখানে ভিচাটু মোহাম্মদ নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তার আশ্রয়ে গেলাম। সেখান থেকে **১৭** এপ্রিল বর্ডার ক্রস করে আমরা ভারতে গেলাম, ওখানে একটা বাড়িতে আমরা থাকলাম এবং পরের দিন বিএসএফের লোকজন এসে বিএসএফের যে হেডকোয়ার্টার ছিল থোকরা বাড়ী তার পাশে একটি স্কুলে নিয়ে আমাদেরকে রাখল। সেখানে একদিন পঞ্চগড়ের এম এন এ এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম তিনি আসলেন, ৭৮ বিএসএফের যে ক্যাপ্টেন ছিলেন ক্যাপ্টেন সুভাষ। তার সাথে আলাপ আলোচনা করলেন আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা জানতে পারলাম ওখানে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প হবে সেখানে ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। মে মাসের ৩ তারিখে আমরা ঠাকুরগাঁয়ের এলাকার আমার বাবা সহ **১৭** জন মিলে যে জায়গাটা দেখিয়ে দিল সেখানে ক্যাম্প তৈরির কাজ শুরু করলাম। প্রথম দিন আমরা প্রায় দেড়শত বাঁশ কাটলাম এরপরে ইপিআররা আসা শুরু করল এবং ইয়াং ছেলেরা আসা শুরু করলো। ইপিআর এর লোকজন আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করল। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন সুভাস শিলিগুড়ি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনীর দুইজন ইন্সট্রাকটর নিয়ে আসলেন। তারা আমাদেরকে এক্সপ্লোসিভ এবং মাইন এর ট্রেনিং দিলেন এবং ইপিআর এর প্রশিক্ষকরা আমাদেরকে স্মল আর্মস এর ট্রেনিং দিলেন। এরপর আমরা ইপিআরদের সাথে জয়েন্টলি ২৬ শে মে থেকে প্রথম অপারেশন শুরু করলাম পাকিস্তানিদের রুহিয়া ঘাটির উপর আক্রমণ করে। এরপরে আমরা উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতের পানিঘাটায় গেলাম, ট্রেনিং শেষে আমাদের একটা চেইন অফ কমান্ড গঠন করে দিলেন ৬নং সেক্টরের

সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার মোঃ খাদেমুল বাশার সাহেব। প্রায় পাঁচ ছয় শত এফএফ দিয়ে তিনটা কোম্পানি গঠন করা হলো। আলফা কোম্পানি সেটার কমান্ডার হলেন মোঃ আনোয়ার হোসেন, ব্রাভো কোম্পানি সেটার কমান্ডার হলেন মোঃ আসিরুদ্দিন, আর চার্লি কোম্পানির কমান্ডার করা হলো আমাকে। কোম্পানি গঠন করার পর আমাকে বলা হলো বর্তমান পঞ্চগড় জেলার আটওয়ারী থানা এলাকায় গিয়ে অবস্থান নেয়ার জন্য। আমার কোম্পানিতে ছয়টা প্লাটুন হলো সেই ছয়টা প্লাটুন নিয়ে আমি মুভ করলাম, কোম্পানির টু আই সি ও ১নম্বর প্লাটুনের কমান্ডার নুর করিম, ২ নম্বর প্লাটুনের কমান্ডার বশীর উদ্দিন, ৩নং প্লাটুনের কমান্ডার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ৪ নম্বর প্লাটুনের কমান্ডার মোঃ শফিউল, ৫ নম্বর প্লাটুনের কমান্ডার মোঃ আব্দুল মজিদ ও ৬ নম্বর প্লাটুনের কমান্ডার মোঃ দবিরুল ইসলামকে নির্বাচন করলাম। আটোওয়ারী এলাকার বুধগাঁও নামক একটা গ্রাম আছে, আমি বুধগাঁও ও তার আশেপাশে ছয়টা প্লাটুন কে নিয়োজিত করালাম। সেখানে আবুল মাস্টার নামে একজন আওয়ামীলীগের কর্মী ছিলেন আমি তার বাড়িতে স্থান নিলাম। সেখান থেকে থানা হেডকোয়ার্টার হেঁটে গেলে দুই বা তিন কিলোমিটার হতে পারে। পুরো নভেম্বারই আমরা পাকিস্তানিদের মুখোমুখি অবস্থান করতাম এবং কমপক্ষে দুইদিন আমাদের সাথে গুলি বিনিময় হতো। কখনো আমরা তাদের উপর গিয়ে আক্রমণ চালাইতাম আবার কখনো তারা আমাদের উপর এসে আক্রমণ চালাত। আমরা তাদের সীমানার ভিতরে গিয়েও অনেক অপারেশন করেছি, ডিসেম্বরের এক তারিখে আমি আমার একটা দল নিয়ে অবজার্ভ করতে বের হয়েছি আটোয়ারী থানার সামনে, সেদিন আমার কাছে মনে হলো খুবই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, ওদের কোন মুভমেন্ট চোখে পড়লো না তাই আমরা সতর্কতার সাথে ওদের দিকে আস্তে আস্তে এগোতে থাকলাম, আমরা একসময় আটোয়ারী থানায় পৌঁছে গেলাম, এবং দেখলাম পুরা থানা সম্পন্ন খালি অবস্থায় পড়ে আছে। এরপরে দেখলাম আমাদের দিকে তিনটা ভারতীয় গাড়ি আসতেছে একটা জীব ও দুটি ট্রাক। তারা আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলো। আমি তাদের কাছ থেকে কিছু এমিনেশন নিলাম। তখন থানাতে তারা অবস্থান করল এবং আমি আমার দল নিয়ে রওনা হলাম রুহিয়ার দিকে যেখানে পাকিস্তানের একটা ঘাটি ছিল, সেখানে কিছু গুলি বিনিময় হলো যেহেতু তারা সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলো তখন তারা একটা পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে

চলে গেল। স্থানীয় জনগণ এসে জড়ো হল এবং আমাদের ছেলেরা গিয়ে আগুন নিভালো। তাদের যেখানে অবস্থান ছিল সেখানে গিয়ে দেখলাম কিছু অর্ধ গলিত লাশ। আমরা সেখানে একদিন অবস্থান করলাম। ৭৩ বিএসএফ এসে সেখানে ডিফেন্স নিল এরপরে দুই তারিখ রাত্রে আমরা ঠাকুরগাঁয়ের দিকে মুভ করলাম। ৩ তারিখ ভোরে তাদের সাথে আমাদের কিছু গুলি বিনিময় হয়েছিল ওরা ঠাকুরগাঁয়ে ৩টি ব্রিজ এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল, তখন আমরা ঠাকুরগায়ের সুগার মিলের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, কিছু গুলি বিনিময়েযর পরে ওরা ওখান থেকে চলে গেল। আমরা তিন তারিখ ভোরেই ঠাকুরগাঁও শহরে বাংলাদেশের পতাকা উঠাইলাম। এভাবেই ঠাকুরগাঁও শহর ৩ তারিখ ভোরে শত্রুমুক্ত হলো এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসলো। ৭৩ বিএসএফের ক্যাপ্টেন নারায়ন সিং আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন ওনার সাথে মুভ করার জন্য। ৪ তারিখে আমি ওনার গাড়ীতে ওনার সাথে গেলাম বোচাগঞ্জ থানা পর্যন্ত ওখান থেকে ও পাকবাহিনী চলে গেছে। আমি সেখানে ক্যাপ্টেন নারায়ন সিং কে পৌছে দিয়ে ফিরে এলাম। এবং তখন থেকেই আমাদের ঠাকুরগাঁও শহর পাক বাহিনী মুক্ত। একাত্তরে যুদ্ধের একটা স্মৃতি আমার খুব মনে পড়ে, সেটা হল একদিন আটওয়ারী থানার পশ্চিম পাশে ছোট ধাপ নামের গ্রামে আছে সেখানে আমাদের পজিশন ছিল আমাদের সাথে পাকিস্তানিদের যুদ্ধ চলছে ওরা যেদিকে ছিল সেদিক থেকে হঠাৎ একটা বাড়িতে আগুন জলে উঠলো তখন আমরা কনফার্ম হলাম পাকিস্তানিরা ওই বাড়িতে আগুন দিছে। আমরা তখন সেই বাড়িটা টার্গেট করে ওদের দিকে মুভ করলাম, আমরা যখন সেই বাড়ির কাছে পৌছালাম তখন তারা ওখান থেকে সরে গেছে, আমরা দেখলাম একটা লোক বাড়ির ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটাই বড় ঘর সেটায় আগুন জ্বলছে। লোকটা ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে এবং কান্না করতেছে যে তার চোখের সামনে তার সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদেরও করার কিছু থাকলো না তখন কারণ সবকিছুই পুড়ে গেছে আগুনে। সেদিন আমরা ওখান থেকে চলে আসলাম আমরা যে গ্রামে থাকি সেই গ্রাম, ওই লোকটাও আমাদের থাকার ওই গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছে। একদিন সেই লোকটা আমার সামনে এসে বলতেছে জয়বাংলা হবে না। তার মানে সে বলতে চাচ্ছে যে দেশ স্বাধীন হবে না। আমি বুঝতে পারলাম সে কেন এ কথা বলেছে কিন্তু যাতে আমার ছেলেদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তাই একটা বাঁশের কুঞ্চি

দিয়ে ওই লোকটাকে একটা আঘাত করলাম। তখন দেখলাম আঘাত লেগে ওর হাতের আঙ্গুল কেটে রক্ত পড়তেছে, তখন আমার খুব খারাপ লাগলো কারন আমি নিজের চোখে দেখছি ওর বাড়িটা কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে আগুনে পুড়ে। পরে ওকে আমি কাছে নিয়ে আদর করে আমার কাছে যে ফাস্ট এইড বক্স ছিল তা থেকে হাতে চিকিৎসা দিলাম।

আমার স্মৃতিতে একটা ঘটনা আছে সেটা হল বালিয়াডাঙ্গী থানার হরিণমারি এর কথা। বোধগাঁও গ্রামে ১৬ই নভেম্বরের একটা ঘটনা, আমরা ১৩ তারিখ রাত্রে খবর পেলাম পাকিস্তানিরা আমরা যেখানে অবস্থান করতেছি আমাদের উপর আক্রমণ করবে, এই খবর পেয়ে ১৪ তারিখে আমি ডোহাপাড়া এলাকায় সমস্ত গ্রামে আমার লোকজনকে অন্ধকার থাকতে পজিশনে লাগিয়ে রেখেছি । সকালে গ্রামের পজিশনটা এরকম ছিল যে পাকিস্তানিরা ওখানে পজিশন নিলে আমরা ফেস করতে পারতাম না কিন্তু আমরা আগে পজিশন নিয়ে নিয়েছিলাম সকাল নয়টা পর্যন্ত অবস্থান করার পর দেখা গেল তারা আসে নাই আমরা উইথ ড্র করে চলে আসলাম আমরা ধারণা করলাম যে ওরা হয়তো আসবে না ১৬ তারিখে সকালবেলা ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে ছেলেপেলে একএকজন ঘুম থেকে উঠতেছে হঠাৎ করে আমাদের উপরে ফায়ারিং শুরু হল এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা ১৪ তারিখের যা হামলা হওয়ার কথা ছিল সেটা ওরা আজকের দিন করতেছে ১৩ তারিখ ও হালকা গোলাগুলি হয়েছে। সপ্তাহে একদিন বা দুই সপ্তাহে এক সপ্তাহের পর পর লোক পাঠিয়ে এমুনিশন কালেক্ট করতে থোকরাবাড়ী পাঠাই, তখন আমাদের হাতে এ্যামুনিশন ছিল না রাইফেল প্রতি ৫ বা ১০ রাউন্ড গুলি আছে আমরা চিন্তা করতেছিলাম লোক পাঠাবো আনার জন্য এমুনিশন, তার মধ্যে কিন্তু এর মধ্যেই আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। তারপর আমি সবাইকে অর্ডার করলাম আক্রমন যেহেতু শুরু করেছে আমাদের যা যা প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি আছে নিয়ে তোমরা পিছনে থাকো আর যাদের কাছে অস্ত্র আছে তারা সামনে চলো এভাবে দুই ভাগ করে দিয়ে এক ভাগ ইন্ডিয়ার বর্ডারের দিকে চলে গেল, একটা ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যে ওরা ডোহাপাড়া রাস্তা দিকে আগাতে থাকলো ওরা দুর থেকে আমাদের সবগুলো অবস্থানে ৩ ইঞ্চ মর্টার ও ২ ইঞ্চ মর্টার দিয়ে হামলা করছিল কিন্তু আমরা আগে অবস্থান করে ফেলেছিলাম ডোহা পাড়াতে। ওরা ডোহাপারা পর্যন্ত এসেছিল, ওরা সেদিন ১৯টা বাড়ি পুরিয়ে দিয়েছিল। তো

আমাদের ছেলেপেলেরা আগেই সেখানে ছিল প্রচুর বৃষ্টির জন্য সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পাবলিক যারা গিয়েছে তাদের জন্য আমার মুক্তিযোদ্ধা ছেলেপেলেদের বললাম তোমরা রান্নাবান্না করো তারপর বললাম যারা ভেতর থেকে এসেছে সবাইকে আগে খাওয়ায় নাও। ওরা তাই করল তাদেরকে খাওয়াইলো আমরা নিজেরা খেলাম যারা ঘর উঠিয়ে আছে অর্থাৎ শরণার্থী একজন এসে আমাকে খেতে দিল সেদিন ওই খাবার দিয়ে রাতে খেয়ে উঠলাম পাকিস্তানিরা বর্ডারে যে গোলা মারতেছে ইন্ডিয়ার মরাগতি এর অপজিটে খালি জায়গা ওইখানে বাঙালি যারা গরু চড়ায়, একটা গরু মারা গেল তাদের সবাই সেখান থেকে দৌড়ে চলে আসলো আমরা ক্যাম্পের এখানে আসলাম সাব সেক্টর কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিন সাহেব দেখলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে তারপর তার সাথে কথাবার্তা বললাম, উনি কিছু পরামর্শ আমাকে দিলেন কি হচ্ছে না হচ্ছে এসব ব্যাপারে আমাকে জানালেন এবং আমিও তাকে জানালাম তারপর ব্যাক করার পর আমরা আমাদের অরিজিনাল পজিশনে ফিরে আসলাম। ১৯ টা বাড়ি জ্বালিয়েছে ঠিকই কিন্তু কাউকে তারা হত্যা ঘটনাটি ঘটেছিল নভেম্বরের ১৬ তারিখ। আমরা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস বুধগাঁও গ্রামে অবস্থান করেছিলাম।

আর একটা স্মৃতি মনে পড়ে, আমাদের পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের আর একটা ক্যাম্প ছিল সেটা ভারতীয় এলাকায় কোর্টগজ এ। কোর্টগজ এর মুক্তিযোদ্ধাদের আলাদা কমান্ড আলাদা এলাকায় ওরা থাকে । ওদের ওই পাশে ডাঙ্গী ও মির্জাপুর নামে দুটি জায়গা আছে, এবং এই দুই জায়গায় পাকিস্তানিদের দুটি শক্ত ডিফেন্স ছিল। আমরা জানি যে ডাঙ্গী ডিফেন্সে মুক্তিযোদ্ধারা অনেকদিন ধরেই আক্রমণ করে কিন্তু পাকিস্তানিদের ডিফেন্স সরাতে পারে না। একদিন কোর্টগজ মুক্তিযোদ্ধাদের যে কমান্ডার ছিলেন নুরুল হক সে আমার কাছে আসলো একটা চিঠি নিয়ে, চিঠিটা পাঠিয়েছেন মেজর সারকী। চিঠিতে লেখা ছিল আমি যেন তার সাথে দেখা করি আমার লোকজন নিয়ে, কিন্তু কয়েকদিন আগে আমার ছেলেদের সাথে এবং ওদের ছেলেদের মধ্যে কিছু ঝগড়াঝাটি হয়েছে তাই আমি সকলকে সাথে না নিয়ে আমার দুজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে ছাপরা ঝাড় বিওপির বিপরীতে ভারতে বর্ডারে যে বিওপি আছে সেখানে গেলাম। সেখানে মেজন সারকীর সাথে দেখা

করলাম, তিনি আমাকে বললেন তোমাকে আমাদের একটা ছোট কাজ করতে হবে তুমি রাজি আছো কিনা, আমি বললাম বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় যুদ্ধ হলে আমি অংশগ্রহণ করতে রাজি আছি। তখন তিনি বললেন আগামীকালকে এখানে গাড়ি আসবে তোমাদেরকে নিয়ে যাবে। আমি ১৯ জন ছেলে নিয়ে সাথে গেলাম। ওরা ওখান থেকে গাড়িতে করে নিয়ে গেল সেখানে আগের থেকে আমাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সবকিছু করে রাখছিল, বিকেল ৪টায় উনি আমাদেরকে ব্রিফ করলেন ডাঙ্গী ডিফেন্সে আক্রমণ করতে হবে। আমি একটু নার্ভাস ফিল করলাম কারণ আমি যে অস্ত্র নিয়ে গেছি ডাঙ্গির মতো জায়গায় আক্রমণ করার আর্মস এবং এমুলেশন আমার। আমি বললাম দাঁড়াতেই উনি বুঝতে পেরে বলতেছেন তুমি কি ভয় পেয়ে গেছো নাকি, না আমি তো ভয় পাইনি তবে আমার কাছে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ নাই। তিনি বললেন ভয়ের কিছু নেই আমাদের লোক থাকবে এখানে আর অস্ত্র গোলাবারুদ যা লাগে সব দেব। আক্রমণের চারটা গ্রুপ থাকে মেইন ভূমিকা পালন করে অ্যাসল্ট পার্টি আমাকে দায়িত্ব দিল ওই অ্যাসল্ট পার্টিতে, আমাকে অস্ত্র দিল ১৯ জনের ভিতর চারটা এসএমজি দুইটা শর্ট গান আর ৬ জনকে দিল বাংকার চার্জ করার জন্য চার্জার বাঁশের মাথায় এক্সপ্লোসিভ সেট করে চার্জার তৈরি করে ছিলাম। আর বাকি রাইফেল তবে আমি খুব হতাশ ফিল করতে ছিলাম যে এইগুলো দিয়ে অ্যাসল্ট পার্টিতে চার্জ করব এবং তারা আর্মি অফিসার তারা আমাদের ইন্সট্রাক্টর তো মেনে নিতে হবে, যাই হোক দুইজন গাইড দিল আমাকে আর তিনটা পার্টি কে কোথায় গেছে বলতে পারব না আমারা মুভ করেছি, শেষে বলল তোমরা যখন পৌছাবা বুঝবে সবাই পৌছায় গেছে আমরা বর্ডারে গেলাম বিওপিতে ওখানে আমাদেরকে চা খাওয়ালো তারপর ওদের সাথে পরামর্শ করে গাইড দুইজন আমাদেরকে নিয়ে রওনা দিল। আমরা মুভ করতেছি অন্ধকার এর ভিতরে বেশ কিছু ভিতরে যাওয়ার পর ওই গাইড দুইজন সামনে আসে ওরা আমাদের হাত দিয়ে ইশারা করলো জায়গাটা একটু ভাঙ্গা, জায়গা মাঝখানে ছোট ছোট রাস্তা ওখানে আমরা বসে পড়লাম দুজনে এগিয়ে চলে গেল সামনে কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল বাঙ্কার খালি তারপরে আমরা সামনে আগালাম, বাংকারে ঢুকলাম চারটা চৌকি কাথা আছে খালি কিছু ম্যাট আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের সময় ট্রেনিং করি পানিঘাটাতে, আমাদের বলেছিল পাকিস্তানের

ডিফেন্সের নীতিমালা কিভাবে কি করে ওদের একটা সেকেন্ড লাইন থাকে ওরা দিনের বেলা এখানে অবস্থান করে রাতের বেলা ক্লোজ হয়। তখন ওই কথাটা আমার মনে পড়লো সেকেন্ড লাইন ওরা ক্লোজ হয়ে গেছে তো আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম আমরা ডিফেন্স ভিতরে চলে গেছি সামনে, যেটাকে আর্মির পরিভাষায় আড় বলে একটা আড়াল পজিশন নিয়ে ফায়ার করা যায় এমন কিন্তু সেখানে কোন আড় পাচ্ছিনা অন্ধকার তো ফাঁকা জায়গায়, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দূরে একটু উঁচু জায়গা যেমন পুকুরের পাড় এরকম মনে হচ্ছে আমি ওদেরকে বললাম আমাদের আবার ওয়ারলেস সেট আছে সিগন্যাল দেওয়ার জন্য দুজনের কাছে ওয়ারলেস টা আর ভ্যারিলাইট পিস্তল, ওদেরকে বললাম এক জায়গায় বসে প্রিপারেশন নাও, আমরা ধারণা করলাম সবাই বুঝে গেছে তখন পিস্তল দিয়ে সিগনাল দিল, সিগনাল দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে পঞ্চগড়ের দিকে যে পার্টিটা গেছে ওটা ফুটকিবাড়ি নামে একটা জায়গা আছে সেখানে একটা ব্রীজ তাদের ভেঙে যাওয়ার কথা আমরা বুঝলাম তারা পৌঁছে গেছে আরেকটা পার্টি হল ওখান থেকে ঠাকুরগাঁও যে রাস্তা গেছে ওই রাস্তা থাকার কথা কিন্তু ওদের কোন সাড়াশব্দ পেলাম না এবং কাভারিং পার্টি এক টা গ্রুপ থাকবে আমাদের পিছনে একটু সাইডে, বামদিকে তাদের কোন সাড়াশব্দ নেই আমরা শত্রুর অবস্থান জানার জন্য পজিশন বোঝার জন্য কি অস্ত্র ব্যবহার করছে সেটা বোঝার জন্য কয়েকটা ফায়ার করলাম আমাদের এমুনেশন খুব কম যতটা দরকার তার চেয়ে কম আমাদের বলছে সকাল আটটা পর্যন্ত অবস্থান করবা। তো কয়েকটা ফায়ার করার পর দুটো দিক থেকে হেভি মেশিনগানের ফায়ার আসলো কিন্তু আমাদের উপরে না, ডান দিকে বেশ কিছু দূরে যাতে আমাদের অবস্থান বুঝতে পারে সেজন্য ওরা ফ্লেয়ার ছুড়ে মারছিল ওইটাও ডান দিকে মারার জন্য চার সেকেন্ডের জন্য সমগ্র এলাকা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওরা আমাদের অবস্থান তখনও বুঝতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পারছে তখনও আমাদের কভারিং পার্টির কোন সাড়াশব্দ নাই, বাম দিকে যারা তাদেরও কোন সাড়াশব্দ নাই তারপর যেরকম বৃষ্টি হয় সে রকম গুলি হচ্ছে আমাদের উপরে, সামনের দিকে মুখ করা বা চার্জ করব কিভাবে, এটি আমাদের নাই। আমরা মেজর সারকীর সাথে যোগাযোগ করে আমরা ওই ব্রিজের বিস্ফোরণের পরপরই আমরা পৌছে গেছি বলে যোগাযোগ করে ফায়ার হয়ে গেছে কোর্টগজের ওখান

থেকে ওরা সাপোর্ট দিচ্ছে আর আমরা যেখান থেকে দেখছি যে কতটুকু আগাতে হবে কতটুকু পিছাতে হবে কতটুকু ডান দিকে যেতে হবে কতটুকু বাম দিকে যেতে হবে যেভাবে বলতেছে। সেভাবে করছি এভাবে আর্টিলারির সাপোর্টে যুদ্ধ করা, এটাই আমার প্রথম যখন আর্টিলারি ফায়ার আসে ওইটা স্থিমিত হয়ে যায় তারপর ফায়ার শুরু করে এই অবস্থায় আমরা ঘন্টা দুয়েক টিকে ছিলাম। ওরা ২ ইন্স মর্টার ব্যবহার শুরু করল আমাদের আশে পাশে সেল পড়তে লাগল। সেলের বিস্ফোরনের ফলে মাটি ছিটকে সে আমাদের শরীরে পড়তে লাগল এবং স্প্রিন্টারগুলো সো সো শব্দে ছিটকে যাচ্ছিল। তখন আমাদের পক্ষে সেখানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তারপর আমার কাছে মনে হলো ডান দিকে কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। তখন আমার কাছে মনে হলো পাকবাহিনী আমাদেরকে ঘেরাও করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। তারপর আমি বললাম আমাদের এখানে থাকাটা নিরাপদ না। আমরা পরবর্তীতে মেজর সারকীর অনুমতিক্রমে আমরা পিছিয়ে অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ১৯ জনের ভিতরে দুইজন আমাদের গাইড এবং চারজন আমার দলে এই চারজন পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে জায়গাটা ধান ক্ষেত আর কাঁদা। সোজা হয়ে দৌড়ালে গুলি লাগার ভয়, চিন্তাভাবনা করেই দৌড়াচ্ছি, এখন ওদের পেছনে দৌড়িয়ে গুলি খাওয়া সম্ভব না আবার ছেড়ে যাওয়া সম্ভব না রাস্তা ভুল করে অন্যদিকে চলে যেতে পারি, কিছুদুর যাওয়ার পর একটা রাস্তা পেলাম সেখানে দেখলাম ওরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সাথে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম কোন দিকে মুভ করব। তখন পাকিস্তানিরা ডানদিক থেকে আমাদেরকে ঘেরাও করার চেষ্টা করল আমরা আমাদের অরিজিনাল পজিশন থেকে ব্যাক করেছি সেখান থেকে পিছিয়ে গেলাম তখন তারা আবার আমাদের উপর ফায়ার করা শুরু করলো। এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ওখান থেকে চলে আসলাম। তখনও সকাল হয়নি যখন সিমান্তে নাগর নদী পার হয়ে ভারতের বিওপিতে পৌঁছালাম তখন দেখলাম অফিসাররা সবাই ওখানে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে, তারপরে ওদেরকে আমরা জানালাম ডান দিকের যে কভারিং দলটি ছিল ওদের কোন সাড়া শব্দ নেই কভারিং পার্টিতে যারা ছিল সাপোর্ট আমরা তাদের কাছ থেকে পাইনি এখন কভারিং পার্টিতে আমার কোম্পানির ৪-৫ জন ছেলে ছিল তো এখান থেকে ব্যাক করে তাদেরকে আমি ধরেছি যে আমরা এরকম ভেতরে গেছি সেখানে তোমাদের কোন সাপোর্ট পেলাম

না সারা শব্দ পেলাম না কি হয়েছিল তোমাদের। তারপরও স্বীকার করলো ওরা যেখানে আসার কথা ছিল সেখানে আসেনি ওরা ভয়ে কথা বলতে পারেনি আর ওরা সেজন্য একটা স্কুলে বসে ছিল। আমরা বড় ধরনের একটা বিপদ থেকে সেদিন বেঁচে ফিরেছি আর এই অপারেশনের সাংকেতিক নাম ছিল অপারেশন খঞ্জর ১৮। এই যুদ্ধের খবর আকাশবানী কোলকাতা থেকে প্রচারিত হয়েছিল।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুল মমিন সরকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ দুইটি পর্বে বিভক্ত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্ব। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল। মুক্তি সংগ্রামের প্রথম সোপান ভাষা আন্দোলনের বছর ১৯৫২ সালে ১ জানুয়ারী কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলাধীন তুলাগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। পিতা মোহাম্মদ আলী সরকার, মাতা খাদিজা কেগম। বড় ২ ভাই ও ছোট ১ বোনের মধ্যে মমিন সরকার ২য়। জন্মের পর ৪ বছর বয়স থেকেই তিনি পার্শ্ববর্তী চান্দিনা উপজেলার কেরনখাল গ্রামে নানার বাড়ীতে নানীর অপত্য স্নেহে বড় হয়েছেন ও বেড়ে উঠেছেন।

তিনি কেরনখাল (চান্দিনা-কুমিল্লা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে মাধাইয়া বাজার ছাদিম উচ্চ বিদ্যালয় (চান্দিনা-কুমিল্লা) থেকে কৃতিত্বের সাথে এস এস সি, ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. এবং একই কলেজ থেকে ১৯৭২-এ বাংলা সাহিত্যে বি. এ. অনার্স এবং ১৯৭৩ সালে চট্রগ্রাম বিশাববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি বরাবরই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের পূর্বে সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামেও ছিল তার বলিষ্ঠ ভূমিকা। আশৈশব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মমিন সরকার হাইস্কুল জীবনের শুরুতেই ১৯৬২'র ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দেলনে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু করেন। ১৯৬৩ তে কুমিল্লায় তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দেলনে মাধাইয়া থেকে ১৬ মাইল পায়ে হেটে কুমিল্লা রেলস্টেশন অবরোধে অংশ নেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (২ জানুয়ারী ১৯৬৫ অনুষ্ঠিত) তৎকালীন ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্ধি সমগ্র পাকিস্তানের সম্মিলিত বিরোধী দলের সমর্থিত প্রার্থী পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র চির কুমারী ছোট বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ'র পক্ষে প্রচারনায় বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৫ সালে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ও সম্পূর্ন বৈরী পরিস্থিতিতে হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ২১ শে ফেব্রুয়ারী বিশাল গণমিছিল ও মিটিংয়ের মাধ্যমে মহান শহীদ দিবস পালন করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। কিশোর বয়সে সে দিন দৃপ্ত কন্ঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এর সাথে 'বাংলা ভাষা রাষ্ট্র চাই' শ্লোগান দিয়ে সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। ৭১ এ তাঁর এ শ্লোগান বাস্তবে রুপ দিতে পেরে তিনি গর্ববোধ করেন। ১৯৬৫'র সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় স্কুলের ছাত্রদের নিয় গড়ে উঠা সামরিক ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এ দলের নেতৃত্ব দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ ট্রেনিংটা সহায়ক হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।

১৯৬৬'র ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের ঢেউ তখন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ৬ দফা দাবী বাস্তবায়নের পক্ষে উত্তাল সে সময়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান সহ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতা যখন জেলে। তিনি তখন চান্দিনার ঐতিহ্যবাহী গরু বাজার মাঠে আওয়ামী লীগ এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা আমেনা বেগম এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীর বিশাল জনসভায় একমাত্র ছাত্র বক্তা হিসেবে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে নেতৃবৃন্দের নজর কাড়েন এবং জনসমক্ষে ব্যাপক সাড়া ও আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সরকার বিরোধী বক্তব্যের জন্য তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা / হুলিয়া জারী হয়। সে সময় পুলিশী হয়রানীর জন্য দশম শেণীতে তার পড়া লেখার চরম বিঘ্ন

ঘটে। সে বছরই কুমিল্লা টাউন হলের এক বিশাল জনসভায় জীবনে প্রথম শেখ মুজিবুর রহমানকে (তখন তিনি বঙ্গবন্ধু হননি) প্রথম খুব কাছে থেকে দেখার ও তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে দিনই শেখ মুজিবের আদর্শের রাজনীতি করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মফস্বল এলাকায় তখন কোন ছাত্র রাজনীতি ছিল না। দলীয় অনুসারী কোন ছাত্র সংগঠনও ছিলনা। সে সময় তিনি নিজ উদ্যোগে হাই স্কুলে ছাত্রলীগের আদর্শ অনুসারী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। মনের প্রতিবাদী ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য হাতে লিখে প্রকাশ করেন দেওয়াল পত্রিকা "জাগরণ"। সে পত্রিকায় লেখা শুরু করে পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুলেখক ও প্রতিথযশা সাংবাদিক সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৬৭ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তির পূর্ব শর্ত হিসেবে রাজনীতি না করার পারিবারিক কঠোর নির্দেশ সত্বেও তিনি সাংগঠনিক কোন পদ পদবী গ্রহণ না, করেই ছাত্রলীগের কর্মী হয়ে প্রতিটি আন্দেলন সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৬৯'র গণ অভ্যুত্থানে তিনি স্থানীয়ভাবে নেতৃত্ব দেন। তিনি গর্বের সাথে স্মরণ করেন ৬৯'র গণ অভ্যুত্থানের সময় চান্দিনায় স্মরণকালের বৃহত্তম গণ-জঙ্গী মিছিলে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে উত্তেজিত জনতাকে উস্কানীর মুখে নিয়ন্ত্রিত রেখে পুলিশের গুলি বর্ষনের মত একটি নাজুক পরিস্থিতি সামাল দিয়ে অনাকাংখিত প্রানহানি এড়াতে পেরেছিলেন। সে সময় মুসলিম লীগের বিডি মেম্বার, চেয়ারম্যানদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগের ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার নেতৃত্বে এলাকার বিডি মেম্বার ও চেয়ারম্যানগণ পদত্যাগে বাধ্য হন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থাণের মহানায়ক, তৎকালীন ডাকসু'র ভিপি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান জননেতা তোফায়েল আহমদ চান্দিনার এক জনসভায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে উৎসাহ প্রদান করেন।

১৯৭০'র সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ প্রর্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারনায় তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। দেবিদ্বার রিয়াজ উদ্দিন হাইস্কুল

মাঠে বঙ্গবন্ধুর এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা পরিচালনা ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করার দুর্লভ সৌভাগ্য তার শ্রেষ্ঠতম অম্লান স্মৃতি। সে ষবায় তিনি বঙ্গবন্ধুর স্নেহের হস্তস্পর্শ পেয়েছিলেন। সে সময় (১৯৭০-এর ডিসেম্বরে) কুমিল্লা টাউনহলে তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা (জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট) চট্রগ্রামের ফজলুল কাদের (ফ কা) চৌধুরীর সভায় ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে বাধা প্রদান এবং মিছিলে জুতা নিক্ষেপ করে তার মাথার পাকিস্তানের প্রতীক জিন্নাহ টুপি নর্দমায় ফেলে দিয়ে পুলিশের বেধড়ক লাঠি চার্জে আহত এবং অন্যান্য ১৮ জনের সাথে আটক হন। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে তিনি স্থানীয় (চান্দিনা-দেবিদ্বার) নির্বাচনী এলাকায় নৌকা মার্কায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে ব্যাপক প্রচার প্রচারণায় অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করেন।

জনাব মমিন সরকারের ভাষ্যমতে- ৭ই মার্চ ১৯৭১ দুপুর পর্যন্ত কুমিল্লা শহরের পশ্চিম প্রান্তে ধর্মপুরে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া কলেজের ডিগ্রী শাখায় অনার্সের ২য় বর্ষে ছিল পাকিস্তানে তাঁর শেষ ক্লাশ। ক্লাশ শেষে বিকেলে কুমিল্লা টাউনহলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে সরাসরি প্রচারিত হওয়ার ঘোষনা মোতাবেক তা শোনার জন্য অগনিত উদ্বেলিত জনতার সাথে সমবেত হন। বার বার ঘোষনা সত্বেও ভাষনটি সরাসরি প্রচারিত না হওয়ায় উদ্বেগ উৎকন্ঠা নিয়ে রাতে বি বি সি ও আকাশবাণী'র খবরে ভাষণের সারমর্ম এবং পরদিন সকাল ৮টায় রেকর্ডকৃত ভাষণটি শুনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেন।

'ঘরে ঘরে দুর্ঘ গড়ে তোল' বঙ্গবন্ধুর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি নিজ এলাকা বর্তমান ঢাকা চট্রগ্রাম মহা সড়ক সংলগ্ন কেরনখাল প্রাইমারী স্কুল (নুরীতলা বাজার) মাঠে এলাকার ছাত্র-যুবক-তরুনদের ১০০ জনের একটি চৌকষ দল গঠন করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও আনসার কমান্ডারদের সহায়তায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠাণিক স্বাধীনতার ঘোষনা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চালু রাখেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।
২৫ শে মার্চ রাতে ঢাকায় কি ঘটেছিল ২৬ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত সঠিক কোন তথ্য পাননি। পল্লী এলাকায় যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম রেডিও ছিল অপ্রতুল। চান্দিনা পোষ্ট অফিসে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন ছিল। খবর নিয়ে জানেন গত রাত

থেকে তা নিঃশব্দ হয়ে আছে। এরই মধ্যে বিবিসি, আকাশবাণী রেডিও এবং বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারেন ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনী অতর্কিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানায় ইপিআর ক্যাম্প, রাজারবাগে পুলিশ লাইনসহ নির্বিচারে আক্রমন করে বহু মানুষকে হত্যা করেছে। এ রাতে কুমিল্লা পুলিশ লাইন আক্রমন করে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। সদ্য নির্বাচিত এম পি মালেক সাহেবের রেইসকোর্সের পাকা বাসভবন গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ দিন সন্ধ্যা নাগাদ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাত্র সংসদ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন আলেখারচরে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ সৃষ্টিতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তখন রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে ঢাকা থেকে জীবন রক্ষার্থে পায়ে হেটে পালানো মানুষের স্রোত চান্দিনা এলাকা অতিক্রম করার সময় তিনি প্রশিক্ষণ স্থগিত করে প্রথমে ঢাকা থেকে জীবন রক্ষায় পলায়নপর মানুষের সেবায় তথা আশ্রয়, খাদ্য দিয়ে সহায়তার কাজে স্বেচ্ছাশ্রমে সবাইকে নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন। তখন ময়নামতি সেনানিবাস থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচা কিছু সৈনিক উনার এলাকায় আশ্রয় নেয়। তাদেরসহ ঢাকা থেকে পলায়নপর মানুষের আহার, আশ্রয়, নিরাপত্তা ও পরবর্তী গন্তব্যের পথে তিনি তার সাথীদের নিয়ে নিরলস সহায়তা করেন।

পরবর্তীতে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করার পর দিন ১৮ এপ্রিল' ৭১ সন্ধ্যায় এতদিনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র যুবকদের ৭০ জনের একটি দল নিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অভিমুখে পাকা রাস্তা ছেড়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে পায়ে হেটে যাত্রা শুরু করেন। বুড়িচং থানার কংশনগর খেয়াঘাট দিয়ে গোমতী নদী পার হয়ে পরদিন ভোরে ত্রিপুরার বঙ্গনগর, হাতিমারা হয়ে ত্রিপুরার মহকুমা শহর সোনামুড়ার পথে দেখা পান তৎকালীন ছাত্র নেতা মুজিব বাহিনীর ছাত্র বিষয়ক লিয়াজোঁ অফিসার এবং যুদ্ধকালীন কুমিল্লা জেলা মুজিব বাহিনীর কমান্ডার সৈয়দ রেজাউর রহমান সাহেবের সাথে। তার প্রদত্ত ঠিকানা অনুযায়ী সোনামুড়া শহরের হাসপাতাল রোডে টিলার উপর মাসিক ১৫ টাকা ভাড়ার গোপাল চৌকিদারের ছোট্র দোচালা টিনের ঘরে স্থাপিত মুজিব বাহিনীর ইষ্টার্ন কমান্ডের রিক্রুটিং ও ট্রানজিট ক্যাম্পে

গিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও জেলা ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে মিলিত হন। তার সাথে দেশ থেকে আগত দলের অন্য সবাইকে ছাড়াই শুধুমাত্র তাঁকে দেরাদুনে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়। পর দিন তিনি আগরতলা বিমান বন্দরে গিয়ে কার্গো প্লেনে উঠার পর সাথীদের কথা চিন্তা করে বিমান থেকে নেমে আবার সোনামুড়ায় চলে এসে অন্য সাথীদের নিরাপদে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন।

ইতোমধ্যে ১৯৭০'র নির্বাচনে দেব্বিার-চান্দিনা থেকে নির্বাচিত এম এন এ যুদ্ধাহত ক্যাপ্টেন (অবঃ) সুজাত আলী সাহেবের উদ্যোগে স্থাপিত ত্রিপুরার উদয়পুর মহকুমার ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে পালাটানা'য় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৃহত্তম ট্রেনিংক্যাম্পে অধিকাংশের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থায় সহায়তা করেন। জুন-১৯৭১ মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী কর্তৃক সোনামুড়া ক্যাম্প আক্রান্ত হলে নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি আগরতলা চলে যান। আগরতলার কলেজ টিলায় এ ক্যাম্প স্থানান্তরিত হয়। এর মধ্যে সাংগঠনিক কাজ এবং দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের প্রচারনামূলক বিভিন্ন পত্রিকা, লিফলেট, পোষ্টার পৌছে দেওয়া, বিতরন, পাকসেনাদের গতিবিধি, কার্যাবলী, গোপন সংবাদ সংগ্রহ, ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে দেশে প্রবেশে সহায়তা করাসহ দুরহ ও ঝুকিপূর্ন কাজে ৭/৮ বার তিনি দেশে আসা যাওয়ার সময় একাধিকবার শত্রুসেনার মুখোমুখি হয়ে অসম সাহসের পরিচয় দেন। বিশেষতঃ ইন্ডাকশনের সময় তার দুঃসাহসিকতার স্মৃতি সহযোদ্ধারা গর্বের সাথে স্মরণ করেন।

১৯৭১ এর জুলাই মাস পর্যন্ত আগরতলা যাতায়াত ও অবস্থানকালীন সময়ে তিনি আবদুল মান্নান চৌধুরী'র (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুন অধ্যাপক, বর্তমানে ওয়াল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি) সম্পদনায় আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ' পত্রিকায় লেখা ও প্রকাশনার কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কুমিল্লা ঢুলিপাড়ার শহীদ আবু তাহের খন্দকারের আন্তরিক সাহচর্যের স্মৃতি স্মরণ করেন। এ সময় (২৮-০৭-১৯৭১) তাঁর বিশেষ সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য "বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" প্রদত্ত সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমান আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল করিম সেলিম-এর স্বহস্তে

লিখিত এবং বঙ্গবন্ধুর ৪ খলিফা খ্যাত জাতীয় বীর আবদুল কুদ্দুস মাখন স্বাক্ষরিত একটি প্রশংসা ও পরিচয় পত্র সে গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে ।

১ আগষ্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর-১৯৭১ ভারতের আসাম রাজ্যের 'নর্থ কাছার হিলস' (বর্তমান ডিমাহাসো) জেলার 'হাফলং' সেনা শিবিরে ভারতীয় জেনারেল উবান এর তত্ত্বাবধানে উচ্চতর সামরিক ও গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি দলপতি বা গ্রুপ লীডার (ক্যাপ্টেন) এর দায়িত্বপালন করেন। সে সময়ে মুজিব বাহিনীর ৪ প্রধানের (শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহম্মদ, সিরাজুল আলম খান) অন্যতম অবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান ও জেনারেল উবান কর্তৃক ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় অভ্যর্থনা জানান।

তিনি বলেন- আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা কোন কনভেনশনাল যুদ্ধ ছিল না। এটা ছিল গেরিলা ওয়ার ফেয়ার। প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপটি ছিল 'হিট এন্ড রান-আঘাত কর, পালিয়ে যাও'। শত্রুকে চোরাগুপ্তা অতর্কিত হামলার মাধ্যমে সব সময় ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিত ও সন্ত্রস্ত রাখা। প্রয়োজনে নিজের সুবিধামত সম্মুখ সমরে লড়াই করা। গেরিলা যুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা যুদ্ধ জয়ের প্রধান কৌশল। পানি ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারেনা, ঠিক তেমনি জনগণের মাঝে নিজেদের লুকিয়ে রাখা গেরিলাদের অন্যতম কাজ। এখানে জনগণ হচ্ছে পানি, গেরিলারা হচ্ছে মাছ। বিএলএফ ট্রেনিং গ্রহণকারীদের সবাই ছিলেন দলীয় অনুগত, নিবেদিত প্রাণ, উচ্চ শিক্ষিত, মেধাবী। হাফলং সেনানিবাসে প্রশিক্ষণের সময় জেনারেল উবান বলেছিনে- 'এ বাহিনীর সদস্যরা পৃথিবীর সবচেয়ে শিক্ষিত ও স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গকারী সৈনিক।' প্রয়োজনের সময় প্রত্যেকের তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের যোগ্যতা ছিল। তাই প্রশিক্ষকরা ট্রেনিজদের ' লীডার' বলে সম্বোধন করতেন। অস্ত্র, গোলা বারুদ ও বিস্ফোকের সাথে প্রতিদিন রীতিমত রাজনৈতিক ক্লাস হতো। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে সাধারণ মানুষের মনোবল অটুট রাখা, যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহনের মানসিক প্রস্তুতির রুপ রেখাও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

দেড় মাস বিরতিহীন কঠিন কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে হাফলং থেকে ফিরে এসে মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক শেখ মনি'র হেড কোয়ার্টার আগরতলার নিমতলী গ্যাস ফ্যাক্টরী এলাকায় দিন কয়েক অবস্থানের সময় দেশ বরন্যে রাজনীতিবিদ ও বহু বীর সেনানীর একান্ত সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেন । তন্মধ্যে মুজিব বাহিনীর অন্যতম প্রধান শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি, শেখ সেলিম, সৈয়দ রেজাউর রহমান (স্টুডেন্ট লিয়াঁজো অফিসার এবং যুদ্ধকালীন কুমিল্লা জেলা বিএলএফ এর প্রধান) , ডা. নুরুল হোসেন চঞ্চল (সিলেট), অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, রবিউল আউয়াল কিরন (নরসিংদি), এ কে এম মাইনুল হুদা ডেপুটি কমান্ডার, কুমিল্লা), মোঃ ছফিউল্লাহ (চাঁদপুর), মোহামাদ আবু তাহের (সাবেক সচিব ও তথ্য কমিশনার), কাজী মোজাম্মেল (টঙ্গী). কুমিল্লা সদর উত্তর মহকুমা প্রধান মোঃ ইয়াছিন মিয়া এবং সহযোদ্ধাদের মধ্যে নাজমুল হাসান পাখি, রুস্তম আলী, আবদুল মতিন খসরু (সাবেক আইন মন্ত্রী), নুরুল ইসলাম মিলন (এম পি), ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্ত, রফিকুল ইসলাম- প্রমুখ অন্যতম।

এর মধ্যে বিশেষ সখ্যতা ও আন্তরিকতা ছিল ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, এম পি (প্রতিথযশা চিকিসক, সাবেক ভিসি- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) ও রফিকুল ইসলাম (২১ শে ফেব্রুযারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার রুপকার) এর সাথে। বিশেষ প্রযোজন ও পরামর্শের জন্য একাদিক বার দ্বারস্থ হয়েছেন জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর। পালাটানা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এবং পরবর্তীতে আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ ঘটে ক্যাপ্টেন (অবঃ) সুজাত আলী, অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ (চান্দিনা- সাবেক ডেপুটি স্পীকার), আজগর হোসেন মাষ্টার (দেবিদ্বার), অধ্যক্ষ আবদুর রউফ, অধ্যাপক মোঃ ইউনুছ, মতিউল ইসলাম মন্টু (এডভোকেট) এবং বন্ধু সহপাঠী সৈয়দ আহমদ বাকের- প্রমুখের সাথে।

জুন মাসে সোনামুড়া আক্রান্ত হলে এখানে অবস্থানরত কুমিল্লার তৎকালীন এম পি প্রফেসর খোরশেদ আলম সাহেবের স্ত্রী ও সন্তানদের মেলাঘর-এ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। মহিউদ্দিন মিয়া'র (চান্দিনা) নেতৃত্বে শিব নারায়ন দাশ, আজাদ, নাসির,

রুস্তম, ডা. ইব্রাহিম মজুমদার, মিলন, দৌলত, মালেক- প্রমুখ ১০ জনের একটি বিশেষ উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিএলএফ গেরিলা দলকে নিরাপদে দেশে (দেবিদ্বার-চান্দিনা) প্রবেশ করানোর দায়িত্বও তিনি পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে আগরতলার আশপাশের শরণার্থী শিবিরে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী, 'অগ্নিকন্যা' খ্যাত বেগম মতিয়া চৌধুররীর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে অনেকের সাথে উজ্জিবীত হয়েছেন।

প্রশিক্ষণ শেষে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে দেবিদ্বারসহ কুমিল্লা সদর উত্তর মহকুমার বরাদ্দকৃত বিপুল পরিমান অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে দেবিদ্বার ধানা ব্যান্ড প্রধান হাবিবুর রহমান ভুইয়াসহ একসাথে বুড়িচংয়ের গেবিন্দপুর খেয়াঘাট দিয়ে গোমতী নদী পার হয়ে ভারেল্লা-ফুলতলী-দিঘিরপাড় বাজার হয়ে ধামতী (দেবিদ্বার) গ্রামে কিছুদিন অবস্থানের পর রাজামেহার-এ ক্যাম্প স্থানান্তর করেন। ৪ জানুয়ারী দেবিদ্বার মুক্ত হওয়া পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন।

উচ্চতর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (লীডার এন্ড কমান্ডেন্ট) মমিন সরকার গেরিলা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়াও বেশ কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ৮ ডিসেম্বর চান্দিনায় ১২ শ পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পনের প্রাক যুদ্ধ এবং ১২ ডিসেম্বর বিজয়ের উষালগ্নে মাত্র ৪ দিন পূর্বে চান্দিনার মাইজখার ইউনিয়নের ফাঐ নামক স্থানে সংঘটিত সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন । ফাঐ যুদ্ধে তাঁর স্কুল জীবনের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বন্দীদশা থেকে সদ্য পালিয় এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী সেনা সদস্য ল্যান্স নায়েক সৈয়দ আহমদ (নাওতলা) এবং ইপিআর এর ল্যান্স নায়েক ও পালাটানা ক্যাম্পের প্রশিক্ষক কাজী আবদুল লতিফ (রাজামেহার) এই ২ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ৮ জন পাক সেনা নিহত হয়। এ যুদ্ধে মমিন সরকার, মফিজ ভুইয়া (বারেরা), আবদুল খালেক (দাড়িয়াপুর), কে এম সামসুল হক, ওয়ালী উল্লাহ, আঃ মান্নান, মফিজ (নাওতলা), খোরশেদ (মিরগঞ্জ) সহ আরো অনেকে অংশ গ্রহণ করেন।

যুদ্ধপূর্ব ব্যাপক রাজনৈতিক পরিচয়ের কারনে যুদ্ধ শেষে শান্তি শৃংখলা রক্ষায় তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। বিনা তালিকায় অস্ত্র জমা দেওয়ার অনিয়ম জনিত কুফল সম্পর্কে তখনই তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ এবং অনিয়মের প্রতিবাদ করেছিলেন। জানুয়ারী-৭২ ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে বে-হিসেবী অস্ত্র, নাম পরিচয় বিহীন বø্যাঙ্ক সার্টিফিকেট, নিম্নমানের একটি করে তুলট কম্বল, নগদ ১০০ শত টাকা প্রদানের প্রক্রিয়াকে তিনি সে দিনই ষড়যন্ত্রের অশনি সংকেত বলে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেদিন থেকেই ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা সৃষ্টির অশুভ সূচনা ঘটে। বিজয় পরবর্তী সময় থেকেই তিনি ভূয়া বা নকল মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩১ জানুয়ারী ঢাকা ষ্টেডিয়ামে মুজিব বাহিনীর ৪ প্রধানের উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদতলে অস্ত্র জমা দিয়ে তিনি আবার শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যান। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স এবং চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট জতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে চির প্রতিবাদী জনাব মমিন সরকার প্রতিবাদ মিছিল করে চান্দিনা থানা চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এরপর এ জন্য কিছু সময় তাঁকে আত্মগোপনে থাকতে হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেনা শাসক জিয়াউর রহমানের আমলে সম্পূর্ন বৈরী পরিবেশে মেধা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েও তিনি সরকারী চাকুরী প্রাপ্তিতে প্রথমে বাধাগ্রস্ত হন।

কর্মজীবনে তিনি ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তরে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। সাফল্যের সাথে চাকুরী জীবনে পরিচালক পদে পদোন্নতিসহ প্রবাদ প্রমাণ সততা, সুনাম এবং নিষ্ঠার কারনে তিনি বহুবার প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বর্ধিত ২ বৎসরসহ চাকুরী সমাপ্ত করে ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি পূর্ণ আবসর গ্রহণ করেন।

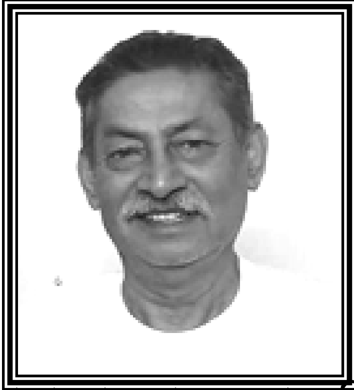
এ বীর মুক্তিযোদ্ধার আক্ষেপ- মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। এখন ভুয়া ও নকল মুক্তিযোদ্ধা নামধারীরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থ ও সুনাম চরমভাবে নষ্ট করছে। এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ, সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। তারপরও আশাবাদী এ বীর মুক্তিযোদ্ধা আস্থায় অবিচল, বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এ দেশটা একদিন 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা'য় পরিণত হবেই এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়।

ব্যক্তি জীবনে দুই কন্যাসন্তানের জনক জনাব সরকার মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তিনি একজন সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ। ছাত্রজীবন থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। তিনি বহু মঞ্চ নাটক, টিভি নাটকে অভিনয়, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার লাভ, অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রযোজনা, পরিচালনা করে সুনাম অর্জন করেছেন। ভ্রমণবিলাসী এ বীর মুক্তিযোদ্ধা চাকুরীর সুবাদে সমগ্র বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাড়াও পরবর্তীতে বহুবার ভারত ভ্রমণসহ নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, ব্রিটেন (লন্ডন) ভ্রমণ করেছেন। ছোট বেলা থেকেই ছবি তোলায় আগ্রহী, তাঁর এলবামে রয়েছে পুরনো স্মৃতিবহুল বহু ছবি। সমাজ সচেতন এ বীর মুক্তিযোদ্ধার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে অনেক লেখা, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ও বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং পেশাগত কর্তব্য পালনের সাথে সাথে সমাজ সেবামূলক অনেক সংগঠনের সহিত জড়িত আছেন। তন্মধ্যে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, কুমিল্লা জেলা সমিতি, দেবিদ্বার উপজেলা কল্যান সমিতি, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি রক্ষা পরিষদ, সাবেক প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার পানি উন্নয়ন বোর্ড মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও সভাপতি পানি উন্নয়ন বোর্ড বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও আরো অন্যান্য। রাজনীতিতে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা পদে বরণ করা হয়েছে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও অনুদানে

স্থাপিত হয়েছে একাধিক হাইস্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র (দুইটি কমিউনিটি ক্লিণিক)। তাঁর আদর্শ হচ্ছে- 'সৃষ্টির সেবাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত'। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন।

জয় বাংলা।



বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের মো. মুনির উদ্দিন

১৯৬৯ এ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন শুরু হয়, আমরা ছয় ভাই বোন তখন আব্বা আম্মার সাথে মোহাম্মদপুরে থাকতাম, আমার আব্বা ছিলেন পাকিস্তান পুলিশের অফিসার। হরতালের দিনে আমি হাঁটা শুরু করতাম হাঁটতে হাঁটতে মোহাম্মদপুর থেকে জগন্নাথ কলেজ, আবার জগন্নাথ কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতাম বটতলায়, এটা ছিল আমাদের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড, ৬৯ এর আন্দোলনে আমাদের ভিতরে প্রথম যে কয়জন গ্রেপ্তার হই তার মধ্যে আমি ছিলাম, আমার সাথে ডেইলি ষ্টার এর মাহফুজ আনাম টিটু ছিল, ঢাকা ইউনিভার্সিটির আফতাব ভাই ছিল, আরো কয়েক জন ছিল যাদের নাম মনে করতে পারছি না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আমি আমার দল ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে নানান জায়গায় মিটিং করেছি। নূরে আলম সিদ্দিকী ভাই, আসম আব্দুর রব ভাইয়ের সাথে, আমরা তখন ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। নানান জায়গায় মিটিং মিছিল করে বেড়াতাম। আমি খুব চিকনা ছিলাম এক জায়গায় এমন হলো যে আমাকে বলা হলো শেখ কামাল আসছে, শেখ কামালের বক্তৃতা দিতে হবে, আমি সেখানে শেখ কামাল সেজে বক্তৃতা দিলাম। স্থানটা ছিল জামালপুরের ইসলামপুর। ৭০ এর নির্বাচনে জয় লাভের পরে আমরা বিভিন্নভাবে আন্দোলন করতাম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ক্ষমতা পাবার জন্য। ৭০ এর ২৩ ডিসেম্বর আমার আব্বা বললো মুনির এর জন্য আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, ওর জন্য বাসায় পুলিশ আসে এখন

আর্মিও আসবে। ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেও, ঠিক সেদিনই ছাত্রলীগের সেন্ট্রাল কমিটির একটা মিটিং হল এবং মিটিং এর সিদ্ধান্ত হলো যাদের ট্রেনিং হয়ে গেছে এখন তোমরা যার যার এলাকায় চলে যাও এবং এলাকায় গিয়ে এলাকাকে সংগঠিত করো। তখন আমি দেখলাম যেহেতু আব্বা আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন আবার পার্টি থেকে সিদ্ধান্ত হল যার যার এলাকায় গিয়ে এলাকার লোকজনকে সংঘটিত করার, তাই আমি আমার জেলা ফেনীতে চলে গেলাম এবং আমার বড় চাচার বড় মেয়ের বাসায় গিয়ে উঠলাম এবং আমি আমার কর্মকান্ড চালাতে থাকলাম। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। ৭১ এর ২৬ মার্চ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠার পর দেখি রেডিও টিভি কোন চ্যানেল ধরতেছে না। চ্যানেল ঘুরাইতে ঘুরাইতে রেডিওর চ্যানেল আকাশবাণী কলকাতার চ্যানেলটি পেলাম, তখন খবর পড়ছিলেন দেব দুলাল বন্দোপাধ্যায়, খবরে শুনতে পেলাম বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। শুনতেই আমি রেডিও ফেলে দিলাম দৌড়, দৌড়ে আমি পাকিস্তান বাজার নামক একটা বাজারে গিয়ে দেখি জয় বাংলা শ্লোগান দিতেছে। একজন চাচা একটা রাইফেল এবং একটা টুটুবোর নিয়ে সাইকেলে করে যাচ্ছে, আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কই যাস আমি বললাম জয় বাংলায় যাচ্ছি। তিনি বললেন যাও, কাল রাতে আর্মি বের হয়েছে সকলকে অস্ত্র জমা দিতে বলেছে, আমি যাচ্ছি অস্ত্র জমা দিতে।

আমি ভাবলাম কি বলে পাগল অস্ত্র জমা দিতে যাচ্ছে, যাইহোক তার সাথে আমি দৌড়াচ্ছি দৌড়াচ্ছি যখন পাকিস্তান বাজারের কাছে এলাম আমি তার সাইকেলকে ধাক্কা দিলাম, সাইকেল সহ তিনি পড়ে গেলেন এবং আমি লোকজনকে বললাম, তখন আমরা তার অস্ত্র নিয়ে নিলাম, আমি টুটুবোরটা নিলাম এবং তার ব্যাগের ভিতরে ছয়টা না আটটা গুলি ছিল সেগুলো নিলাম। আবার যেতে লাগলাম শহরের দিকে। যেতে যেতে কোর্টের পাশে দীঘি ছিল, সেখানে গিয়ে দেখলাম অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। স্বাধীনতার পক্ষে কে কি করবে না করবে গাইড দিচ্ছে, ঢাকা চিটাগাং রোডে অনেক বড় বড় কড়াই গাছ ছিল, সিদ্ধান্ত হল কড়াই গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে রাস্তা ব্লক করে দেওয়ার। আমার কাছে যেহেতু টুটুবোর রাইফেল ছিল তাই আমি সেখানে অনেক সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেলাম। যাই

হোক আমি নেতৃত্ব দিতেছি কড়াই গাছ কেটে রাস্তা ব্লক করতেছি। আমাকে যারা চিনতো, যেমন ফেনীর ভিপি জয়নাল, তিনি বললেন মুনির এটা করো, মুনির ওটা করো। এর মধ্যে চলে আসলেন মেজর জাফর ইমাম। তিনি আসার পরে আমরা আরো সুসংগঠিত হলাম। কিছু ইপিআর আসল, এদিকে আর্মিরা কিন্তু এদিক থেকে বের হচ্ছিল না। আর্মিদের আমরা মোটামুটি ঘিরে রেখেছিলাম পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভেতরের দিকে। কিন্তু পহেলা এপ্রিল থেকে শুরু হল এয়ার স্ট্রাইপিং, আমার তো কখনো এয়ার স্ট্রাইপিং দেখি নাই। যখন এয়ার স্ট্রাইপিং হত বিকট শব্দ হতো, আমিতো দীঘিতে লাফিয়ে পড়েছিলাম তখন আমার হাত থেকে টুটুবোরটা দীঘিতে পড়ে গিয়েছিল, অনেক খোঁজাখুঁজি করে ও আর পাইনি। দুই জন আনসার ড্রেনের লাইনে ঢুকে আর বের হতে পারে নাই ওখানেই মারা গেছে। আমরা গাছ কেটে মেইন রোড ব্লক করেছিলাম কিন্তু ওরা আসতেছিল বিভিন্ন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ট্যাংক নিয়ে। এবার শুরু হলো আমাদের পালানো, আমি বেলুনিয়া শহরের দিক হয়ে আমাদের বাড়ির দিকে গেলাম ইন্ডিয়ায় যাওয়ার চিন্তা নিয়ে। আমার বাড়ি থেকে তিন দিকেই ইন্ডিয়ার বর্ডার, তখন বাড়িতে বসে বসে কি করব সাইকেলে করে ইন্ডিয়া যেতাম এবং ইন্ডিয়া থেকে এদিকে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিতাম। আর মাথয় আছে শধু কিভাবে যুদ্ধে যাব। এর পরে আগরতলা গেলাম, সেখানে ফার্মগেটের মিলন ভাই ছিল, সেখানে তাদের সাথে হোটেলে থাকতে লাগলাম কিন্তু টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেল, তখন আমার বন্ধু শহীদ বাকী থাকত কলেজ টিলায়, সেখানে গেলাম তার ব্যাগ থেকে ১৫০ রুপি ছিলো তা থেকে আমি ৫০ রুপি চুরি করলাম। এর পর আমি, আজিমপুরের সজিব ওর ভাই শ্যামল, সাচ্চু মিলে রওনা দিলাম কলার ট্রাকে করে ধর্মতলায় ট্রেন ষ্টেশনে যাব বলে। যাওয়ার পথে রাস্তাটা পাহাড়ি উঁচু-নিচু আঁকা বাঁকা রাস্তা ছিল, ট্রাকের ঝাকিতে আমাদের ভিতরের দুইজন বমি করতে করতে অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে গেল। ওরা যেতে পারলো না, আমি আর সাচ্চু কোন মতে ট্রেনের ভিড় ঠেলে ট্রেনের ভিতরে ঢুকলাম। ট্রেনে এতো ভিড় ছিল যে ট্রেনের টয়লেটে ও মানুষে ভর্তি ছিল। ৪ রাত ৩ দিনের জার্নি ছিল অনেক কষ্ট করে টিকে থেকে কলকাতায় পৌছালাম। উঠলাম হোটেল শ্রীনিকেতনে, সাচ্চু তোফায়েল ভাইয়ের কাছে গেল, ওবায়েদ ভাই, নূরে আলম

সিদ্দিকী ভাই, ফরিদপুরের রব ভাই ছিল সেখানে। আমি আর ফরিদপুরের মাসুদ পেপার বিছিয়ে খাটের নিচে থাকতাম, অনেক মানুষ সেখানে জায়গায় সংকলন হতো না। থাকতে থাকতে ওবায়েদ ভাই তোফায়েল ভাইকে বলতাম যুদ্ধে যাব, যুদ্ধে যাব, আমরা আসছি যুদ্ধ করতে। দুইদিন পরে আমাদের জানালো কাজ আছে দুইটা। কে কোথায় যাবা? একটা আছে এখানে ছাত্রদের সাথে, আর একটা ঢাকায় অপারেশন। ঢাকার অপারেশন টা ছিল আমেরিকান ডেমক্রেটরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে, সেই চিঠিটা ঢাকা থেকে সংগ্রহ করে এনে আমাদের তখনকার প্রধানমন্ত্রীর তাজউদ্দিন সাহেবের নিকট জমা দেয়া। আমরা গেলাম প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন এবং বললেন তোমরা কালকে যাবে। আমি, মোকাররম ভাই আর আনিস চলে আসলাম অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গ্রীন রোডের ঠিকানায় নির্দশনা অনুযায়ী। মিঃ চৌধুরীর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাদের কতগুলো খাম দিলেন। আমি বললাম ঠিক আছে আপনি তো খাম দিলেন আমরা যদি এগুলো নিয়ে এই কার্ফিউয়ের ভিতরে চিঠিগুলো সহ পৌঁছাতে না পারি তখন আমি গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কে কি বলবো? তিনি এটা বললেন আপনি এটা নিয়ে যাবেন এগুলো বিষয় বস্তু হচ্ছে, আমরা আমেরিকানরা এখানে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী বানাব, আমরাই সব কিছু করবো শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমাদের এইসব অপারেশনের কথা বলতে হবে। আমি সিগারেট কার্টুনের ভিতরে সেগুলো লুকিয়ে সিগারেটের ব্যবসায়ী সেজে ফেরার পথে নিজের বাসায় গেলাম, বাসায় গিয়ে দেখি কেউ নেই, আমি ডাকাডাকি করতে লাগলাম এর ভিতর একজন এসে বলল আপনার নাম কি মুনির? আমি বললাম আমি মুনির, সে বললেন এক্ষুনি বাসা থেকে বেরিয়ে যান। এখন আপনার বাবা এলিফ্যান্ট রোডে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকেন, আপনাকে যে কতবার আর্মিরা এই বাড়িতে এসে খুঁজে গিয়েছেন তার অন্ত নেই, বাড়ির সব কিছু নিয়ে গেছে লুটপাট করে যা ছিল। আমি এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় আসলাম, মা সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখে। আমি কি ভাবে বের হবো বুঝতে পারছি না। আমার বড় ভাই মুহিত, তিনিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাকে বললাম তুমি আমার কাপড়গুলো নিয়ে যাও বাসার কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে তুমি তোমার কাপড় গুলো লন্ড্রীতে দিতে যাচ্ছ। ওর পিছন পিছন বের হয়ে এসে আমি

আবার রওনা দিলাম, এবার আমি একা। আমার সাথে যারা এসেছিল তারা থেকে গেছে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আসলে আমাকে ধরল, জিজ্ঞাসা করল এটা কি আমি বললাম সিগারেট এবং সিগারেট ব্যবসায়ের শ্লিপ টা দেখালাম যা আমি আমার মামাত ভাইয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম, ওরা তখন আমাকে কালেমা জিজ্ঞেস করল, আমি বললাম, আমাকে ওরা ছেড়ে দিল। যাইহোক ওখান থেকে আমি কুমিল্লায় গেলাম। কুমিল্লা গিয়ে আমার বড় মামার বাসায় ভাত খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে রওনা দিলাম গোমতী নদীর পাড়ে। ৫ টাকা দিয়ে একটা কলাগাছ কিনলাম, কলাগাছের উপর ভেসে ভেসে অনেক কষ্টে নদী পার হয়ে অনেক দূরে গিয়ে উঠলাম। হাঁটতে হাঁটতে বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়ার ভিতরে পৌঁছাইলাম কোথায় থাকবো কিছু না পেয়ে একটা স্কুলের বারান্দায় গিয়ে হাতের ব্যাগটা মাথায় দিয়ে অনেক ক্লান্ত থাকার কারনে ঘুমিয়ে পড়লাম। এর মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটলো। ঘুমাইতেছি এমন সময় বুঝতে পারলাম বৃষ্টি এসে আমার মুখে পড়তেছে, ওকে হালকা পানি পড়াতে ভালো লাগছে বিধায় আমি মজা নিতেছি চোখ বন্ধ করে। এরপর বুঝতে পারলাম বৃষ্টি বাড়ে আবার কমে, আমি চোখ খুলে দেখলাম একটা গাই গরু আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতেছে আর ওইটা আমার মুখে আসতেছে আমি মনে করেছিলাম বৃষ্টি পড়ছে। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে পাশে কলের পানি দিয়ে মুখ ধুইয়ে আবার রওনা দিয়ে কলকাতায় আসলাম। এসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করলাম। খামগুলো তাকে দিলাম তিনি খানগুলো নিয়ে তার পাশে ময়লা ফেলার একটা ঝুড়ি ছিল সেটার মধ্যে ফেলে দিলেন। আমি তাজউদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে আমাদেরকে কেন পাঠানো হলো। যেতে আসতে আমাদের দুইবার মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে। উনি কিছু না বলে পাশের একজনকে বললেন ওকে ২০০ টাকা দিয়ে দে। এই আমার মোড় ঘুরে গেল। পরে বুঝলাম উনি ওদেরকে ও ঠান্ডা রাখলো আর এটা নিয়ে যেন ঘাঁটাঘাঁটি না সেটাও করলেন। কিন্তু এসবের পিছনে ছিল খন্দকার মোস্তাক, তখন আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল, তখন তাজউদ্দিন সাহেব আমার অবস্থা দেখে আমাকে বললেন ঠিক আছে তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হও, প্রতি ক্যাম্পে গিয়ে খবর নিবে কি ধরনের লোক আসতেছে মুক্তিযুদ্ধে এবং এসব খবর নিয়ে তুমি আমাকে দিবে। আমাকে একটা হেলিকপ্টার

দিলেন, একজন ওয়েল ট্রেন্ড প্যারা ট্রুপার্স দিলেন, এই চাকরিটা দিলেন আমাকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে, আমি কয়েকদিন করার পরে এইসব মনোটনাস কাজ ভালো লাগলো না, আমি ছিটকে গেলাম। আমি প্রধানমন্ত্রী তাইজুল ইসলাম সাহেবকে বললাম আমি চাকরি করব না আমি যুদ্ধে যাব। তখন উনিও আমার উপরে রাগ করলেন। তাজউদ্দীন সাহেব সাধারণত রাগ করেন না কিন্তু আমার উপরে রাগ করলেন এতো বড় একটা চাকরি দিলেন কিন্তু আমি না করে বলতেছি যুদ্ধে যাব। আমি আবার চলে গেলাম আগরতলা। সেখানে শহীদ মানিক ভাই, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। তাদের মাধ্যমে আমার কিছু সিনিয়র ও আমার কিছু জুনিয়ার মিলে আমরা চলে গেলাম আব্দুল জলিল সাহেবের ইয়ুথ ক্যাম্পে। ওখানে কিছুদিন প্রশিক্ষণ নিলাম এরপর চলে আসলাম মেলাগড় ক্যাম্পে, সেখান থেকে আমাদের আবার পাঠানো হলো বাগমারা ক্যাম্পে।

ওখানে আমাদের তিন মাসের জন্য পাঠিয়েছিল কিন্তু তিনদিন পরে আমাদের আবার ফেরত পাঠিয়ে দিল। আবার মেলাগড় ক্যাম্পে আসলাম। সেখানে আমাদের সাথে ছাদেক হোসেন খোকা, আজম খান, আর্টিস্ট শাহাবুদ্দিন, মায়া ভাই, আলম, বাদল ভাই, আমরা একসাথে ছিলাম, এরাই ক্রাক প্লাটুনে ছিল। কয়েক দিন পর আমরা গ্রুপ আকারে দেশে প্রবেশ করি। আমাদের সাথে ফরিদপুর একটা গ্রুপ আর আরেকটা গ্রুপের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছেনা। রওনা দিয়েছি, একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে যেতে হয়। নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার যদি বলে রাজাকাররা তাহলে আর্মি নেই, আর পাকিস্তান জিন্দাবাদ বললে আর্মি আছে, এভাবে লোকাল রাজাকাররা আমাদের সহযোগীতা করতো। এলএমজি সহ আরো অনেক অস্ত্র আছে আমাদের সাথে, আমাদের কে কি করবে। আমরা একটা খাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে আছি। সামনে রেল লাইন, ওই পাশেও বাংলাদেশ এই পাশেও বাংলাদেশ। হঠাৎ করে দেখি রাতের অন্ধকারে গুলাগুলি শুরা হয়ে গেছ। চারদিকে গুলাগুলি আর মর্টারের সেল পড়তেছে। চোঁখ খুলে দেখি আমি ছাড়া আর কেউ নাই নৌকায়। আমার নৌকার আসাদ, মামুন ভাই, টিপু ভাই, হাবিব ভাই ও কর্ণেল তৌফিক ছিল। যুদ্ধের পরে তৌফিক ভাই আর্মিতে গেছে। সেখানে কেউ নাই এদিকে নৌকা ভর্তি আর্মস। আমি লাফ দিয়ে

পড়ে নৌকা ধরলাম। নৌকা ধরে দুই তিনটা ধাপ এগিয়ে খাডিতে সাইড হয়ে গেলাম। এর মধ্যে আমার পা ঝোপ করে ধরে ফেলল। তখনতো তারুন্য শুরু সবে কলেজে পরি। পানির নিচে অনেক কিছু আছে আগে শুনতাম। তাহলে কি শিকলই ধরল আমাকে। আমি নৌকাটাকে এক হাতে ধরে আরেক হাতে পা ছাড়াতে গেলে তখন আমার হাতও ধরে ফেলল। আমি তখন শরীরের সব শক্তি দিয়ে ওইটাকে টেনে তুলে দেখি যে টিপু ভাই। তখন টিপু ভাইকে বললাম, উঠেন নৌকায় উঠেন, টিপু ভাই বলল যে না আমি উঠতে পারবো না, আমার পরনে কাপড় নাই। তো উনাকে ধাক্কা দিয়ে উঠাইয়া দিলাম। পরে আমরা চইলা আসলাম। চিন্তা করতেছি যে এই রাত্রে কে খাওয়াবে। সেখানে স্থানীয় যারা ছিল তারা দুই এক জন করে নিয়ে খাওয়াতে চাইল। হঠাৎ করে একজন রিকসাওয়ালা বলল যে আমি একজনকে খাওয়াতে পারব। তখন খুব বৃষ্টি পড়ছিল এদিকে আমি বলে উঠলাম যে আমি যাব তোমার সাথে। তার বাড়ি গিয়ে দেখলাম ১০ ফিট এবং ৫ ফিটের একটি তালপাতার ঘর। আর পিছনে একটা ছোট রান্না ঘর। আমাকে নিয়ে ঘরে বসাইছে এবং আমি হাটু গেড়ে বসছি। এখন তাদের কথা শুনতেছি, উনি তার বউকে বলতেছি আমি একটা মুক্তি আনছি এখন তাকে ভাত খাওয়াতে হবে। তার স্ত্রী বলতেছে, ভাত আছে কোনো সালুন টালুন নেই। তখন রিকসাওয়ালাটা বলতেছে যে বড় মুরগিটা কি হইছে? বউ বলতেছে ডিম পাড়তেছে, মুরগিরে ওমে বসামো। রিকসাওয়ালা বললো সে থাক ডিম পাতি, তুই মুরগি বাইর কর। আমি ঠিক মুখটা তুইলে বলতে যাব যে কোনো কিছু দরকার নাই, আমাকে খালি ভাত, লবণ, আর ডাইল দেন। এই বলতে বলতে শুনি যে "কা" মুরগি জবাই হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরে তাদের অনেক যায়গায় খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। যাই হোক পরে বের হয়ে বিলের মধ্যে রাস্তা হারাই ফেলাইলাম। বিলের মাঝের ধান গাছ লেগে হাতগুলা ছিলে গেছিল। রাজাকারদের সাথে অস্ত্র নিয়ে অনেক কাহিনী হয়েছে। এর পর আমরা কুমিল্লার দিকে এক জায়গায় গিয়ে উঠলাম এবং এক রাত থাকলাম। চেয়ারম্যান এসে আমদের খাইয়ে দিল এবং অনেক দূরে একটা জায়গায় আমাদের ছেড়ে দিল। তারপর গোমতী নদী আর দেবীদ্বার হয়ে আসতেছি। সেখানে মাঝে মাঝে ছোট খালে কালভার্ট ছিল। আমরা একসময় একটা কালভার্টেও ঢুকছি আর ওদিক থেকে আর্মি ও আসছে। তখন

আমরা কালভার্টের মাঝখানে ধরে ঝুলে পরলাম। আমাদের নৌকাটা ছিল খড়ির নৌকা। দুই সাইডে ছিল খড় আর মাঝখানে ছিলাম আমরা। এর পর এসে নামলাম আর আর্মিরা ওই দিনই ওই গ্রামটা পুড়িয়ে দিয়েছিল।

মানিক ভাই বলল যে গোয়াল ঘরে গর্ত করে আর্মসগুলো রেখে সবাই যার যার মতো ঢাকা চলে যাও, যখন তোমাদের এখানে প্রয়োজন হবে আমি ডাকবো। তারপর সবাই গেছে আসছে, এদিকে আমি একদিন গিয়ে এক রাজাকার চেয়ারম্যানের বাড়িতে উঠে পড়লাম। আমি বললাম যে আমাদের কোম্পানীর প্রায় দে দুই হাজার লোকজন আসার কথা আমি তো আগেই চলে আসছি। তখন তিনি বললেন যে বাবা দেখ আমি কারো ক্ষতি করিনি। তুমি যে নৌকায় আসছ, সে নৌকার করে চলে যাও আর তাদের আসতে মানা করো। তো আমি এই শুনে চলে আসলাম আর কখনো যাইনি। আর অপারেশনের কথা কি বলবো। অনেকে অনেক বড় বড় অপারেশন করেছি কিন্তু আমি সেরকম কোনো অপারেশন করিনি। তবে যে দুই জিনিস আমি করেছি সেগুলোর মধ্যে একটা হলো সেগুনবাগিচা থেকে একটা মেশিন হাইজেক করা (যেটার মাধ্যমে খবরের কাগজ ছাপানো হতো)। এই মেশিনটা দিয়ে কার কি খবর এগুলো খুজে ছাপানো হতো এবং সেগুলা মানুষের দরজার নিচে দিয়ে দিতো। আর ব্যাংক এ একটা অপারেশন করেছি। মেইন অফিস থেকে খবর আসলো যে খাবার দাবার কিছু নাই, পারলে কিছু টাকা পয়সা পাঠাতে। তো পয়সা দেওয়া মতো কোনো অবস্থা আমদের ছিল না। তাই আমরা ব্যাংক এ অপারেশন করে সেই টাকা পাঠাই। এছাড়াও ছোট খাট কিছু অপারেশন ছিল।

নতুন প্রজন্মের কাছে আমার কথা হলো তোমারা কোন ভাবে বিপথে যেওনা। বঙ্গবন্ধু যে আদর্শ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন সে আদর্শ নিয়ে তোমরা এগিয়ে চলো।

বাংলাদেশের ইতিহাস

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

প্রথমে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আগমন ঘটে ১২০৪ শতকে। এ সময় তিনি বাংলার পশ্চিমে নদীয়া ও উত্তর বাংলার কিছুটা অংশ দখল করেন। তবে ১২০৬ সালে বিহার অভিযানে তিনি মারা যান।

বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস চার সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে সেই ক্যালকোলিথিক যুগ থেকে চলে আসছে। দেশটির প্রারম্ভিক ইতিহাস হচ্ছে আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার ইতিহাস।

ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমণ ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে সামরিক বিজয়ের পাশাপাশি শাহ জালালের মতো সুন্নি দাঈদের নিরলস প্রচেষ্ঠায় ধীরে ধীরে ইসলাম এদেশে প্রভাবশালী ধর্ম হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে মুসলিম শাসকরা মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এই অঞ্চল শাহী বাংলা হিসেবে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক শাসিত হয় যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং আঞ্চলিক সাম্রাজ্যগুলোর উপর সামরিক আধিপত্যের সূচনা করে। ইউরোপীয়রা সেসময় এই শাহী বাংলাকে বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে ধনী দেশ বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে এই অঞ্চলটি মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ধনী প্রদেশ হিসাবে পরিগণিত হয়। বাংলা সুবাহ গোটা মুঘল সাম্রাজ্যের জিডিপির প্রায় অর্ধেক এবং বিশ্ব জিডিপির ১২% উৎপাদন করে যা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের থেকেও বেশী ছিল। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রাথমিক শিল্পায়ন যুগের সূচনা করে। এ সময় রাজধানী শহর ঢাকার জনসংখ্যা এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলা নবাবদের অধীনে একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয় যার শাসনভার শেষ পর্যন্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাতে ন্যাস্ত হয়। তারপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের

মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ অঞ্চল দখল করে। বাংলা সরাসরি ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবে অবদান রাখে কিন্তু এর ফলে তার নিজের শিল্পায়ন ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলা ও ভারতের পৃথকীকরণের মাধ্যমে আধুনিক বাংলাদেশের সীমানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ফলে এই অঞ্চলটি নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর নয় মাসব্যাপী সংগঠিত হওয়া রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পর নতুন রাষ্ট্রটি দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাপক দারিদ্র, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মত অসংখ্য সমস্যার মুখোখুখি হয়। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পরে দেশটিতে আপেক্ষিক শান্তি স্থাপিত হয় এবং দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মানবসম্পদ ও পোশাকশিল্পে অগ্রগতির মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে সমগ্র বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

বাংলা শব্দের উৎপত্তি:

'বাংলা' বা 'বাংগালা' শব্দটির সঠিক উৎপত্তিটি অজানা রয়েছে। সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি এ অঞ্চলে বসবাসকারী দ্রাবিড় গোষ্ঠী 'বঙ' থেকে 'বঙ্গ' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য সূত্র থেকে ধারণা করা হয় যে অস্ট্রিক জাতির সূর্যদেবতা "বোঙ্গা" থেকে বঙ্গ কথাটির উদ্ভব হয়েছে। মহাভারত, ভারতীয় পুরাণ ও হরিবংশের মতে রাজা বলির বঙ্গ নামে এক ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন যিনি প্রাচীন 'বঙ্গ রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দের নেসারী শিলালিপিতে প্রথম 'বঙ্গলা' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে যেখানে ধর্মপালকে 'বঙ্গলার রাজা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে বাংলা আক্রমণকারী চোল সাম্রাজ্যের রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলার নথি নিশ্চিত করে যে, সে সময় গোবিন্দচন্দ্র বাংলার শাসক ছিলেন। সেই নথিতে বাংলাকে "বাঙ্গালা-দেশ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাংলার বর্ষাকালের স্পষ্ট বর্ণনাস্বরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে

যে, বাঙ্গালা-দেশ যেখানে কখনও বৃষ্টি থামেনা। সুলতান ইলিয়াস শাহ "শাহ-ই-বাঙ্গালাহ" নামক উপাধি গ্রহণ করেন এবং তারপর থেকে সকল মুসলিম সূত্রেই বাংলাকে বাঙ্গালাহ বলা হয়েছে।

বর্তমান আধুনিক বাংলাদেশের কিছু অংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে বঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়েছিল। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের দুটি প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিল বঙ্গ ও পুণ্ড্র।

প্রাচীন বাংলা ও প্রাক-ঐতিহাসিক বাংলা:

অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সম্পর্কে কোন ধরনের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, এ সময় বাংলায় ইন্দো-আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলয়েডদের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং তাদেরই মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের নাম ছিল বঙ্গ।

বাংলা বদ্বীপটি কয়েক সহস্রাব্দ ধরে ঘন জঙ্গল ও জলাভূমির দ্বারা গঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলের একটি বড় অংশ সুদীর্ঘ সময় ধরে এভাবেই স্থায়ী ছিল। এরপর মানুষের পদচারণায় জঙ্গলের ক্ষতি সাধিত হয়। তবে মানুষ ঠিক কবে প্রথম বাংলায় প্রবেশ করে সে ব্যাপারে গবেষকদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। একদল গবেষক দাবি করেন যে, মানুষ ৬০,০০০ বছর আগে চীন থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছিল। অন্য আরেকটি দলের মতে; ১০০,০০০ বছর আগে এখানে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ খুবই দুর্বল। এখানে নিওলিথিক ও ক্যালকোলিথিক যুগের মানুষের উপস্থিতির খুব একটা প্রমাণ মেলে না। ধারণা করা হয় যে, এই প্রমাণ না থাকার পেছনে নদীর গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনই দায়ী। বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থান স্পৃশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক অবশিষ্টাংশের জন্য উপযুক্ত নয়। পাথরের অভাবে প্রাচীন বাংলার মানুষ সম্ভবত কাঠ ও বাঁশের মতো উপকরণ ব্যবহার করত যা সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকতে পারে নি। তাই দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিকরা বাংলাকে ব্যতিরেকে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের উপর চর্চা করছিলেন। আর যেসব প্রত্নতাত্ত্বিকরা বাংলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, তারাও প্রাচীন নয়, বরং বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে মনোনিবেশ করেন।

বাংলা বদ্বীপে যে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলো পাওয়া গিয়েছে তার পুরোটাই এই

বদ্বীপের চারপাশের পাহাড়গুলো থেকে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পূর্ব ভূখণ্ড বাংলার প্রাচীন লোকদের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহের সর্বোত্তম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। লালমাই, সীতাকুণ্ড এবং চাক্লাপুঞ্জিতে জীবাশ্ম কাঠ তৈরীর ব্লেড, স্ক্র্যাপার ও কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে যা বার্মা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত আবিষ্কারের অনুরূপ। এছাড়া উত্তর পূর্ব বাংলাদেশে বড় বড় প্রাগৈতিহাসিক পাথর পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে কৃষিকাজের প্রচলন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী কৃষি সমাজের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে একটি স্থির সংস্কৃতির জন্ম দেয়। ফলে একদিকে যেমন শহর-নগর গড়ে উঠে, অন্যদিকে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও প্রাচীন রাজনীতিরও উদ্ভব হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা উয়ারী-বটেশ্বরে একটি বন্দর আবিষ্কার করেছেন যা প্রাচীন রোম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করত। তারা সেখানে মুদ্রা, মৃৎশিল্প, লোহার তৈরী প্রত্নসম্পদ, ইটের রাস্তা ও একটি দুর্গ আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কারগুলো প্রমাণ করে যে, অঞ্চলটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র, যেখানে লোহা গলানো এবং মূল্যবান পাথরের পুঁতির মতো শিল্প ছিল। স্থানটিতে মাটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। মাটি ও ইট প্রাচীর নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হত। মাটির তৈরি সবচেয়ে বিখ্যাত পোড়ামাটির ফলকগুলো চন্দ্রকেতুগড় থেকে এসেছে এবং তা দেবতা, প্রকৃতি ও সাধারণ জীবনের দৃশ্য চিত্রিত করেছে। উয়ারি-বটেশ্বর এবং চন্দ্রকেতুগড়ে (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রাগুলোয় নৌকা চিত্রিত রয়েছে।

বাংলাদেশে সংগঠিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের ঘইচড (উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ চিক্কণ মৃৎপাত্র) যুগের (৭০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নিদর্শন প্রকাশ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে লৌহ যুগের সংস্কৃতি প্রায় ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয় এবং ৫০০-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। উত্তর ভারতের ১৬টি মহা রাজ্য বা মহাজনপদের উত্থান এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে এই যুগ বিরাজমান ছিল। প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চল, বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ বা প্রাচীণ বঙ্গ রাজ্য এই মহাজনপদগুলির অংশ ছিল, যা ষষ্ঠ শতকে সমৃদ্ধ হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত), মহাস্থান এবং ময়নামতীর মতো উন্নত শহর গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান শহরগুলো

সমুদ্রতীরের পরিবর্তে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠতে দেখা যায়। মহাস্থান থেকে বাংলাদেশের প্রাচীনতম লেখা একটি পাথরের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় যা থেকে বোঝা যায় যে, স্থানটি মৌর্য সাম্রাজোর একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। মহাস্থান তখন একটি প্রাদেশিক কেন্দ্র ছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রাকৃত ভাষায় লেখা এই শিলালিপিতে জরুরী পরিস্থিতিতে সরবরাহ মজুত করার আদেশ রয়েছে। শিলালিপিটির নাম মহাস্থান ব্রাহ্মী শিলালিপি। বাংলা ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত। সে সময় পশ্চিমবঙ্গের তাম্রলীপ্তি ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দর।

বাংলার প্রাচীন অঞ্চলগুলো হচ্ছে ভাগীরথী-হুগলী অববাহিকা, হরিকেল, সমতট, বঙ্গ ও বরেন্দ্র। বঙ্গ ছিল বাংলার মধ্যাঞ্চল, হরিকেল ও সমতট বাংলার পূর্বাঞ্চল এবং বরেন্দ্র ছিল বাংলার উত্তরাঞ্চল। স্থানগুলোর নাম এই ইঙ্গিত দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তিব্বতী-বার্মান, অস্ট্রো-এশীয় এবং দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলতেন। ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে এখানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা লক্ষণীয় হয়ে উঠে।

ভাষাগতভাবে, এই ভূখণ্ডের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী হয়তো দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত যেমন কুরুক্স, বা সম্ভবত অস্ট্রো-এশীয় ভাষায় কথা বলত যেমন সাঁওতাল। পরবর্তীকালে, তিব্বতী-বার্মানের মতো অন্যান্য ভাষা পরিবারের লোকেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করে। সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল মগধের অংশ হিসেবে ইন্দো-আর্য সভ্যতার অংশ হয়ে উঠেছিল। নন্দ রাজবংশ হচ্ছে প্রথম ঐতিহাসিক রাষ্ট্র যা ভারতী-আর্য শাসনের অধীনে বাংলাদেশকে একত্রিত করেছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের উত্থানের পর অনেক পুরোহিত ধর্ম বিস্তারের জন্য এখানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং মহাস্থানগড়ের মতো অনেক স্তম্ভ স্থাপন করেছিল।

প্রথমদিকের উপনিবেশায়ন:

বাঙ্গালী জাতি প্রাচীন ভারতের একটি পরাক্রমশালী সমুদ্র অভিযাত্রী জাতি ছিল। শুধু বাঙ্গালী জাতিই নয়, প্রাচীনকালে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জাতি, যেমন বাঙ্গালী, কলিঙ্গী, তামিল প্রভৃতি জাতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নানা উপনিবেশ গড়ে তুলতেন। তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে এরকম একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এটি শ্রী বিজয় সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। ভিয়েতনামের

ইতিহাসে উল্লেখ আছে ভারতবর্ষের বন-লাং (বাংলা) নামক দেশ থেকে লাক লোং (লক্ষণ?) নামক এক ব্যক্তি ভিয়েতনামে গিয়ে "বন-লাং" নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বন-লাং যে ভারতবর্ষের বাংলা সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই বাঙালীদের রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে উল্লেখ আছে বঙ্গ দেশ থেকে আগত বিজয় সিংহ নামে এক ব্যক্তি স্থানীয় দ্রাবিড় রাজাদের পতন ঘটিয়ে সিংহল (সিংহ বংশীয়) নামে একটি নতুন রাজ্যের পত্তন করেন। বিজয় সিংহকে সিংহলী জাতির পিতা হিসেবে পরিগণিত করা হয়। বিজয় সিংহকে নিয়ে শ্রীলঙ্কায় একটি মহাকাব্যও রয়েছে যা "মহাবংশ" নামে পরিচিত।

নন্দ সাম্রাজ্য:

নন্দ সাম্রাজ্য ছিল বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় যুগ। এই যুগে বাংলার শক্তিমত্তা ও প্রাচুর্যে শীর্ষে আরোহণ করে। এই যুগে বাংলা সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। নন্দ রাজাদের জন্ম হয়েছিল বাংলায়। তারা বাংলা থেকে মগধ (বিহার) দখল করে এবং উভয় রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে বঙ্গ-মগধ নামে একটি নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করে। প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসে বাংলাকে গঙ্গারিডাই এবং মগধকে প্রাসি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রিক ইতিহাসে এই সংযুক্ত রাজ্যকে গঙ্গারিডাই ও প্রাসি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন নন্দ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী ব্যাপক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি কোশল (উত্তর প্রদেশ), কুরু (পূর্ব পাঞ্জাব), মৎস্য (রাজপুতানা), চেদী (মধ্য প্রদেশ ও বিহারের মধ্যস্থিত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল),অবন্তী (মধ্য প্রদেশ) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। দিগ্বিজয়ার্থে মহাপদ্ম এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। তৎকালীন ইতিহাস অনুসারে মহাপদ্মের অধীনে ২,০০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ অশ্বারোহী, ৪,০০০ যুদ্ধরথ ও ২,০০০ হস্তীবাহিনী ছিল। মতান্তরে তার নিকট ২,০০,০০০ পদাতিক, ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ৮,০০০ যুদ্ধরথ ও ৬,০০০ হস্তীবাহিনী ছিল।

"কথাসরিৎ সাগর" থেকে জানা যায় তিনি দক্ষিণ ভারতেরও বিরাট অংশ জয় করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের কলিঙ্গ ও অশ্মক এ রাজ্য দুটো জয় করেছিলেন। অশ্মক হচ্ছে মহারাষ্ট্রের পূর্ব অংশে একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম। এটি

দক্ষিণ ভারতে আর্যদের একটি বিখ্যাত উপনিবেশ ছিল। কলিঙ্গ হচ্ছে উড়িষ্যার প্রাচীন নাম। কলিঙ্গের হস্তিগুম্ফ শিলালিপি থেকে জানা যায় মহাপদ্ম কলিঙ্গে জল সেচের জন্য একটি বিরাট জল প্রণালী নির্মাণ করেছিলেন। তিনি কলিঙ্গ থেকে একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তিও রাজধানীতে নিয়ে যান। মহাপদ্ম ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হন। সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে তিনি একরাট উপাধি গ্রহণ করেন। পরে তাকে অনুসরণ করে পশ্চিম ভারতের রাজারা বিরাট ও দক্ষিণ ভারতের রাজারা সম্রাট উপাধি গ্রহণ করে।

মহাপদ্ম নন্দের পর ক্ষমতায় আসীন হন তার পুত্র ধননন্দ বা উগ্রনন্দ। ধননন্দের সময় রাজ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। ধননন্দের সময়ে পাটলিপুত্রে পাঁচটি ধর্মস্তূপ নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীণ ভারতের বিভিন্ন ইতিহাসে ধননন্দকে অর্থপিপাসু রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

উগ্রনন্দের বা ধননন্দের সময় গ্রিক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু উগ্রনন্দ একটি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হন। প্লুতার্ক বলেছেন, রাজা পুরুষোত্তমের (পোরাস) সাথে যুদ্ধের পর মেসিডোনিয়ার সৈন্যরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আরও প্রবেশের জন্য অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। তারা জানতে পারে গঙ্গা নদী যা ২৩০ স্টেডিয়া বিস্তৃত ছিল এবং ১০০০ ফুট গভীর ছিল, তার পাশের সমস্ত তীর সশস্ত্র যোদ্ধা, ঘোড়া এবং হাতি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আবৃত ছিল। গঙ্গারিডাই ও প্রাসি এর রাজা তার (আলেকজান্ডার) জন্য ২,০০,০০০ পদাতিক, ৮০,০০০ অশ্বারোহী বাহিনী, ৮,০০০ যুদ্ধরথ ও ৬,০০০ হস্তিবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যঃ

মৌর্য সাম্রাজ্যেরশাসনকালে মহাস্থান (পুণ্ড্রনগর) কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল বলে ধারণা করা হয়। তৃতীয় মৌর্য সম্রাট অশোকের ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা শিলালিপি এখানে পাওয়া গিয়েছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে (মৌর্য শাসনকালীন গ্রন্থ) বলেছেন, পুণ্ড্রের কৌষেয় বস্ত্র মরকত মণির মতো মসৃণ। একে পৌণ্ড্রিকা বলা হয়েছে। এ ধরনের বস্ত্র শুধু মগধ ও পুণ্ড্রে উৎপন্ন হতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বঙ্গের এক প্রকার বস্ত্রকে “বাঙ্গিকা” বলা হয়েছে যা শ্বেত বর্ণের হতো। সর্বোপরি

এ গ্রন্থে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের প্রশংসা করা হয়েছে।

ধ্রুপদী যুগ গৌড় সাম্রাজ্যঃ

ষষ্ঠ শতকের মধ্যে উত্তর ভারত শাসনকারী বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে মগধ (বিহার) ও মালব (মধ্য প্রদেশ) এ রাজ্য দুটি গুপ্ত বংশের দুটি শাখা দ্বারা শাসিত ছিল। অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল উত্তর প্রদেশের মৌখরী রাজ্য এবং পাঞ্জাবের পুষ্যভূতি রাজ্য। শশাঙ্ক ছিলেন মগধের গুপ্ত সম্রাট মহাসেন গুপ্তের একজন সীমান্তবর্তী মহাসামন্ত। মহাসেন গুপ্তের পর তিনি বাংলার ক্ষমতা দখল করেন এবং গৌড়ের কর্ণসূবর্ণে তার রাজধানী স্থাপন করেন। শশাঙ্ক ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং সেখানকার শৈলোদ্ভব বংশীয় রাজাকে পরাজিত করে উড়িষ্যা দখল করেন। এ সময় উত্তর ভারত দখলের জন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা শুরু হয়। মালবের রাজা দেবগুপ্ত মৌখরী রাজা গ্রহবর্মণকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। কিন্তু একই সময় পুষ্যভূতির রাজা রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করেন। এ সময় শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমণ করেন। তিনি কনৌজের অধিকারী রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করে ক্ষমতা দখল করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার ভাই ও উত্তরাধিকারী হর্ষবর্ধন এক বিপুল বাহিনী গঠন করেন। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন ছিলেন অত্যধিক শক্তিশালী যোদ্ধা। ছয় বৎসর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করার পর শশাঙ্ক শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। হর্ষবর্ধন বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে নেন। এভাবে বাংলার ক্ষণস্থায়ী গৌড় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

পাল রাজবংশ ও পাল সাম্রাজ্য এবং এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহঃ

পাল সাম্রাজ্যের যুগ ছিল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এ সময় বাংলার ইতিহাসে আবার দিগ্বিজয়ের সূচনা হয়। পাল রাজাগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে। একারণে পাল শিলালিপিতে বরেন্দ্রকে জনকভূ বা রাজ্যাম পিত্রাম বলা হয়েছে। পাল সাম্রাজ্যের রাজাগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পাল রাজাগণ ছিলেন প্রথমত বৌদ্ধধর্মের মহাযান ও পরবর্তীতে তান্ত্রিক শাখার অনুসারী। পালবংশীয় রাজাগণ উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রভূমি কনৌজ দখলের জন্য রাজপুতানার গুর্জর এবং দক্ষিণ ভারতের

রাষ্ট্রকূটদের সাথে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই ভয়ঙ্কর ও ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ পরবর্তী দুই শত বৎসর অব্যাহত থাকে।

পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা গোপাল। তিনি ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশ শাসন করেন। গোপালের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশ পাচটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল যথা- অঙ্গ, বঙ্গ, গৌড়, সুক্ষ্ম ও সমতট। গোপাল এই সমস্ত খণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ করেন ও বাংলাদেশে শান্তি শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। গোপাল বিহার, উড়িষ্যা ও কামরূপও দখল করেন। এরপর গোপাল উত্তর ভারতের রাজধানী কনৌজ অক্রমণ করেন। তিনি কনৌজের আয়ুধ বংশীয় রাজা বজ্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। কিন্তু গুর্জর রাজা বৎসরাজের নিকট তিনি পরাজিত হন। বৎসরাজ পরবর্তীতে রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব ধারাবর্ষের নিকট পরাজিত হন। ফলে গোপাল তার সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হন।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৯০-৮১০) ছিলেন একজন সুদক্ষ ও পরাক্রমশালী সম্রাট। তিনি উত্তর ভারতে আক্রমণ করেন এবং গুর্জর রাজা নাগভট্টকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী বিশাল সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় তিনি মদ্র (পাঞ্জাব), গান্ধার (খাইবার প্রদেশ), মৎস্য (রাজস্থান রাজপুতানা), যদু (গুজরাত), অবন্তী (মধ্য প্রদেশ) প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করেছিলেন। কিন্তু এ অঞ্চলগুলো তিনি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। ধর্মপাল সেনাপতি লাউসেনের নেতৃত্বে রাষ্ট্রকূট রাজাকে পরাজিত করে উড়িষ্যা পুনর্দখল করতে সক্ষম হন। এই ঘটনাটি তৎকালীন বিখ্যাত মহাকাব্য ধর্ম মঙ্গলে উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের সোমপুর মহাবিহার হলো ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিহার, যা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত ।

ধর্মপালের সুযোগ্য পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০) পুনরায় সমগ্র ভারতব্যাপী তার অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতে কম্বোজ (কাশ্মীর) পর্যন্ত তার সমরাভিযান পরিচালনা করেন। দেবপাল গুর্জর রাজা রামভদ্রকে পরাজিত করে তাকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। বিন্ধ্যা পার্বত্য অঞ্চল বিজয় করে তিনি মালব ও গুজরাত দখল করেন। কিন্তু এ অঞ্চলগুলো পরবর্তীতে তিনি মিহির ভোজ। মিহির ভোজের কাছে হারিয়ে ফেলেন। দেবপালের দাক্ষিণাত্য অভিযান সফল হয়েছিল। তার নির্দেশে ভ্রাতা জয়পাল রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষকে পরাজিত করে উড়িষ্যা পুনর্দখল করেন। এরপর উড়িষ্যা চিরস্থায়ীভাবে পাল সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে ছিল।

পাল সম্রাটগণ বহু বৌদ্ধবিহার ও ধর্মীয় পীঠস্থান নির্মাণ করেছিলেন। বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী ও জগদ্দল প্রভৃতি বৃহদায়তন মহাবিহার পাল স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পাল সম্রাটগণ প্রথমত "মহাযান" বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে পালগণ হিন্দুদের বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেন। বহু হিন্দু দেবদেবীকে এই ধর্মে স্থান দেওয়া হয়। পাল সম্রাটগণ সংস্কৃত বা পালি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। পাল রাজাদের সময়ই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীণতম নিদর্শন চর্যাপদসমূহ রচিত হয়। তাই পাল রাজবংশকে অনেক সময় বাংলা সাহিত্যের জনক মনে করা হয়।

সেন রাজবংশ:

সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন প্রাথমিক জীবনে পাল রাজাদের অধীনে দক্ষিণবঙ্গের এক সামন্তপ্রভু ছিলেন। পরে তিনি নিজ বাহুবলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে পূর্ববঙ্গের বর্মণ রাজাদের পরাজিত করেন। তিনি উত্তরবঙ্গের এক যুদ্ধে পাল সম্রাট মদনপালকে পরাজিত করে রাজধানী গৌড় দখল করেন। তিনি ত্রিহুত (উত্তর বিহার) ও কামরূপও (পশ্চিম আসাম) জয় করে নেন। তবে তিনি দক্ষিণ বিহার জয় করতে ব্যর্থ হন। পাল রাজাগণ এখানে গাহড়বাল সাম্রাজ্যের সহায়তায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। বিজয়সেন শৈব ধর্মের ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তার সময় কনৌজ, অযোধ্যা ও হরিদ্বার থেকে যেসমস্ত কায়স্থ এদেশে আসেন তারাই মূলত বাঙালী কায়স্থদের আদিপুরুষ।

বল্লাল সেন বিজয়সেনের পর বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। বল্লাল সেন তার রাজ্যের প্রায় ১,০০০ ব্রাহ্মণকে চিহ্নিত করেন। এদেরকে রাজ পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংবদ্ধ করা হয় এবং এদের উচ্চ পদ মর্যাদা প্রদান করা হয়। এই মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ রাজ্যে কুলীন নামে পরিচিত হয়। বল্লাল সেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ দুটো থেকে তার অভূতপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বল্লাল সেনের সময় বঙ্গদেশে শৈব, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ দেখা দেয়। বল্লালসেন ব্যক্তিগতভাবে তান্ত্রিক মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যদিও তার পিতা বিজয়সেন শৈব মতের অনুসারী ছিলেন।

বল্লাল সেনের পর তার পুত্র লক্ষণ সেন সিংহাসনে আসীন হন। পিতার মত লক্ষণ সেনও সাহিত্য ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তার সময়ে রাজ্যে বহু প্রতিভাবান

কবির আবির্ভাব হয়। যেমন শরণ, হলায়ুধ, উমাপতিধর প্রমুখ। ধর্মীয় মতের দিক থেকে লক্ষণ সেন ছিলেন বৈষ্ণব। আনুলিয়ায় প্রাপ্ত তাম্র শাসনে লক্ষণ সেনকে পরমবৈষ্ণব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণ সেনের সময় বখতিয়ার খিলজী বাংলা আক্রমণ করেন। এসময় লক্ষণ সেন নদীয়ার একটি তীর্থকেন্দ্রে অবস্থান করছিলেন। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজী অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করেন যার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। লক্ষণ সেন পূর্ব বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, মুসলমানরা পূর্ববঙ্গ জয় করতে ব্যর্থ হয়।

দেব রাজত্ব:

দেব রাজ্য ছিল বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আরাকানের দান্যবতী বংশের একটি রাজ্য। এই রাজ্যটি বিস্তৃত ছিল আরাকান হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং এর রাজধানী ছিল চট্টগ্রামে। কিন্তু স্থানীয় বাঙালী প্রভাবে দেব রাজাগণ বাঙ্গালী ও হিন্দু হয়ে পড়ে। এই রাজবংশের প্রথম শাসক ছিলেন পুরুষোত্তম দেব, যিনি প্রথম জীবনে একজন সাধারণ গ্রামিক (গ্রাম প্রধান) ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি সেন সম্রাটদের অধীনে দক্ষিণাঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। তার পুত্র মধুসূদন দেব প্রথম সেন সাম্রাজ্যের হাত থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নৃপতি উপাধি ধারণ করেন। দামোদর দেব এই রাজবংশের একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তার রাজত্ব বর্তমান কুমিল্লা-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

এই রাজবংশের পরবর্তী শাসক দশরথ দেব এই বংশের সবচেয়ে পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তিনি সেন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গ (ঢাকা-ময়মনসিংহ-খুলনা) অঞ্চল দখল করে নেন। তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সাথে মিত্রতা করে আগ্রাসনকারী মুঘীসউদ্দীন তুঘরলকে পরাজিত করেন এবং বাংলার হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। এ উপলক্ষে তিনি দনুজ মর্দন দেব উপাধি গ্রহণ করেন। গিয়াসউদ্দীন বলবনের ইতিহাসে তাকে দনুজ রায় বলে অভিহিত করা হয়েছে। দেব বংশ আরও কিছুকাল তার স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। যদিও এই সময়কার রাজাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অবশেষে বাংলার মাহমুদ শাহী সুলতান ফিরোজ শাহের আক্রমণে দেব রাজবংশের পতন হয়।

মধ্যযুগ এবং ইসলামী শাসন:

সপ্তম শতাব্দীতে আরব মুসলিম ব্যবসায়ী ও সুফি ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে বাংলায় প্রথম ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। দ্বাদশ শতকে মুসলিমরা বাংলায় বিজয় লাভ করে এবং তারা ঐ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১২০২ সালের শুরুর দিকে দিল্লী সালতানাত থেকে একজন সামরিক অধিনায়ক বখতিয়ার খিলজী বাংলা ও বিহারকে পরাজিত করেছিলেন। প্রথমদিকে বাংলা তুর্কী জাতির বিভিন্ন গোত্র দ্বারা শাসিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আরব, পারসীয়, আফগান, মুঘল প্রভৃতি অভিযানকারী জাতি দ্বারা বাংলা শাসিত হয়। মুসলিম শাসকদের অধীনে বাংলা একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছিল। কারণ শহরগুলো উন্নত হয়েছিল, প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, সমাধিসৌধ এবং বাগান, রাস্তা এবং সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং নতুন বাণিজ্য পথগুলো সমৃদ্ধি ও নতুন সাংস্কৃতিক জীবন বয়ে নিয়ে এসেছিল।

খিলজী শাসন:

বখতিয়ার খিলজী ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বিহার আক্রমণ করেন। তিনি বিহারের পাল রাজবংশের অবশিষ্টাংশের পতন ঘটিয়ে বিহার দখল করেন। বখতিয়ার খিলজী এরপর বাংলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ১২০৪ সালে ১৭ সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তীর্থকেন্দ্র নদীয়ায় আক্রমণ করেন। লক্ষণ সেন পলায়ন করেন এবং তিনি পূর্ব বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলমানদের কোন নৌবাহিনী না থাকায় তারা পূর্ববঙ্গ দখল করতে পারেনি। উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার এরপর তিব্বত আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১২০৬ সালে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি তিব্বতে আক্রমণ করেন। এবং তিব্বতের কারামাত্তান নগর পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু প্রচণ্ড শীত ও রসদপত্রের অভাবে বখতিয়ার খিলজীর এ অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বখতিয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। বখতিয়ারের অন্যতম সহকারী শিরণ খিলজী নিজেকে বাংলার সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সিংহাসনের অপর দাবিদার মর্দান খিলজী শিরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শিরণ মর্দানকে পরাজিত ও বন্দি করেন। মর্দান খিলজী দিল্লীর সম্রাট কুতুবউদ্দিন আইবেককে বাংলা আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান। আইবেকের সেনাপতি কায়েমাজ রুমী শিরণকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন, এবং মর্দান খিলজীকে বাংলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। মর্দান প্রথমত দিল্লীর অধীনস্থ

থাকেন, কিন্তু কুতুবউদ্দীন আইবেকের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মর্দান ক্রমশ অত্যাচারী হয়ে উঠলে খিলজী অমাত্যগণ তাকে হত্যা করেন এবং ইওয়াজ খিলজীকে বাংলার সুলতান মনোনীত করেন।

ইওয়াজ খিলজী একজন সুদক্ষ ও রণকুশলী সম্রাট ছিলেন। তিনি একটি নৌবাহিনী গঠন করেন এবং এই নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি বঙ্গ দখল করেন। তিনি বিহার, উড়িষ্যা ও কামরূপও (পশ্চিম আসাম) দখল করেন। কিন্তু ইওয়াজ এইসমস্ত রাজ্য সরাসরি রাজ্যভুক্ত করেননি, তিনি এই রাজ্যগুলোকে সামন্ত রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করেন। ইওয়াজের এই রাজ্য বিস্তারের ফলে ১২২৫ সালে দিল্লীর সুলতান শামসউদ্দীন ইলতুতমিশ তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। যুদ্ধে ইওয়াজ পরাজিত হন। কিন্তু ইলতুতমিশ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলে ইওয়াজ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবার যুদ্ধে ইলতুতমিশের পুত্র মাহমুদ নেতৃত্ব দেন, এবং যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইওয়াজের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে।

মামলুক শাসনঃ

মামলুকগণ ছিলেন তুর্কী জাতির একটি বিশেষ ধরনের ভাড়াটে সেনাবাহিনী। দিল্লীতে এই সময় মামলুকগণই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং দিল্লী কর্তৃক নিয়োগকৃত বাংলার সকল গভর্নরগণও ছিলেন মামলুক। বাংলার মামলুক সুলতান তুগরল তুগান খান ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি শুধু উপরই আধিপত্য বিস্তার করলেন না, তদুপরি এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিহার ও বদায়ুন অঞ্চল নিজের শাসনাধীনে আনেন। যাই হোক দিল্লীর শাসনকর্তা তমর খানের নির্দেশে এক সেনাবাহিনী বাংলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তুঘান খান পরাজিত হন এবং শেষ পর্যন্ত দিল্লীর শাসন মেনে নেন।

১২৫১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার গভর্নর মুগীসউদ্দীন ইউজবাক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইউজবাক বাংলার দক্ষিণ দিক হতে আগত উড়িষ্যার একটি আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি উড়িষ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর রাজধানী লুণ্ঠন করেন এবং একটি শ্বেত হস্তীও লাভ করেন। তুঘানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইউজবাক বিহার ও আউয়াধ দখল করেন। এর ফলে তিনি পূর্ব ভারতব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে পড়েন। ইউজবাক যতদিন জীবিত ছিলেন দিল্লীর সম্রাট ততদিন পর্যন্ত তাকে পরাজিত করতে পারেননি। ইউজবাক উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসামও দখল করেন। কিন্তু আসামের একটি বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি নিহত হন।

দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় বাংলার গভর্নর মুগীসউদ্দীন তুঘরল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি সমগ্র বাংলা ও বিহারের ওপর আধিপত্য স্থাপন করে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং তা তার সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। সম্রাট বলবন মালিক তুরমতীকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে বাংলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি মুঘিসউদ্দীন তুঘরলের হাতে পরাস্ত হন। বলবন এবার দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করেন সেনাপতি শিহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে। কিন্তু তিনিও তুঘরলের হাতে পরাজিত হন। এর ফলে বলবন ১২৮০ সালে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে স্বয়ং বাংলা অভিযান করেন। তুঘরল প্রবল পরাক্রমের সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

মাহমুদ শাহী রাজবংশঃ

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বুঘরা খান বাংলা দেশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মাহমুদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন, এজন্য তার বংশ মাহমুদ শাহী বংশ নামে পরিচিত হয়ে থাকে। দিল্লীর সম্রাট ছিলেন মাহমুদ শাহের পুত্র কায়কোবাদ। কিন্তু তিনি দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী নিজামউদ্দীনের হাতের ক্রীড়ানক হয়ে পড়েন। মাহমুদ শাহ তার পুত্রকে উদ্ধারের জন্য এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দিল্লীর উজির নিজামউদ্দীন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সরযু নদীর তীরে তার গতিরোধ করেন। যাই হোক বাংলা ও দিল্লীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ না হয়ে উভয়পক্ষের মধ্য সমঝোতা হয়। মাহমুদ শাহ তার বাহিনী নিয়ে লখনৌতিতে ফিরে আসেন ও সগৌরবে রাজত্ব করতে থাকেন। অপরদিকে দিল্লীতে তার নির্দেশে সুলতান কায়কোবাদ মন্ত্রী নিজামউদ্দীনকে পদচ্যুত করে রাষ্ট্রকে নিষ্কণ্টক করেন।

মাহমুদ শাহের পর তার পুত্র রুকুনউদ্দীন কায়কাউস বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। রুকুনউদ্দীন কায়কাউসের সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। ১৩০১ সালে আলাউদ্দীন খিলজী বাংলা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কায়কাউস পরাজিত ও নিহত হন। খিলজী কায়কাউসের ভাই ফিরোজ শাহকে তার গভর্নর হিসেবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ফিরোজ শাহ একজান খ্যাতিমান বিজেতা ছিলেন। তিনি খিলজীর নির্দেশে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেন এবং দেব বংশকে সমূলে উৎখাত করেন। এর ফলে পূর্ববঙ্গ চিরস্থায়ী ভাবে মুসলিন

শাসনাধীনে চলে আসে। তার সময়েই বিখ্যাত আউলিয়া শাহ জালাল বঙ্গদেশে আগমন করেছিলেন এবং সিলেট জয় করেছিলেন। আলাউদ্দীন খিলজীর মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীনতা অর্জন করেন এবং কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজকার্য করার পর মৃত্যুবরণ করেন।

ফিরোজ শাহের পর তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ সমগ্র বাংলার অধিপতি হন। কিন্তু এ সময় দিল্লীর তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাংলাদেশে সমরাভিযান করেন। ষড়যন্ত্রকারী ভ্রাতা নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীমের সহায়তায় রাজধানী লখনৌতি আক্রমণ করেন এবং বাহাদুর শাহ পরাজিত হন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাংলাকে সাতগাও, লখনৌতি ও সোনারগাঁও এই তিন ভাগে ভাগ করেন এবং এই তিন ভাগকে তিনজন পৃথক শাসকের হাতে নিযুক্ত করেন। কিন্তু গিয়াসউদ্দীন তুঘলক প্রত্যাবর্তন করলে বাহাদুর শাহ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সাতগাওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খান তার বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

বাংলা সালতানাত:

পঞ্চদশ শতকে নির্মিত বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ এবং বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে পরিচিত ষাট গম্বুজ মসজিদ। বাগেরহাট শহরের সাত কিলোমিটার পশ্চিমে খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কের উত্তর পাশে সুন্দরঘোনা গ্রামে ঐতিহ্যবাহী এ মসজিদটির অবস্থান। মসজিদটির গায়ে কোন শিলালিপি না থাকায় এটি কে, কখন নির্মাণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ও সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কথিত রয়েছে, সুলতান নসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৫-৫৯) আমলে খান আল-আজম উলুগ খানজাহান বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবনের কোলঘেঁষে খলিফাবাদ রাজ্য গড়ে তুলছিলেন। এসময় তিনি ধর্মীয় দাওয়াত প্রদান ও কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করার জন্য একটি দরবার হল গড়ে তোলেন, যা পরে ষাট গম্বুজ মসজিদ হিসেবে পরিচিতি পায়।

ইলিয়াস শাহী রাজবংশ:

ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশে ইরানের সিজিস্তান হতে আগত এক উদ্বাস্তু ছিলেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে বাংলায় নিযুক্ত দিল্লীর গভর্নর আলী শাহের সিলাহদার ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে বাংলার সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। ইলিয়াস শাহ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দখল করে ভারতবর্ষের

পূর্বাঞ্চলে এক বিশাল সাম্রাজ্য কায়েম করেন । তিনি উত্তর প্রদেশ ও নেপালেরও বিরাট অংশ দখল করে নেন। এর ফলে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ১৫৫৩ সালে তিনি বাংলা আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চল দুটো হারিয়ে ফেলেন কিন্তু তিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হন।

ইলিয়াস শাহের পরে সিকান্দার শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। ইতঃপূর্বে ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা অক্রমণ করে বাংলা প্রদেশটি দখল করতে ব্যর্থ হন। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। সুদীর্ঘ দুই বৎসর ফিরোজ শাহ বাংলা অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিকান্দার শাহের হাতে পরাজিত হন। সিকান্দার শাহ সাহিত্য ও স্থাপত্যের একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার সময়ে বিশেষ করে স্থাপত্য ও ইমারত শিল্প ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। তার অমর কীর্তি হচ্ছে বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা। এই মসজিদটি তৎকালীন ভারতবর্ষের বৃহত্তম মসজিদ (দিল্লীর চেয়েও বৃহৎ) ছিল।

সিকান্দার শাহের পর আজম শাহ সিংহাসনে আসীন হন। তার শাসনকাল ছিল শান্তিপূর্ণ এবং এ সময় তেমন যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা ঘটেনি। তার সময়ে চীনের রাষ্ট্রদূত মা হুয়ান বাংলাদেশে আগমণ করেন। তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলায় আগমনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি রওয়ানাও হয়েছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে মারা যান। ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলার হিন্দুদের ক্ষমতায়িত করতে চেয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। এবং হিন্দুদের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্তপ্রভু হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু এতে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করে বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান ঘটান।

গণেশীয় রাজবংশ:

শামসউদ্দিন আহমাদ শাহের আমলে নির্মিত সোনারগাঁও এর মহজমপুর শাহী মসজিদ ।

রাজা গণেশ প্রাথমিক জীবনে দিনাজপুরের ভাতুরিয়া অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। তিনি বাংলার এক আমির বায়েজীদ শাহকে ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করতে উৎসাহিত করেন। পরে বায়েজীদ শাহকে সরিয়ে তিনি নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। গণেশ বাংলাদেশে সত্যপীর

নামক এক নতুন পূজার উদ্ভাবন করেন। সত্যপীর একইসঙ্গে মুসলিম পীর ও হিন্দু দেবতার প্রতিভূ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। গণেশের পূর্বে বাংলার হিন্দুগণ মুসলমান শাসকদের প্রভাবে ব্যাপক মাত্রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিলেন। এই ধর্মান্তর রোধ করার জন্য তিনি এই নতুন সত্যপীর প্রথার প্রচলন করেন।

রাজা গণেশ নিজ পুত্র জিতেন্দ্রদেবের পরিবর্তে মহেন্দ্রদেবকে পরবর্তী রাজা হিসেবে নিয়োগ করেন। এতে জিতেন্দ্রদেব অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম আমিরদের সহায়তায়, জালালউদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুহাম্মাদ শাহ একজন বিখ্যাত বিজেতা ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী জৌনপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। এবং তাদের কাছ থেকে বিহার প্রদেশটি ছিনিয়ে নেন। মুহাম্মাদ শাহের সময় আরাকান রাজ মেং তি মুন বার্মার হাত থেকে রক্ষার জন্য মুহাম্মাদ শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং মুহাম্মাদ শাহ তাকে উদ্ধার করেন। এরপর থেকে আরাকান বাংলার একটি সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আহমাদ শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতামত বিভ্রান্তিকর। ফেরেশতার মতে, তিনি তার মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করেন। অপরপক্ষে গোলাম হোসেন বলেন, তিনি অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু ছিলেন। তিনি বিনা কারণে রক্তপাত করতেন এবং অসহায় নারী-পুরুষদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাতেন। যাই হোক তিনি জাউনপুরের কাছে পরাজিত হন। এবং বিহার প্রদেশটি হারিয়ে ফেলেন। সাদী খান ও নাসির খান নামক দুইজন ক্রীতদাস, যারা তার অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাকে হত্যা করেন এবং বাংলার সিংহাসন দখল করেন।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী রাজবংশ:

সাদী খান ও নাসির খান নামক ক্ষমতা দখলকারী আমীরদের সরিয়ে মাহমুদ শাহ নামক ইলিয়াস শাহী বংশের একজন বংশধর বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। এর ফলে বাংলায় ইলিয়াস শাহী রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান মাহমুদ শাহের সময় বাংলার ইমারত ও স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মাণ করে একে সুসজ্জিত করেন। এসব ইমারতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঢাকার বিনত

বিবির মসজিদ, গৌড়ের বাইশগজী প্রাচীর প্রভৃতি। এজন্য অনেক ঐতিহাসিক তার যুগকে অগাস্টান যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন।

মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র বরবক শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বরবক শাহ জৌনপুরকে পরাজিত করে বিহার দখল করে নেন এবং কেদার রায় নামক তার একজন হিন্দু সেনাপতিকে এই অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ করেন। বরবক শাহের একজন সেনাপতি ইসমাইল গাজী আসামের রাজাকে পরাজিত করে কামরূপ (পশ্চিম আসাম) দখল করে নেন।[৪১] বরবক শাহের শাসনামলে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক হাবশী ক্রীতদাসের আগমন ঘটে। বরবক শাহ এদের অনেককে সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদে নিয়োগ করেন। এই হাবশীরা পরে সাম্রাজ্যের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়।

সুলতান ইউসুফ শাহ একজন দানশীল, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শাসক ছিলেন। তিনি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি দরবারে জ্ঞানী-গুণী, আলেম ও বিচারকদের আহ্বান করতেন। পরবর্তী সুলতান ফতেহ শাহও একজন দয়ালু, কর্মঠ ও ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন। তিনি সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজ্য শাসন করতেন। তার সময়ে হাবশী ক্রীতদাসগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি এই হাবশী সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হন। ফলে হাবশী সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে। এর ফলে বংলার ইলিয়াস শাহী রাজবংশের পতন ঘটে।

হোসেন শাহী রাজবংশ:

সোনা মসজিদটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে তৈরি হয়। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ জোরদখলকারী হাবশী শাসকদের সরিয়ে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে আরব দেশের ইয়েমেন থেকে বাংলাদেশে আগত এক উদ্বাস্তু ছিলেন। হোসেন শাহ বাংলার সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহ যেমন কামরূপ (পশ্চিম আসাম), ত্রিহুত (উত্তর বিহার) ও চট্টগ্রাম (আরাকানের হাত থেকে) জয় করেন। তবে তিনি দক্ষিণ বিহার জয় করতে ব্যর্থ হন কারণ দিল্লীর সম্রাট সিকান্দার লোদী তার পূর্বেই উক্ত অঞ্চল দখল করে নেন। হোসেন শাহের শাসন আমলে সাহিত্য ও স্থাপত্য কলার ব্যাপক বিকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক। অনেক ঐতিহাসিক তার যুগকে বাংলার স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

হোসেন শাহের পর তার পুত্র নুসরাত শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। পিতার মত তিনিও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পিতার আমলে সাহিত্যকলা ও স্থাপত্য শিল্পের যে বিকাশ ঘটে তা তার সময়ও অব্যাহত থাকে। নসরত শাহের সময় ভারতবর্ষে আফগান শাসনের অবসান হয় ও মুঘল শাসনের পত্তন ঘটে। বিপুল সংখ্যক আফগান আমীর পলায়ন করে বাংলাদেশে আসেন। নসরত শাহ সম্রাট মাহমুদ লোদী ও জালাল খানের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু ঘাগরার যুদ্ধে মিত্রবাহিনী পরাজিত হয়। নসরত শাহ বাবরের সাথে একটি সন্ধিচুক্তি করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

নসরত শাহের পর তার পুত্র ফিরোজ শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। কিন্তু তার খুল্লতাত মাহমুদ শাহ তাকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসেন। এর ফলে রাজপরিবারে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ত্রিহুতের শাসনকর্তা মখদুম আলম স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। কিন্তু মাহমুদ শাহ তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। এসময় বিহারের শাসনকর্তা জালাল খান তার অভিভাবক শের খানের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মাহমুদ শাহকে বিহার আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান। মাহমুদ শাহ বিহার আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি পরাজিত হন। অতঃপর ১৫৩৮ সালে শেরশাহ বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে নেন। ফলে বাংলার হোসেন শাহী রাজবংশের পতন ঘটে।

পাখতুন শাসন:

পাখতুনগণ ছিলেন আফগানিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু এবং তারা পাঠান নামেও পরিচিত ছিলেন। পাখতুনগণ ছিলেন ভারতবর্ষের অধিশ্বর এবং তারা ভারতে লোদী বংশ নামে একটি শক্তিধর রাজবংশ স্থাপন করেন। পরবর্তীতে পানিপথের যুদ্ধে মুঘলদের হাতে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

সূরী রাজবংশ:

সূরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শের শাহ সূরী প্রাথমিক জীবনে বিহারের সাসারাম অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র জায়গীরদার ছিলেন। পরে নিজ প্রতিভাবলে তিনি বিহারের শাসনকর্তা বিহার খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং বিহারের উপ প্রশাসকের পদে নিযুক্ত হন। ১৫৩৬ সালে শের শাহ বাংলার শাসনকর্তা মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে মাহমুদ শাহ কিউল থেকে সিকরিগলি পর্যন্ত অঞ্চলটি শের শাহকে

সমর্পণ করেন। ১৫৩৭ সালে শের শাহ দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করেন এবং এবার সম্রাট মাহমুদ শাহকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। শের শাহ নিজেকে বাংলার সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ফরিদউদ্দীন শের শাহ উপাধি ধারণ করেন।

শেরশাহ বাংলা ও বিহারের বিরাট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়ে বসলে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন চুনার দখল করে বাংলা আক্রমণ করেন। সুচতুর শেরশাহ সম্মুখ সমরে লিপ্ত না হয়ে বাংলাদেশ পরিত্যাগ করেন এবং পরোক্ষভাবে বারানসী, রোটাস ও জৌনপুর দখল করে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। হুমায়ুন আগ্রার পথে যাত্রা করলে বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শের শাহ তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১৫৪০ সালের ১৭ই মে কনৌজ এর বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহ হুমায়ুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে সূরী বংশের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শের শাহ হচ্ছেন বাংলার একমাত্র মুসলিম সম্রাট যিনি উত্তর ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শেরশাহের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষগণ জ্যেষ্ঠ্যপুত্র আদিল খানের পরিবর্তে ইসলাম শাহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, কারণ ইসলাম শাহ রাজপুত্র অবস্থায় অধিকতর সামরিক প্রতিভা প্রদর্শন করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিল খান ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আদিল খান তার বাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু ইসলাম শাহের হাতে পরাজিত হন। ইসলাম শাহের সময় মুঘল সম্রাট হুমায়ুন রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য তার নিকট প্রার্থনা জানান। কিন্তু তিনি এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ইসলাম শাহের শাসনকাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল এবং এ সময় তেমন কোন যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ঘটেনি।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সূরী সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। ইসলাম শাহের পর তার পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আদিল শাহ সূরী (এই আদিল শাহ পূর্ববর্তী আদিল শাহ হতে পৃথক) কর্তৃক পদচ্যুত হন। অদিল শাহ পরবর্তীতে ইব্রাহীম শাহ সূরী নামক সূরী বংশীয় অপর একজন দাবীদারের কছে পরাজিত হন এবং তিনি দিল্লী ও আগ্রা দখল করে বসেন। ইব্রাহীম শাহ অবার সিকান্দার শাহ সূরী কর্তৃক পরাজিত হন এবং সিকান্দার শাহ নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে সূরী সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়।

কররানী রাজবংশ:

১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাজ খান কররানী বাংলার দুর্বল সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। তাজ খান দিল্লীর সূরী বংশীয় সম্রাট ইসলাম শাহের একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। কিন্তু তার পরে আদিল শাহ অনৈতিকভাবে সিংহাসন দখল করলে তাজ খান বাংলায় পলায়ন করেন এবং এখান থেকেই তিনি আদিল শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এখানে তিনি বাহাদুর শাহের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং তার নেতৃত্বে আদিল শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। তাজ খান বাংলার মাটিতে তার ক্ষমতার বীজ শক্তভাবে প্রোথিত করেন। পরবর্তীতে সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত করে তিনি বাংলার সিংহাসন দখল করেন।

তাজ খানের পর তার ভাই সুলায়মান খান কররানী বাংলার মসনদে অসীন হন। দিল্লীতে হুমায়ুন কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর দলে দলে আফগান অভিবাসীগণ বাংলায় এসে বসবাস শুরু করে। ফলে সুলায়মানের আধিপত্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুলায়মানের সাথে উড়িষ্যার সম্রাট মুকুন্দ হরিচন্দনের বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। বিরোধের কারণ বাংলার সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার ইব্রাহীম সূরীকে আশ্রয় প্রদান করা। ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলায়মান তার পুত্র বায়েজীদ খান ও সেনাপতি কালাপাহাড়কে এক বিশাল সেনাবাহিনী সহ উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। রাজা হরিচন্দন মুসলিম বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করেন। পুরীসহ সমস্ত উড়িষ্যা কররানী রাজ্যের অধীনস্থ হয়।

সুলতান দাউদ খান কররানী সুলায়মান খান অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনচেতা ও আগ্রাসী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবর সেনাপতি মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মুঘল সেনাপতি পরাজিত হন। ১৫৭৪ সালে সম্রাট আকবর স্বয়ং পাটনা অবরোধ করেন। ফলে দাউদ খান পরাজিত হন। ১৫৭৬ সালে মুঘল ও বাঙ্গালী সেনাবাহিনী রাজমহলের প্রান্তরে একটি চূড়ান্ত যদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে বাঙ্গালী বাহিনী বিজয় অর্জন করে। কিন্তু পরবর্তীতে সেনাপতি কতলু খান ও বিক্রমাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতা করলে তারা পরাজিত হয়। ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাসহ সমগ্র পূর্ব ভারত মুঘল সাম্রাজ্যের পদানত হয়।

মুঘল যুগ:

বাংলার পশ্চিমাংশ ও উত্তরাংশ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হয়। আফগান কররানী বংশের শাসক দাউদ কররানীকে হত্যার মাধ্যমে মুঘল শাসনের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু বারো ভূঁইয়াদের পরাজয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মুঘল আধিপত্য আরম্ভ হয়। বাংলার বিভিন্ন সুবাদারগণ বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুবাদার ছিলেন ইসলাম খান, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান প্রমুখ।

ইসলাম খান:

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ১৬০৮ সালে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রাজধানী ঢাকা থেকে বাংলার শাসন কাজ পরিচালনা করতেন, যার নামকরণ করা হয়েছিল জাহাঙ্গীর নগর। বিদ্রোহী রাজা, বারো-ভূঁইয়া, জমিদার ও আফগান নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল তার প্রধান কাজ। তিনি বারো ভূঁইয়াদের নেতা মুসা খানের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ১৬১১ সালের শেষের দিকে মুসা খান পরাজিত হন। ইসলাম খান যশোরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার রামচন্দ্র এবং ভুলুয়া রাজ্যের অনন্ত মানিক্যকে পরাজিত করেছিলেন। এরপর তিনি কোচবিহার, কোচ হাজো এবং কাছাড় রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এইভাবে চট্টগ্রাম ব্যতীত সমগ্র বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।

মীর জুমলা:

মীর জুমলা বাংলার একজন বিখ্যাত সুবাদার ছিলেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে গোলকুণ্ডায় একজন হীরক ব্যবসায়ী হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। এ সময়ই তিনি কোহীনুর নামে বিখ্যাত হীরক খণ্ডের অধিকারী হন। এ হীরক খণ্ডটি পরে তিনি সম্রাট শাহজাহানকে উপহার দেন। তার সময়ে কোচবিহার (পশ্চিম আসাম) ও আসামে (পূর্ব আসাম) মুঘল অভিযান প্রেরিত হয়। গহীন জঙ্গল পার হয়ে কোচবিহারে মুঘল বাহিনী প্রবেশ করলে প্রাণভয়ে রাজা প্রাণনাথ রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। কোচবিহার দখলের পর মীর জুমলা আসামে অভিযান পরিচালিত করেন। মুঘল বাহিনী অনায়াসে কামতা, গোয়ালপাড়া, গোহাটী প্রভৃতি সীমান্তবর্তী শহর দখল করে নেয়। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত যুদ্ধে রাজধানী ঝাড়গাও দখলকৃত হয় এবং রাজা জয়ধ্বজ নারায়ণ আত্মসমর্পণ করেন।

শায়েস্তা খান:

১৬৬৩ সালে শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বাংলার দীর্ঘতম গভর্নর ছিলেন। তার সময়ে বাংলার সুখ ও শান্তি চরমে ওঠে। কথিত রয়েছে তার সময় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। শায়েস্তা খানের বিখ্যাত কীর্তি আরাকানের জলদস্যুদের হাত থেকে চট্টগ্রামের পুনর্দখল করা। ১৬৬৫ সালে শায়েস্তা খান নিজ পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানকে অধিনায়ক মনোনীত করে আরাকানে সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৬৬৬ সালের ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী সংঘটিত কাঠালিয়ার যুদ্ধে মগ বাহিনী সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয়। পরে তারা কর্ণফুলী নদীতে

প্রতিরোধ গড়ে তুললে মুঘল নৌবহরের কামানের সামনে পরাস্ত হয়। চট্টগ্রামে পুনরায় মুঘল আধিপত্য স্থাপিত হয়। শায়েস্তা খান এর নতুন নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। চট্টগ্রাম দখল করে মগদের হাতে বন্দী অসংখ্য নর নারীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বাংলার নবাব:

মুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর সুবাহ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি রাজধানী মাখসুদাবাদে স্থানান্তর করেন যা তার নাম থেকে মুর্শিদাবাদে নামকরণ হয়। তিনি একজন ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। তিনি ইসলামী শরীয়ত অনুসারে কঠোরভাবে দেশ শাসন করতেন। তিনি সপ্তাহে দুবার স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তার সময়ে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাংলা তুর্কী, পারসী, মাজাপাহী, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। তার সময়ে বাংলার হুগলী একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত হয়।

মুর্শিদকুলী খানের পর তার জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার নবাব হন। তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ করেন এবং ত্রিপুরা বাংলার একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি বীরভূমের শাসক বদিউজ্জামানের বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি কঠোরভাবে ইউরোপীয় বণিকদের দস্তক প্রথা ও শুল্ক ফাঁকি বন্ধ করেন। তার সময়ে ইংরেজ, ফরাসি ও পর্তুগিজ বণিকগণ কোনরূপ শুল্ক ফাঁকি দিতে পারতেন না। উপরন্তু নবাবকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরানা দিয়ে সবসময় সন্তুষ্ট রাখতে হত। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ নবাবকে তুষ্ট করার জন্য তিন লক্ষ টাকা নজরানা দেন।

নবাব আলীবর্দী খানের সময় বাংলায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তার সময়ে মারাঠাগণ বাংলা আক্রমণ করে। তবে আলীবর্দী খান একজন বিখ্যাত মহাবীর ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ দশ বছর মারাঠাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হন। তবে তিনি উড়িষ্যা প্রদেশটি মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নবাব আলীবর্দী খানের পরে সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রথমদিকে কলকাতার যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করলেও শেষ পর্যন্ত

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। ফলে বাংলার নবাবী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

ঔপনিবেশিক শাসন:

বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে। ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর কোম্পানির হাত থেকে বাংলার শাসনভার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে। ব্রিটিশ রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন একজন ভাইসরয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে অনেকবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লাখ লোক মারা যায়।

১৯০৫ হতে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, যার রাজধানী ছিল ঢাকায়। তবে কলকাতা-কেন্দ্রিক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের চরম বিরোধিতার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায় ১৯১১ সালে। ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগের সময় ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে আবার বাংলা প্রদেশটিকে ভাগ করা হয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হয়, আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নাম পাল্টে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়।

পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১):

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় যথা ভারত ও পাকিস্তান। মুসলিম আধিক্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সীমানা চিহ্নিত করা হয় যার ফলে পাকিস্তানের মানচিত্রে দুটি পৃথক অঞ্চল অনিবার্য হয়ে ওঠে যার একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল প্রধানত পূর্ব বাংলা নিয়ে যা বর্তমানের বাংলাদেশ। পূর্ব পাস্তিানের ইতিহাস মূলত: পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে নিগ্রহ ও শোষণের ইতিহাস যার অন্য পিঠে ছিল ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সামরিক শাসন।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভূমি সংস্কারের অধীনে জমিদার ব্যবস্থা রদ করা হয়।[৫৯]কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত গুরুত্ব সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ও

সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংঘাতের প্রথম লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পায়। পরবর্তী দশক জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে নেয়া নানা পদক্ষেপে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

পাকিস্তানি প্রভাব ও স্বৈর দৃষ্টিভঙ্গীর বিরূদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ ছিল মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নিবার্চনে বিজয় এবং ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খানকে পরাজিত করার লক্ষ্য নিয়ে সম্মিলিত বিরোধী দল বা 'কপ'-প্রতিষ্ঠা ছিল পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরূদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বমূলক আন্দলোনের মাইলফলক। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের প্রশ্ন ১৯৫০-এর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে।

ভাষা আন্দোলন:

ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়। পাকিস্তানের সরকারী কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। মুফতি নাদিমুল কামার আহমেদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভাজনের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সংগঠিত হয়; তার দুটি অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান এর মধ্যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং ভাষাগত পার্থক্য বজায় ছিল। এ পার্থক্য পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে ঘোষণা করে, এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন আইন প্রনয়ণের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং গণ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে, সরকার সকল ধরনের গণ সমাবেশ ও প্রতিবাদ আন্দোলন বেআইনি ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরা এই আইন অমান্য করে এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি বিরাট আন্দোলন সংগঠিত

করে। ঐদিনে বহু ছাত্র বিক্ষোভকারীদের পুলিশ হত্যা করে এবং এই আন্দোলন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে।

এই হত্যাকাণ্ডের পরে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ যার পরবর্তীতে নামকরণ করা হয় আওয়ামী লীগ। কয়েক বৎসর ব্যাপী সংঘর্ষ চলার পর, কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে এবং ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর, ইউনেস্কো, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস, একটি জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়। শহীদ মিনার স্মৃতিস্তম্ভটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আন্দোলন ও তার শহীদদের স্মরণে নির্মিত হয়।

রাজনীতিঃ ১৯৫৪-১৯৭০

শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ধীরে ধীরে বিরাট পার্থক্য গড়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার একটি সংখ্যালঘু অংশ ছিল, কিন্তু রাজস্ব বরাদ্দ, শিল্প উন্নয়ন, কৃষি সংস্কার ও নাগরিক প্রকল্পসমূহের বৃহত্তম অংশের ভাগীদার ছিল তারাই । পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক পরিষেবাগুলো মূলত পাঞ্জাবি জাতি দ্বারা অধিকৃত ছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে শুধুমাত্র একটি রেজিমেন্ট ছিল বাঙ্গালীদের। অনেক বাঙ্গালী পাকিস্তানিদের কাশ্মীর ইস্যুতে স্বভাবজাত উৎসাহ বোধ করেনি , কারণ তারা মনে করত এটি পূর্ব পাকিস্তানকে আরও বেশি ঝুঁকির মুখে ফেলবে এবং এটি শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেবে।

১৯৬৮ সালের গোড়ার দিকে শেখ মুজিব ও অন্যান্য ৩৪ জন নেতার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ভারতবর্ষের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করছিল। যাইহোক এই বিচারের ফলে একটি গণ আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং সকল বন্দীদের মুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কারাগারে একজন বিদ্রোহী, জহুরুল হককে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয় এবং পরবর্তীতে ২২ ফেব্রুয়ারি

সরকার মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। গণআন্দোলন পরবর্তীকালে '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে।

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খান কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পরবর্তীকালে নতুন রাষ্ট্রপতি দেশের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থগিত করে দেন। যাইহোক কিছু সংখ্যক ছাত্র গোপনীয়তার সাথে আন্দোলন বজায় রাখে। সিরাজুল আলম খান এবং কাজী আরেফ আহমেদের নেতৃত্বাধীন '১৫ ফেব্রুয়ারি বাহিনী' নামে একটি নতুন দল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে, ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবরের জন্য একটি নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত করে।

স্বাধীনতার প্রস্তুতিঃ

আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের বেশিরভাগ অংশে ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং পাকিস্তান সরকার সাংবিধানিক প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রদেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হয়, সেইসাথে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। তবে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেন, যা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভের সূচনা করে। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের এক ছাত্রনেতা আ স ম আবদুর রবের নির্দেশে বাংলাদেশের নতুন (জাতীয় পতাকা উত্থাপিত হয়।

আন্দোলনকারী ছাত্রনেতারা দাবী করে যে শেখ মুজিবুর রহমান অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করুন, কিন্তু মুজিবুর রহমান এই দাবীতে সম্মত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বরং তিনি ৭ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য একটি জনসভায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৩রা মার্চ ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসের নির্দেশে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সামনে স্বাধীনতার ইস্তেহার পাঠ করেন। ৭ মার্চ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি জনসাধারণের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর চলমান স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসরতা সম্পর্কে জন সাধারণকে উদ্বুদ্ধ

করেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পরবর্তীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ই মার্চ এর ভাষণে, পাকিস্তানি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে একটি আসন্ন যুদ্ধের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানান।[৭০] যদিও তিনি সরাসরি স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেননি, কারণ তখনও আলোচনা চলছিল, তিনি তার শ্রোতাদেরকে কোনও এক সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানান। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়, এবং এ ভাষণের বিখ্যাত উক্তি ছিল "এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম"

স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ:

২৬ মার্চের প্রথমার্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সামরিক অভিযান শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং রাজনৈতিক নেতারা বহুবিভক্ত হয়ে যান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার আগে, শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাক্ষরিত নোট প্রেরণ করেন যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই নোটটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর বেতার ট্রান্সমিটার দ্বারা প্রচারিত হয়। বাংলাদেশী আর্মি অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট রেডিও স্টেশন দখল করেন এবং ২৭ মার্চ সন্ধ্যার দিকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।

সামরিক উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে ১১ জন কমান্ডারের অধীনে ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এই আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর সাথে সাথে যুদ্ধের জন্য আরও তিনটি বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয় জেড ফোর্স, এস ফোর্স এবং কে ফোর্স। এই তিনটি বাহিনীর নাম উক্ত বাহিনীর কমান্ডারদের নামের প্রথম অক্ষর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মেহেরপুর সরকার কর্তৃক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ বেশিরভাগ অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল, যা ভারত কর্তৃক সমর্থিত ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং বাংলার মুক্তি বাহিনী এর মধ্যে যুদ্ধের সময় আনুমানিক এক কোটি বাঙালী, প্রধানত হিন্দু, ভারতের আসাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আশ্রয় নেয়। ভারত বাংলাদেশকে নানাভাবে সাহায্য করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের অবদান অপরিসীম।

১৬ ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানের আত্মসমর্পন:

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সহানুভূতি ছিল এবং ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশীদের পক্ষে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দুই সপ্তাহের একটি সংক্ষিপ্ত এবং ব্যাপক বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষগণ ভারত ও বাংলাদেশের মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকালে শুধুমাত্র কয়েকটি দেশ নতুন রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৯০ হাজারেরও বেশি পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রাথমিক সরকার ব্যবস্থা ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার:

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সরকার। এই সরকার দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সংবিধান প্রণয়ন করে এবং মৌলিক নীতিমালা হিসাবে সমতা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ এবং সামরিক সর্বাধিনায়ক ছিলেন এম এ জি ওসমানী। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মুহাম্মদ মনসুর আলী। নবনির্মিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর সদস্যগণ এবং পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসের স্বপক্ষত্যাগী সদস্যদের সমন্বয়ে এই সরকার গঠিত হয়। এই সরকারে আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী এবং রেহমান সোবহান এর নেতৃত্বে এটি একটি সুদক্ষ কূটনৈতিক সংগঠনও ছিল। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এগারোটি সেক্টর কমান্ডারের মধ্যে বিভক্ত ছিল; যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশারফ, কে.এম. শফিউল্লাহ প্রমুখ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য ভারত আন্তরিকভাবে সকল ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা প্রদান করে। নির্বাসিত এই সরকারের রাজধানী ছিল কলকাতা। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত চূড়ান্ত যুদ্ধের দুই সপ্তাহের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করে।

শেখ মুজিব প্রশাসন:

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে সাক্ষাৎকালে শেখ মুজিবুর রহমান বামপন্থী দল আওয়ামী লীগ যারা ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে জিতেছিল, বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর প্রথম সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধাণমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত হন এবং ব্যাপকভাবে দেশটির স্বাধীনতার নায়ক এবং জাতির পিতা হিসেবে গণ্য হন। তার শাসনামলে বাঙালী জাতীয়তার গঠন ছিল মূলত ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে। ১৯৭২ সালে কামাল হোসেন এর রচিত সংবিধানটি মূলত একটি উদার গণতান্ত্রিক সংসদীয় প্রজাতন্ত্র গঠন করে, যার ওপর সমাজতন্ত্রের কিছুটা প্রভাব ছিল।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, মুজিব এবং ভারতীয় প্রধাণমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৫-বছর মেয়াদী ইন্দো-বাংলাদেশী বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তির স্বাক্ষর করেন। আমেরিকান ও সোভিয়েত নেতাদের সাথে আলোচনা করার জন্য ওয়াশিংটন ডিসি ও মস্কোতে মুজিবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের দিল্লী চুক্তিতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তির জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করে। এই চুক্তিটি পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালী কর্মকর্তাদের এবং তাদের পরিবারদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। তার পাশাপাশি ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পথ প্রশস্ত করে।

স্থানীয়ভাবে, মুজিবের শাসনামলে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ এর একটি বিদ্রোহ ছিল, পাশাপাশি বাণিজ্যগোষ্ঠী এবং রক্ষণশীল শক্তিবর্গের একটি আন্দোলন ছিল, যারা মনে করত আওয়ামী লীগ সমগ্র মুক্তি আন্দোলনের মুনাফা একচেটিয়াভাবে গ্রহণ করে। বিক্ষোভ দমনের জন্য তিনি ১৯৭৪ সালে তিন মাসের জরুরী অবস্থা জারি করেন। তিনি জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করেন, যা মানবাধিকার অপব্যবহারের ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেকেও জাতীয় রক্ষী বাহিনী দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

সামরিক অভ্যুত্থান ও প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন, প্রথম সামরিক আইন এবং জিয়া প্রশাসন:

জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল বিচারপতি সায়েমের কাছ

থেকে রাষ্ট্রপতি এবং সিএমএলএ এর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরে জিয়া তার রাষ্ট্রপতিত্ব ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে গণতান্ত্রিক রূপ প্রদানের জন্য একটি রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। দেশীয় মুসলিম ঐতিহ্যের উপর জোর দিয়ে জিয়া একটি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ধারণার প্রথাকে তুলে ধরেন। ১৯৭৯ সালে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিএনপি ভূমিধ্বসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রপতি জিয়া সংবিধানে মুক্ত বাজার অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, সমাজতন্ত্রকে "অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার" হিসেবে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেন এবং একটি বৈদেশিক নীতিমালা প্রণয়ন করেন যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাথে সহযোগিতার ওপর জোর প্রদান করে। জিয়া তার সরকারের বিরুদ্ধে একুশটি অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করেছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল বিমানবাহিনী দ্বারা। তার এক সময়কার সহকারী কর্নেল আবু তাহেরকে দেশদ্রোহের চেষ্টায় গ্রেফতার করা হয় এবং মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীতে তার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অনেকেরই এই রকম পরিণতি দেখা যায়। তবে চূড়ান্ত অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ঘটে। মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর-এর প্রতি বিশ্বস্ত সৈন্যদের হাতে জিয়া নিহত হন, যখন ১৯৮১ সালের ৩০ মে তারা চট্টগ্রামে তার সরকারী বাসভবনে হানা দেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এই বিদ্রোহকে দমন করেন।

সাত্তার প্রশাসন:

জিয়াউর রহমানের পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার। আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, যদিও তার প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল হোসেন তাকে কারচুপির জন্য অভিযুক্ত করেন। ক্ষমতাসীন বিএনপির অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের কারণে সাত্তারের প্রেসিডেন্সী মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাসন করে ও উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন মির্জা নূরুল হুদা। উত্তরপূর্ব ভারতে বিদ্রোহ এবং বার্মায় মুসলিম সহিংসতাগুলোর প্রেক্ষাপটে একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা হয়। আবদুস সাত্তার বয়স্কতার কারণে স্বাস্থ্য সমস্যার ভোগেন। ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থান রাষ্ট্রপতি সাত্তার এবং তার বেসামরিক

সরকারকে বহিষ্কার করে। বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে কারণ হিসাবে খাদ্য সংকট, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অপব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সামরিক আইন এবং এরশাদ প্রশাসন:

আব্দুস সাত্তারকে প্রধান বিচারপতি এ এফ এম আহসানউদ্দিন চৌধুরী পদচ্যুত করেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন ঘোষণা করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। তিনি মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ডেপুটি মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানদের নিয়োগ করেন। এরশাদের মার্শাল ল' শাসনের অধীনে রাজনৈতিক নিপীড়ন ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যাইহোক, সরকার প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি সুসংঘবদ্ধ কাঠামো প্রণয়ন করে। দেশের উনিশ জেলাকে ৬৪ টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। দেশে উপজেলা ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা হয়।

এরশাদ সোভিয়েত বিরোধী জোটের পক্ষে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি আরও জোরদার করেন। ১৯৮৩ সালে এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তার প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে ছিল মূলত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি (৭০% পর্যন্ত শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ছিল) এবং হালকা উৎপাদন, কাঁচামাল এবং সংবাদপত্র সহ ভারী শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা। বিদেশী কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশের শিল্পে বিনিয়োগ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং উৎপাদন রক্ষা করার জন্য কঠোর ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দুর্নীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইন জারি করা হয় এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়।

এরশাদ সংসদ ভেঙে দেন এবং ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন। সব প্রধান বিরোধী দল এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে এবং দাবী করে যে সরকার স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে অসমর্থ হয়েছে। ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৫১ টি আসন লাভ করে। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে সংসদ সহস্রাধিক বিল পাস করে, একটি সংশোধনীতে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং ঢাকার বাইরের শহরগুলিতে উচ্চ আদালতের বেঞ্চ গঠন করতে বিধান জারি হয়। যদিও ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে বজায় থাকে, তবে ঢাকার বাইরের শহরগুলোতে হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণের বিধান সুপ্রীম কোর্টের রায় কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও বর্তমান যুগ

প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার (১৯৯০-১৯৯১)

এরশাদ সামরিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলন সমগ্র দেশকে আচ্ছাদিত করে এবং এতে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত উভয় শ্রেণীর জনগণ অংশগ্রহণ করে। প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং দেশে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। শাহাবুদ্দিন এরশাদকে গ্রেফতার করেন এবং ১৯৯১ সালে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে সক্ষম হন।

১ম খালেদা প্রশাসন (১৯৯১-১৯৯৬):

মধ্য ডানপন্থী দল বিএনপি বহুসংখ্যক আসনে জয়লাভ করে এবং ইসলামী দল জামায়াত-ই-ইসলামির সমর্থনে সরকার গঠন করে, জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। জাতীয় পার্টি-এর প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ দুর্নীতির অভিযোগে কারাগারে বন্দী ছিলেন। খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সংবিধানে আরও বেশি পরিবর্তন এনে সাংসদরা সম্মিলিতভাবে একটি সংসদীয় পদ্ধতি পুনর্নির্মাণ করেন এবং বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের মৌলিক সংবিধান অনুযায়ী আবার প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসন ব্যবস্থায় ফিরে আসে।

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান একটি উদার অর্থনৈতিক সংস্কারের ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় একটি মডেল হিসেবে দেখা হয়। মার্চ ১৯৯৪ সালে একটি সংসদীয় উপনির্বাচনে বিতর্ক দেখা দেয়, যাতে বিরোধী দল দাবী করে যে সরকার অবৈধ উপায়ে ক্ষমতায় এসেছে। সমগ্র বিরোধী দল অনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সংসদ বয়কট করে। বিরোধীদল এও দাবী করে যে খালেদা জিয়ার সরকার পদত্যাগ করুক এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য, বার বার সাধারণ হরতালের একটি কর্মসূচি প্রনয়ণ করে।

কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সহায়তায় বিতর্কের মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে আরেকটি সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সংসদ থেকে বিরোধী দল পদত্যাগ করে। তারপর সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য তারা মিছিল, বিক্ষোভ ও হরতালের প্রচারণা চালায়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বিরোধীদল আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয়

নির্বাচনকে বয়কটের অঙ্গীকার করে। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ার পর, সংসদ একটি সংবিধান সংশোধন করে, একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ এবং নতুন সংসদীয় নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য অনুমতি প্রদান করে।

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার (১৯৯৬):

প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান দেশের সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে, রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য বরখাস্ত করেন, যার ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে আকস্মিক অভ্যুত্থান দেখা দেয়। বরখাস্ত সেনা প্রধান নাসিম বগুড়া, ময়মনসিংহ ও যশোরের সৈন্যদলসহ ঢাকায় যাওয়ার জন্য তার অনুগত বাহিনীকে নির্দেশ দেন। তবে সাভারের সামরিক কমান্ডার দেশের রাষ্ট্রপতির পক্ষে যোগদান করেন এবং রাজধানী ও তার আশেপাশের মহাসড়কে ট্যাংক মোতায়েন করেন, এবং অভ্যুত্থান বাহিনীকে দমন করার জন্য অপারেশনের অংশ হিসেবে ফেরী চলাচল বন্ধ করে দেন। পরে লেঃ জেনারেল নাসিমকে ঢাকা সেনানিবাসে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা সফলভাবে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন তারিখে একটি স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। আওয়ামী লীগ সংসদে ১৪৬ টি আসনে জয়লাভ করে এবং একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিএনপি ১১৬ টি আসন এবং জাতীয় পার্টি ৩২ টি আসন লাভ করে।

১ম হাসিনা প্রশাসন (১৯৯৬-২০০১):

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের জুন মাসে "জাতীয় ঐকমত্যের সরকার" নামক একটি সরকার গঠন করেন, যার মধ্যে ছিল জাতীয় পার্টির একজন মন্ত্রী এবং জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর একজন মন্ত্রী। জাতীয় পার্টি কোনও আনুষ্ঠানিক জোটে প্রবেশ করেনি এবং পার্টির প্রেসিডেন্ট এইচ. এম. এরশাদ ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে লীগ সরকারের কাছ থেকে তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে কেবল তিনটি দলেরই ১০ জনের অধিক সদস্য নির্বাচিত হয়: এই তিনটি দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদকে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারীতে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মতে, ১৯৯৬ সালের জুন

নির্বাচন মুক্ত এবং ন্যায্য ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিএনপি এই নতুন সংসদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। হাসিনা প্রশাসন পরিবেশগত ও আন্তঃজাতিগত চুক্তির ক্ষেত্রে মাইলফলক কৃতিত্ব অর্জন করে। এগুলো হল ভারতের সাথে গঙ্গার পানি ভাগ চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত বিদ্রোহীদের সাথে শান্তি চুক্তি। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় এক বিরল ও অভূতপূর্ব ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন, যাতে অংশগ্রহণ করেন- ১. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, ২. ভারতের প্রধানমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল এবং ৩.আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন।

১৯৯৯ সালের জুন মাসে বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলো আবার সংসদে উপস্থিত হতে বিরত থাকে। ১৯৯৭ সালে "ছয় দিনের" হরতাল থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সালে "২৭ দিনের" হরতাল পর্যন্ত; বিরোধীদলের পক্ষ থেকে ব্যাপক সংখ্যক হরতালের সৃষ্টি হয়। ১৯৯৯ সালের শুরুতে গঠিত চার-দলীয় বিরোধী জোট ঘোষণা করে যে, নির্বাচনী বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারী নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ না পাওয়া পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং এর ফলে বিএনপি পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালে পৌর পরিষদের নির্বাচন, বেশ কয়েকটি সংসদীয় উপনির্বাচন এবং ২০০০ সালের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্জন করে।

তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০১):

প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহিংসতা দমনের ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় দেয়। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি-নেতৃত্বাধীন জোটের বিপুল বিজয় দেখা দেয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল জামায়াত-ই-ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্য জোট। বিএনপি ১৯৩ টি লাভ করে এবং জামায়াত ১৭ টি আসনে জয়লাভ করে।

২য় খালেদা প্রশাসন (২০০১-২০০৬):

২০০১ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং নির্বাচন পরিদর্শক দলের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে ঘোষণা সত্ত্বেও, শেখ হাসিনা বিগত নির্বাচনের নিন্দা করেন এবং সংসদ বর্জন করেন। ২০০২ সালে তিনি অবশ্য তার

দলকে জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু আওয়ামী লীগ আবার ২০০৩ সালের জুন মাসে একজন রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী এবং সংসদীয় স্পিকারের পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা এবং সেই সাথে অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদ জানায়। জুন ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগ তাদের দাবী পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও সংসদে ফিরে আসে। ২০০৫ সালের বাজেট অধিবেশনের সময় সামগ্রিক বয়কটের ঘোষণা দেবার আগে তারা অনিয়মিতভাবে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়ার প্রশাসন উন্নত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সেই সাথে দুর্নীতির অভিযোগ এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও রক্ষণশীল শক্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের দ্বারা চিহ্নিত হয়। উইকিলিকস কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত আমেরিকান কূটনৈতিক মিডিয়াগুলোতে তার ছেলে তারেক রহমানকে "গোপনীয়তার জন্য বিখ্যাত এবং বারংবার সরকারি ক্রয়কর্ম ও রাজনৈতিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষের জন্য" বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আফগানিস্তানে তালেবানদের উৎখাত হওয়ার পর বাংলাদেশ ত্রাণ তৎপরতার ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়, যার মধ্যে "ব্র্যাক" যুদ্ধবিমুখ দেশটির বৃহত্তম উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত হয়।

হাই প্রোফাইলের একটি সিরিজ গুপ্তঘাতক গোষ্ঠী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় নেতাদের হত্যার হুমকি প্রদান করে। ২০০৪ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামান্যর জন্য ঢাকায় গ্রেনেড হামলা থেকে রক্ষা পান। ২০০৫ সালে জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলা চালায়। লীগ বিএনপি ও জামায়াতকে জঙ্গীবাদের উত্থানের সাথে জড়িত থাকার দায়ে অভিযুক্ত করে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্রোহীদের বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, এমন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ভারতের সাথে সম্পর্ক প্রকট আকার ধারণ করে। খালেদা জিয়া চীনের সাথে কৌশলগত অংশীদারত্ব প্রকাশ করেন এবং বেইজিংয়ের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চতুর্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৬-২০০৮):

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই এবং পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফের সাথে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ

বিএনপির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর একটি বড় রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়, কারণ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার জন্য নিরপেক্ষ প্রার্থীকে

দাবী করে। বহু সপ্তাহ ব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ এবং অবরোধের কারণে দেশটি পঙ্গু হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু একটি সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী নির্বাচনের ভীতি দূর করতে ব্যর্থ হন। ১১ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ এর চাপের মুখে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরু করে, যার মধ্যে ১৬০ জন রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং আমলাকে গ্রেফতার করা হয়। এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাসহ খালেদা জিয়ার দুই ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভকারীগণ ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবী জানায়, কিন্তু কারফিউ দ্বারা আন্দোলন দমন করা হয়। ২০০৮ সালে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা মুক্তি পান। জরুরী অবস্থা দুই বছর ধরে অব্যাহত থাকে। ডিসেম্বর ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে, যার মধ্যে জাতীয় পার্টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩য় হাসিনা প্রশাসন (২০০৯-বর্তমান):

কার্যনির্বাহী সভার দুই মাসের মধ্যে শেখ হাসিনার সরকারকে বিডিআর বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে হয়, যা সেনা বিভাগের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহীদের হিংস্রতা ও ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের মোকাবেলা করে শেখ হাসিনার ব্যাপক সফলতার পরিচয় দেন। ১৯৭১ সালে গণহত্যার অন্যতম কারিগর পাকিস্তানপন্থী নেতাদের বিচারের জন্য তিনি বিতর্কিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। ট্রাইব্যুনাল তার সুষ্ঠুতা ও নিরপেক্ষতার ব্যাপারে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্যে অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা, বাংলাদেশ দলের স্বাধীনতার বিরোধিতা ও গণহত্যার সময় পাকিস্তানকে সহায়তার অভিযোগে অভিযুক্ত।

২০১০ সালে সংবিধানের মৌলিক নীতি হিসেবে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে জনমত পরিচালিত করে, যা প্রকাশিত হয় মার্চ ২০১৩ শাহবাগ প্রতিবাদের মাধ্যমে। মে ২০১৩ সালে হেফাজত-ই-ইসলামের নেতৃত্বে একটি ইসলামপন্থী সংগঠনও পাল্টা বিরাট সমাবেশ পরিচালনা করে।

আওয়ামী লীগ ও বিনপির মধ্যে সংঘাতকে প্রায়ই বেগমদের যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। হাসিনা সরকার বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন বিলুপ্ত করেন। বিএনপির পক্ষ থেকে একে নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে আওয়ামী লীগের পক্ষে দুর্নীতিযুক্ত করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়। লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় সাধারণ জীবনে সহিংসতা বেড়ে যায়। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে হিংস্রতম নির্বাচন। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকে বিএনপি বয়কট করে; জামায়াতকে নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক মিডিয়ায় নির্বাচনের সমালোচনা করা হয়। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে শপথ নেন।

২০১৫ এবং ২০১৬ সালে, বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পশ্চিমা এবং এশীয় প্রবাসী, এলজিবিটি কর্মী, সুফি মুসলিম, ব্লগার, প্রকাশক এবং নাস্তিক সহ সংখ্যালঘু এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের লক্ষ্য করে ক্রমবর্ধমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে বন্দুকধারীদের দ্বারা একটি উচ্চমানের রেস্তোরাঁ অবরুদ্ধ করার পর দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ সন্ত্রাসী হামলায় ২০ জনের মৃত্যু হয়। ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্ট অনেক হামলার দায়

স্বীকার করেছে, যদিও হাসিনা প্রশাসন জোর দিয়ে বলেছিল এ ঘটনায় স্থানীয় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো দায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই হামলার পর থেকে, সরকার চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে । নিরাপত্তা বাহিনী সন্দেহভাজন জঙ্গি আস্তানায় অসংখ্য অভিযান পরিচালনা করে। এই পদক্ষেপগুলো চরমপন্থী হামলা এবং প্রাণহানির সংখ্যা হ্রাস করে।

২০১৭ সালে, আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কারণে বাংলাদেশ নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ২০১৭ সালের আগস্টের শুরুতে, মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে "ক্লিয়ারেন্স অপারেশন" শুরু করে । তারা হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং লাখ লাখ রোহি½াকে দেশ থেকে প্রতিবেশী বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেয়। সংঘাতের প্রথম চার সপ্তাহে ৪০০,০০০ বা তারও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী (মায়ানমারের অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের প্রায় ৪০%) পায়ে হেঁটে বা নৌকায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় (প্রধানত বাংলাদেশে) যা একটি বৃহৎ মানবিক সংকট তৈরি করে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সরকার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। বর্তমানে প্রায় ১০,০০,০০০ শরণার্থী বাংলাদেশে অবস্থান করছে যা দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ আরেকটি বিশাল বিজয় অর্জন করে।

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ৩

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ৪

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ৫

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ৬

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ৭

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ৮

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ৯

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১০

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১১

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১২

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১৩

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১৪

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১৫

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১৬

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১৭

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১৮

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ১৯

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২০

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২১

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২২

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২৩

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২৪

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২৫

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২৬

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২৭

মুক্তিযুদ্ধ [পর্ব-৮] - ২৮